আকিদা ওয়াসিতিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা

মূল লেখক :

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ

ব্যাখ্যাকার :

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ

[ভাষান্তর, পরিশীলন ও টীকা-সংযোজন]

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

আকিদা ওয়াসিতিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা

প্রকাশকাল : ২৪শে জিলকদ ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১লা জুন, ২০২৪ খ্রি.।

অনলাইন প্রকাশক : সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে।

ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/SunniSalafiAthari.

টেলিগ্রাম চ্যানেল : https://t.me/SunniSalafiAthari.

বিষয়সূচি (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের নিবেদন (توطئة المترجم)

নির্জন প্রান্তর, নিশিসমাগমে আঁধার নেমেছে চারপাশে। আকাশে মিটিমিটি জ্বলছে তারার মেলা। এই অপূর্ব তারকাস্নাত রজনীতে সাক্ষাৎ হলো দুজনের। একজন মানব, অপরজন মানবী। অকস্মাৎ মানবটি প্রেম নিবেদন করে বসল। তার প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করল মানবী। এবারে লোকটি বলল, 'দেখ, আকাশের তারাগুলো ছাড়া এই নির্জন মরুতে আমাদের দেখার কেউ নেই।' এ শুনে মানবী উত্তর করল, 'কিন্তু তারকারাজির স্রষ্টা? তিনিও কি আমাদের দেখছেন না?' সর্বদ্রষ্টা আল্লাহর প্রতি অটুট ইমানের বদৌলতে মহিলা নিজেকে নিষ্কলুষ রাখল জঘন্য অপরাধ থেকে। এটি একটি বাস্তব ঘটনা। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হাফিজ ইবনু রজব এবং আল্লামা ইবনুল জাওজি।[1]

---

[1] জাইনুদ্দিন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজাব আল-হাম্বালি, ***কালিমাতুল ইখলাস ওয়া তাহকিকু মানাহা***, তাহকিক : জুহাইর শাবিশ (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৪র্থ প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.), পৃ. ৪৯; জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি ইবনুল জাওজি আল-হাম্বালি, ***জাম্মুল হাওয়া***, তাহকিক : মুস্তাফা আব্দুল ওয়াহিদ (তাবি, প্রকাশনার নামবিহীন), পৃ. ২৭২।

ঘটনা থেকে উপলব্ধ হয়, আল্লাহ যে আমাদের সর্বত্র ও সর্বদা দেখছেন, এই জ্ঞান আমাদের অন্তরে জাগরিত থাকা কত জরুরি। কত পাপ থেকেই না রেহাই পেতে পারি আমরা উক্ত জ্ঞানের কারণে! আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারটিই এমন। আমরা যতবেশি আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারব, ততবেশি কল্যাণ পেয়ে বরিত হব। চিন্তা করুন, একজন মুমিন বান্দা যখন জানবে, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে তৈরি করে অবহেলাভরে ফেলে দেননি, বরং তাকে সুপথ দেখিয়েছেন, লালনপালন করেছেন, কীসে রয়েছে তার সর্বাধিক কল্যাণ তা বাতলে দিয়েছেন, তখন সেই বান্দা কি আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হবে না? অবশ্যই হবে।

বান্দা যখন জানবে, চোখের চোরাচাহনি সম্পর্কেও আল্লাহ জানেন, তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন, তখন সে আল্লাহর ভয়ে ভীত হবে। সচেষ্ট হবে অনন্তজীবনের জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি নিতে। আর আল্লাহকে তো তারাই যথাযথ ভয় করে, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে জানে[2]। বান্দা যখন জানবে, আল্লাহ হলেন মহাপ্রতাপশালী রাজাধিরাজ, তখন সে অন্যের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকবে। যখন জানবে, আল্লাহ দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন, তখন সে সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়াপরবশ হবে। যখন জানবে, ধৈর্যশীল,

---

[2] আল-কুরআন, ৩৫ (সুরা ফাতির) : ২৮।

পরহেজগার, ন্যায়পরায়ণ ও তওবাকারী বান্দাদের আল্লাহ ভালোবাসেন, তখন সে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার প্রয়াস চালাবে। যখন জানবে, আল্লাহ বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় পছন্দ করেন না, তখন এসব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হবে।

যখন আর্ত বান্দা জানবে, আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত, মহান দাতা, তাঁর দুই হাত প্রসারিত, তিনি অঢেল দান করেন, আর বান্দার ডাকে সাড়া দেন, তখন সে সর্বদা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আল্লাহ হেদায়েত দেন, জানার পরে হেদায়েত চাইবে কেবল আল্লাহরই কাছে। আল্লাহ সবকিছুর ওপরে আছেন জানার পরে জমিনে সীমালঙ্ঘন করবে না, বড়ো হওয়ার অহংকারে ফেটে পড়বে না। কেয়ামতের দিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বান্দার সাথে সরাসরি কথা বলবেন জানার পরে স্রষ্টার সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে ভীত হবে। দাখিল হবে পরিপূর্ণ ইসলামে।

আল্লাহর ব্যাপারে আমরা যেন মৌলিক বিষয় জানতে পারি, সেজন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং সমপরিমাণ পৃথিবী। এসবের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ পরিবেষ্টন

করে আছেন সবকিছুকে।”[3] আবার আল্লাহ বলেছেন, “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য।”[4] দুটো আয়াতেই আল্লাহর একত্ব বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে জেনে তাঁর প্রতি যথোচিত ইমান রাখা তাওহিদের একটি বড়ো অংশ, আবার এক আল্লাহর ইবাদত করাও তাওহিদের বড়ো, বরং মূল অংশ।

আল্লাহ সম্পর্কে বান্দা জানবে, এটা আল্লাহরও পছন্দের। এজন্য শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহ কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ অংশগুলোতে আল্লাহর পরিচয় নিয়ে কথা বলেছেন। যেমন কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসি, সুরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত। এ আয়াতে আল্লাহর পাঁচটি নাম এবং বিশটিরও বেশি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। আবার কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সুরা হচ্ছে সুরাতুল ফাতিহা। এ সুরায় আল্লাহর পাঁচটি নাম এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গুণ বিবৃত হয়েছে। আর সুরা ইখলাসের কথাই ধরুন। হাদিসে এই সুরাকে *‘কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ’* বলা হয়েছে[5]। ছোট্ট

---

[3] আল-কুরআন, ৬৫ (সুরা তালাক) : ১২।

[4] আল-কুরআন, ৫১ (সুরা জারিয়াত) : ৫৬।

[5] সহিহুল বুখারি, হা. ৫০১৩।

এই সুরায় আল্লাহর তিনটি নাম এবং ছয়টির মতো গুণ বর্ণিত হয়েছে। জনৈক সাহাবি এই সুরা পড়তে ভালোবাসতেন, আর বলতেন, *‘কারণ এতে দয়াময় আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আছে,’* তাঁকে নবিজি জানিয়েছেন, স্বয়ং আল্লাহও তাঁকে ভালোবাসেন[6]।[7]

আল্লাহর পরিচয়, তাঁর নান্দনিক নামসমগ্র ও সুউন্নত গুণরাজি সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের একটি অনন্য গ্রন্থ— শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বিরচিত ***‘আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা’।*** ইরাকের *‘ওয়াসিত’* প্রদেশের জনৈক বিচারপতি শাইখুল ইসলামের কাছে আকিদার একটি মৌলিক বই লেখার অনুরোধ করলে তিনি বইটি রচনা করেন। ‘ওয়াসিত’ এলাকাবাসীর জন্য এই কিতাব রচনা করার ফলে কিতাবটি লেখকের যুগেই *‘আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা’* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি *‘মুনাজারাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ’* গ্রন্থে বলেছেন, “আমি আসরের পর এক

---

[6] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩৭৫।

[7] **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকল,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩১০-৩১২।

বৈঠকে আকিদার এই পুস্তিকা রচনা করেছি।”[8] এটা ছিল আল্লাহপ্রদত্ত বরকত ও কারামত, যা শাইখুল ইসলাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিষয়ক আকিদার পাশাপাশি পরকাল, ভাগ্যের ভালো-মন্দ, ইমানের পরিচয়, সাহাবিবর্গ, অলিদের কারামত প্রভৃতি বিষয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রতিটি আকিদা কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্য থেকে সুসাব্যস্ত। আল্লাহ লেখকের জীবদ্দশাতেই *আকিদা ওয়াসিতিয়্যার* প্রসার ঘটান। পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ পুস্তিকাটিকে সাদরে গ্রহণ করে নেন। যুগ যুগ ধরে চলেছে এর পঠনপাঠন। এমনকি বর্তমানেও এর পাঠ্যালোচনা থেমে নেই। আমাদের কিবার উলামাদের অনেকেই পুস্তিকাটি মুখস্থ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ এতে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহর দলিলসমৃদ্ধ সহজবোধ্য সঠিক আকিদা।

সালাফি আলিমদের অনেকেই পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা করেছেন। তারমধ্যে আমরা দাওয়াতি কাজের জন্য বেছে নিয়েছি আকিদার বিশিষ্ট পণ্ডিত, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান, সৌদি আরবের

---

[8] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***মাজমুউল ফাতাওয়া***, সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম (মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৬৪।

সবচেয়ে বড়ো উলামাদের অন্যতম, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর হস্তলিখিত অত্যন্ত সহজিয়া ধাঁচের সংক্ষিপ্ত ও নিটোল ব্যাখ্যাগ্রন্থ; যা বিভিন্ন সময়ে *'মুযাক্কিরাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা'* ও *'তালিকাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা'* — শীর্ষক শিরোনামদ্বয়ে আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। শাইখ ইবনু উসাইমিন মূল পুস্তিকা থেকে মূলপাঠ উল্লেখ না করে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসিতিয়্যার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা লিখে গেছেন। ফলে আমরা মূল পুস্তিকা অনুবাদ করে পুরো পুস্তিকা এই অসাধারণ ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। মূল পুস্তিকার আরবি টেক্সট প্রধানত শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-কাসিম হাফিজাহুল্লাহর তাহকিককৃত নুসখা অনুযায়ী করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে অন্য শাইখদের তাহকিককৃত নুসখা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আমরা শাইখুল ইসলামের কথাগুলো ***'মূলপাঠ'*** উপশিরোনামে উল্লেখ করেছি। আর শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর কথাগুলো উল্লেখ করেছি ***'ব্যাখ্যা'*** উপশিরোনামে। পাঠক মহোদয় কী বিষয়ের আলোচনা পড়তে যাচ্ছেন, তা যেন আগাম বুঝতে পারেন, সেজন্য ব্যাখ্যাকার বিরচিত এবং কতকক্ষেত্রে আমাদের সংযোজিত বিষয়-শিরোনাম উল্লেখ করেছি। বেশকিছু ক্ষেত্রে বাক্যের সৌন্দর্য বজায় রাখতে শাব্দিক অনুবাদের গণ্ডি পেরিয়ে ভাবানুবাদের আশ্রয়

নিয়েছি। আর গুরুত্বের বিবেচনায় অনেকগুলো টীকা যুক্ত করেছি এবং ব্যাখ্যাকার শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে মূল কিতাবের শুরুতে সংযোজন করেছি। এসবক্ষেত্রে অধম গুনাহগারের প্রমাদ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই কোনো সুহৃদ শুধরে দিলে কৃতার্থ হব, শুধরে নিব এবং তাঁর জন্য দোয়া করে দিব, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, ***'মূলপাঠ সমাপ্ত'*** বলা হলে, বুঝতে হবে, ইমাম ইবনু তাইমিয়ার কথা সমাপ্ত; আর ***'ব্যাখ্যা সমাপ্ত'*** বলা হলে, বুঝতে হবে, ইমাম ইবনু উসাইমিনের কথা সমাপ্ত; তদ্রুপ ***'টীকা সমাপ্ত'*** বলা হলে, বুঝতে হবে, অনুবাদকের কথা সমাপ্ত।

পাশাপাশি বলে রাখি, আমি এই বইয়ের কাজ করেছি কয়েকবছর আগে, বক্ষ্যমাণ ভূমিকাও সেসময় লেখা হয়েছিল। পরবর্তীতে আমাদের লেখার ফরম্যাট এবং কোটিং ও সাইটিংয়ের স্টাইল আমরা চেঞ্জ করেছি। তাই সম্প্রতি আগের লেখাকে পুনরায় আমাদের চলতি ধারার কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছি। এই জটিল কাজ করতে যেয়ে বেশকিছু অসামঞ্জস্যতা রয়ে গেছে; আশা করি সম্মাননীয় পাঠক বিষয়টি মার্জনার সাথে বিবেচনা করবেন।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ যেন মূল রচয়িতা, ভাষ্যকার, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক-সহ নিবন্ধ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিঞ্চিত করেন এবং আমাদের সবাইকে এ নিবন্ধ

থেকে উপকৃত করেন। আমি আরও প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আপনার জন্য একনিষ্ঠ করুন। আর আকিদা-বিষয়ক এরকম বরকতময় কাজের সাথে যুক্ত করে আপনি এই নগন্য বান্দাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, তা থেকে কখনোই তাকে বঞ্চিত করবেন না। নেয়ামতপ্রাপ্তির শুকরিয়া করলে আপনি নেয়ামত বাড়িয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি করেছেন, সে কথা স্মরণ করে আপনার ওয়াহহাব ও কারিম নামের অসিলায় আপনার কাছেই চাইছি, হে আল্লাহ, এমন নেয়ামত আমাদের আরও বাড়িয়ে দিন, নেয়ামত দিন আমাদেরকে অনেক, অঢেল ও প্রচুর পরিমাণে। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

মহান রবের ক্ষমাভিখারী বান্দা—
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা
১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি.।

ব্যাখ্যাকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(نبذة من حياة الشارح)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ 'আলিমে দিন' ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, ফাকিহ, উসুলবিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ১৩৪৭ হিজরি মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের কাসিম বিভাগের উনাইযা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো আলিমের কাছে পড়েছেন। **তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—** ইমাম আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি, ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি, ইমাম আব্দুল আজিজ বিন বাজ প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবোর্ডের এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইলমের সকল শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলেন। আর সেকারণে আকিদা, তাফসির, উসুলুত তাফসির, হাদিস, উসুলুল হাদিস, ফিকহ, উসুলুল ফিকহ, কাওয়ায়িদুল ফিকহ, নাহু-সরফ (আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র), বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র), ফারাইদ (মৃতব্যক্তির সম্পত্তি-বণ্টন সম্বন্ধীয় শাস্ত্র) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসংখ্য

গ্রন্থ ও অডিয়ো টেপস পাওয়া যায়, যা তাঁর অনুপম ইলমি অবদানের ফসল।

পুরো বিশ্বে তাঁর ছাত্রসংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন— আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি, আল্লামা সামি আস-সুকাইর, শাইখ খালিদ আল-মুশাইকিহ, শাইখ উসমান আল-খমিস, শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ, শাইখ উসামা আল-উতাইবি, শাইখ উমার আল-মুকবিল, শাইখ সালিম আত-তাউয়িল প্রমুখ হাফিজাহুমুল্লাহ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.) বলেছেন, "আমি একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান আকিদা-সংবলিত পুস্তিকা পড়লাম, যা সংকলন করেছেন আমাদের ভাই আল-আল্লামা সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন।"[9]

ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৪২২ হি.) প্রশ্ন করা হয়, "সৌদি আরবের আলিমগণের মধ্যে আপনি কাদের থেকে ইলম গ্রহণের নসিহত করেন? আর খুব ভালো হতো, যদি আপনি আমাদের কাছে

---

[9] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ*** (রিয়াদ : আল-মাকতাবুত তাআয়ুনি লিদ দাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি.), পৃ. ৩।

কিছু (আলিমের) নাম বলেন।” তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) জবাবে বলেন, “আমি যাঁদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণের নসিহত করি এবং আমি যাঁদেরকে চিনি, তাঁরা হলেন— শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ হাফিজাহুল্লাহ, **শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন হাফিজাহুল্লাহ,** শাইখ রাবি বিন হাদি হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিজাহুল্লাহ।”[10]

সৌদি আরবের প্রখ্যাত ফাকিহ আল্লামা জাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাদি আল-মাদখালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪৩৫ হি.) বলেছেন, “১৫/১০/১৪২১ হিজরি তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারা গেলেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন; যিনি ছিলেন সামাহাতুশ শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজের পরে **দ্বিতীয় ইমাম ও দ্বিতীয় মুজাদ্দিদ।** আল্লাহ তাঁদের দুজনেরই মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং তাঁদের প্রতি রহম করুন।”[11]

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৫৩ হি.) বলেছেন, “আমি আপনাদের সামনে আজ রাতে সৌদি আরবের একজন মহান শাইখ,

---

[10] মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি, ***তুহফাতুল মুজিব আলা আসইলাতিল হাদিরি ওয়াল গারিব*** (ইয়েমেন : দারুল আসার, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৬৭।

[11] ইসাম বিন আব্দুল মুনয়িম, ***আদ-দুর্রুস সামিন ফি তারজামাতি ফাকিহিল উম্মাতিল আল্লামা ইবনি উসাইমিন*** (আলেকজান্দ্রিয়া, দারুল বাসিরা, তাবি), পৃ. ৪২৬।

সৌদি আরবের একজন অন্যতম আলিম, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের একজন অন্যতম আলিম সম্পর্কে আলোচনা করব। ইলমের পরিচর্যা ও প্রচার-প্রসারে এবং তালিবুল ইলমদের শিক্ষাদানে যাঁর অনেক বড়ো অবদান আছে। **তিনি হলেন আশ-শাইখুল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন।** আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং স্বীয় প্রশস্ত জান্নাতে তাঁর আবাস নির্ধারণ করুন।”[12]

মদিনার প্রখ্যাত ফাকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসুলবিদ আল্লামা উবাইদ আল-জাবিরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪৪৪ হি.) বলেছেন, **“আশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন হলেন আল-ইমাম, আল-ফাকিহ, আল-মুহাক্কিক, আল-মুদাক্কিক, আল-মুজতাহিদ রাহিমাহুল্লাহ।”[13]**

ইমাম ইবনু উসাইমিনকে আল্লামা আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিজাহুল্লাহ *‘চতুর্দশ হিজরি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ’* আখ্যা দিয়েছেন। তিনি একাধিক জায়গায় এরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, “এই

---

[12] আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ***আশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন মিনাল উলামায়ির রব্বানিয়্যিন*** (প্রকাশনার স্থানবিহীন : মাতবাআতুন নারজিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৪।

[13] উবাইদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জাবিরি, ***আল-হাদ্দুল ফাসিল বাইনা মুআমালাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়া আহলিল বাতিল*** (লেকচারস ট্রান্সক্রিপ্ট, আজুর্রি ডট কম), ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য, তথ্য যাচাইয়ের তারিখ : ১৭ই মে, ২০২৪ খ্রি., https://tinyurl.com/2dzpd2kc।

ইমামত্রয় তথা ইবনু বাজ, ইবনু উসাইমিন ও আলবানি রাহিমাহুমুল্লাহ **এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ** হিসেবে বিবেচিত। আমাদের জ্ঞান মোতাবেক সমকালীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাঁরাই হলেন সর্বসেরা এবং সবচেয়ে জ্ঞানী। তাঁরা দুবছর আগে মারা গিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন। পক্ষান্তরে যারা বলে, *'বিগত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন হাসান আল-বান্না ও সাইয়্যিদ কুতুব,'* তাদের কথা ঠিক নয়।"[14]

মদিনার ফাকিহ আল্লামা সুলাইমান আর-রুহাইলি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "আল-উসুল মিন ইলমিল উসুল কিতাবটির রচয়িতা হলেন আল-ইমাম, আল-ফাকিহ, আল-উসুলি (উসুলবিদ), **আল-মুতাফান্নিন (বহুশাস্ত্রবিশারদ)** ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ।"[15]

ইমাম ইবনু উসাইমিনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো— আশ-শারহুল মুমতি আলা জাদিল মুস্তাকনি, ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম ফি শারহি বুলুগিল মারাম, আত-তালিকু আলাল কাফি, শারহুল উসুলিস সালাসা, শারহু কিতাবিত তাওহিদ, শারহু কাশফিশ শুবুহাত, শারহুল উসুলিস সিত্তাহ, শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,

---

[14] আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ***শারহু সুনানি আবি দাউদ*** (ট্রান্সক্রিপ্ট, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট কম), অডিয়ো ক্লিপের ট্রান্সক্রিপ্ট নং : ৪৮৩, পৃ. ৫।

[15] সুলাইমান আর-রুহাইলি, ***শারহু কিতাবিল উসুল মিন ইলমিল উসুল*** (আদ-দাওরাতুল ইলমিয়্যাতুস সাইফিয়্যাতুত তাসিআ-র অধীনে প্রদত্ত ব্যাখ্যা), দারস নং : ১, ৪:২৫ মিনিট থেকে ৪:৪০ মিনিট পর্যন্ত, দারসের লিংক : https://youtu.be/ig1FOEgCLnE?si=cqedIJTlBYUl3m-C।

তাকরিবুত তাদমুরিয়্যা, শারহু তাকরিবিত তাদমুরিয়্যা, শারহুর রিসালাতিত তাদমুরিয়্যা, ফাতহু রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা, শারহু ফাতহি রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা, শারহুল আকিদাতিস সাফফারিনিয়্যা, শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া, শারহু আলফিয়্যা ইবনি মালিক, শারহুল উসুল মিন ইলমিল উসুল, শারহু নুজহাতিন নাজার, আল-বায়ানুল মুমতি ফি তাখরিজি আহাদিসির রওদিল মুরবি, শারহুল আরবায়িন আন-নাবাবিয়্যা, আত-তালিক আলা সহিহিল বুখারি, আত-তালিক আলা সহিহি মুসলিম, শারহু মুখতাসারিত তাহরির প্রভৃতি।

এই মহান আলিম মৃত্যুঅবধি সুপরিসর দাওয়াতি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ১৪২১ হিজরি মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

ব্যাখ্যাকারের প্রারম্ভিকা

(افتتاحية الشارح)

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম ধার্য হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবর্গ ও সকল সাহাবির প্রতি। অনন্তর বক্ষ্যমাণ নোটবুক ইলমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাওহিদ বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের মৌলিক সিলেবাস নিয়ে প্রণীত, যা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বিরচিত আকিদা ওয়াসিতিয়্যার ব্যাখ্যা হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে চাইছি, তিনি যেন এর মাধ্যমে মানুষের উপকার করেন, যেমন তিনি মূলবইটির মাধ্যমে উপকৃত করেছেন। নিশ্চয় তিনি অতি দানশীল, মহানুভব।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية)

তিনি হলেন প্রাজ্ঞ বিদ্বান শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ বিন আব্দুল হালিম বিন আব্দুস সালাম ইবনু তাইমিয়া। তিনি ৬৬১ হিজরির ১০ই রবিউল আওয়াল তারিখে *'হার্রান'* এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তাঁর পরিবার দেমাস্কে চলে যায়। দেমাস্ক পরিণত হয় স্বদেশভূমিতে। তিনি ছিলেন বিরাট বিদ্বান, প্রদীপ্ত নিদর্শন এবং যশস্বী মুজাহিদ। তিনি স্বীয় বুদ্ধিমতা, মনন, ইলম ও দেহের মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তিনি ছিলেন দলিলপ্রদানে অত্যন্ত শক্তিশালী, যার দরুন তাঁর সাথে ইলমি বিতর্কে কেউ টিকে থাকতে পারত না। তাঁর কাছে হক স্পষ্ট হয়ে গেলে তা ব্যক্ত করার সময় মহান আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দা তাঁকে আটকে রাখতে পারত না। এজন্য রাজা-বাদশা ও প্রভাবশালী মহল থেকে তিনি বিপদসংকুল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁকে বারবার কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি ৭২৮ হিজরির ২০শে শাওয়াল তারিখে দেমাস্কের দুর্গে কারারুদ্ধ অবস্থায় মারা যান।

আকিদা ওয়াসিতিয়্যার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
(التعريف بالعقيدة الواسطية)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার সারকথা ধারণকারী একটি সংক্ষিপ্ত সর্বমর্মী গ্রন্থ এটি। এতে ঠাঁই পেয়েছে মহান আল্লাহর নাম, গুণাবলি, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান বিষয়ক আকিদা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত আহলুস সুন্নাহর আমলগত কর্মপন্থার আলোচনা। এই পুস্তিকা প্রণয়নের প্রেক্ষাপট এমন— *‘ওয়াসিত’* প্রদেশের জনৈক বিচারপতি (তাঁর নাম ছিল *রাদিউদ্দিন আল-ওয়াসিতি*) শাইখুল ইসলামের কাছে অনুযোগ করেন, তাঁর এলাকার লোকেরা বিদাত ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি শাইখুল ইসলামের কাছে আবেদন করেন, তিনি যেন একটি সংক্ষিপ্ত আকিদা লিখে দেন; যেই আকিদা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি এবং আসন্ন অন্যান্য বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শ পরিস্ফুটিত করে দেবে। এজন্য (*ওয়াসিত* এলাকার দিকে সম্পৃক্ত করে) আলোচ্য আকিদাকে *‘আকিদা ওয়াসিতিয়্যা’* বলা হয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয় এবং তাদের মৌলিক আকিদা

(تعريف أهل السنة والجماعة واعتقادهم)

মূলপাঠ : শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﷺ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. اعْتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ - أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ -: الإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যাঁর করুণা ও দয়া অশেষ অপার। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি স্বীয় রসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও সত্য দিন সহকারে; যেন তিনি সকল ধর্মের ওপর উক্ত দিনকে করতে পারেন বিজয়ী। আর এসবের সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আমি আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং আল্লাহর একত্ব বাস্তবায়ন করে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা ও তাঁর রসুল। মহান আল্লাহ তাঁর জন্য এবং তাঁর

অনুসারীবৃন্দ ও সাহাবিবর্গের জন্য ধার্য করুন অজস্র সালাত ও সালাম।

পর সমাচার এই যে, এটি কেয়ামত অবধি সাহায্যপ্রাপ্ত হিসেবে অব্যাহত রয়ে যাওয়া নাজাত-লাভকারী দল—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা। তাদের আকিদা— আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ ও রসুলবর্গের প্রতি ইমান আনয়ন করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ও ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান রাখা। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

বিশ্বাস, কথা ও কাজের ক্ষেত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অনুরূপ আদর্শের ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারাই *আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত।* তারা যেহেতু সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকে এবং সুন্নাহর ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে— আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ ও রসুলবর্গের প্রতি ইমান আনয়ন করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ও ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান রাখা।

আল্লাহর প্রতি ইমান : মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, প্রভুত্ব (তিনি সবকিছুর প্রতিপালক), ইবাদত (তিনি একমাত্র ইবাদতের হকদার) এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রতি ইমান আনা এর অন্তর্ভুক্ত।

ফেরেশতাবর্গের প্রতি ইমান : ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি ইমান রাখা, ফেরেশতাদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায় তাঁদের প্রতি ইমান আনা, যেমন : জিবরিল, ফেরেশতাদের মধ্যে যাঁদের গুণ তথা বৈশিষ্ট্য জানা যায় তাঁদের সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইমান আনা, যেমন : জিবরিলের বৈশিষ্ট্য, প্রভৃতি বিশ্বাস এর অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতাদের কাজ ও দায়িত্বের প্রতি ইমান আনাও এর অন্তর্গত হবে। যেমন : জিবরিলের কাজ— তিনি (আল্লাহর ইচ্ছায়) ওহি অবতীর্ণ করেন, মালিক ফেরেশতা জাহান্নামের পাহারাদার।

কিতাবসমূহের প্রতি ইমান : কিতাবসমূহ যে আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে তা সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া, কিতাবসমূহ যেসব সংবাদ দেয় তা সত্যায়ন করা এর প্রতি ইমান আনার অন্তর্গত। অনুরূপভাবে যেসব কিতাবের নাম জানা গিয়েছে, যেমন তাওরাত, সেসব নামের প্রতি ইমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর যেসব কিতাবের নাম জানা যায়নি, সেগুলোর প্রতি সার্বিকভাবে ইমান আনতে হবে এবং সেসবের বিধান রহিত না হয়ে থাকলে তা পালন করতে হবে।

রসুলবর্গের প্রতি ইমান : রসুলগণ যে তাঁদের রিসালাতের (পৌঁছে দেওয়া বার্তার) ক্ষেত্রে সত্যপরায়ণ তার প্রতি ইমান রাখা এর অন্তর্গত। একইভাবে যেসব রসুলের নাম জানা গিয়েছে, তাঁদের নামের প্রতি ইমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যেসব রসুলের নাম জানা যায়নি, তাঁদের প্রতিও সার্বিকভাবে ইমান আনতে হবে, তাঁদের দেওয়া সংবাদকে সত্যায়ন করতে হবে এবং তাঁদের শরিয়তের ধর্মীয় বিধিবিধান রহিত না হয়ে থাকলে তা পালন করতে হবে। বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে।

শেষ দিবসের প্রতি ইমান : মৃত্যুর পরে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সংবাদ দিয়েছেন, সেসব সংবাদের প্রতিটির প্রতি ইমান রাখা শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত।

ভাগ্যের প্রতি ইমান : সকল কিছু আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী সংঘটিত হয়, এ বিষয়ের প্রতি ইমান রাখা ভাগ্যের প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর কর্মপন্থা বা আদর্শ

(طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته)

মূলপাঠ :

وَمِنَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ: الإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ؛ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত হচ্ছে—কোনোরূপ তাহরিফ (অর্থ বা শব্দগত বিকৃতি), তাতিল (অস্বীকার, অপব্যাখ্যা, বা অর্থ-অস্বীকৃতি) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন বর্ণনা), তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে—আল্লাহর জন্য তিনি নিজে তদীয় মহিমান্বিত কিতাবে যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা।

পরন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত আল্লাহর ব্যাপারে ইমান রাখে, "তাঁর সদৃশ (মতো) কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সুরা শুরা : ১১] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

কোনোরূপ তাহরিফ (অর্থ বা শব্দগত বিকৃতি), তাতিল (অস্বীকার, অপব্যাখ্যা, বা অর্থ-অস্বীকৃতি) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন-নির্দিষ্টকরণ), তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে—আল্লাহর জন্য তিনি নিজে তদীয় কিতাবে কিংবা স্বীয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করাই আহলুস সুন্নাহর আদর্শ।

তাহরিফ ও তাতিলের পরিচয় (التحريف والتعطيل)

তাহরিফের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থে, *তাহরিফ* মানে পরিবর্তন করা (التغيير)।

পরিভাষায়, تغيير لفظ النص أو معناه “কুরআন-সুন্নাহয় উল্লিখিত দলিলের শব্দ কিংবা অর্থকে পরিবর্তন করে দেওয়াকেই *তাহরিফ* বলে।”

শব্দগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত : মহান আল্লাহর এই বাণীকে পরিবর্তন করা, যেখানে তিনি বলেছেন,

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾.

“আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।”[16]

আয়াতে উদ্ধৃত *‘আল্লাহ’* শব্দের পেশকে পরিবর্তন করে জবর দিয়ে পড়া। যেন আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়ে এমন হয়, ‘আল্লাহ নয়, বরং মুসাই কেবল আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন!’[17]

অর্থগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত : আল্লাহ আরশের ওপর *‘ইস্তিওয়া’* করেছেন[18], মূলত এর মানে তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন এবং ওঠেছেন। কিন্তু এ অর্থ পরিবর্তন করে এমন বলা যে, এর মানে— তিনি আরশের মালিকানা লাভ করেছেন এবং আরশ দখল করেছেন; যাতে করে *ইস্তিওয়া* সিফাতের (গুণের) প্রকৃত অর্থ বাতিল সাব্যস্ত হয়।

তাতিলের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থে, *তাতিল* মানে পরিত্যাগ ও খালি করা। পরিভাষায়, إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات “আল্লাহর জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করা ওয়াজিব, তা প্রত্যাখ্যান করাকেই *তাতিল*

---

[16] সুরা নিসা : ১৬৪।

[17] মহান আল্লাহর *‘কথা বলার’* গুণকে অস্বীকার করার জন্য জাহমিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো লোক এমনটি করেছে মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়। – ***অনুবাদক।***

[18] সুরা তহা : ৫।

(التعطيل) বলে।” হয় তা জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতো পূর্ণাঙ্গ তাতিল হয়ে থাকে, আর নয়তো আশারি সম্প্রদায়ের মতো আংশিক তাতিল হয়ে থাকে। যেই আশারিরা কেবল আল্লাহর সাতটি সিফাত (গুণ বা বৈশিষ্ট্য) স্বীকার করে থাকে। তাদের স্বীকৃত সাতটি সিফাত কবির এই চরণে একত্রিত হয়েছে—

حي عليم قدير والكلام له ~ إرادة وكذاك السمع والبصر

“তিনি হলেন চিরজীবী, সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান, আরও তিনি কথা, ইচ্ছা, শ্রবণ ও দর্শনের গুণে গুণবান।”[19]

[19] মাতুরিদিরাও এই সাতটি সিফাত স্বীকার করে। তবে তারা ‘সৃষ্টিকরণ (التَّكْوِيْنُ)’ নামে আরেকটি সিফাত সহকারে মোট আটটি সিফাত স্বীকার করে থাকে। কিন্তু এসব সিফাতের সবগুলো তারা পুরোপুরি স্বীকার করে না, বরং আশারি-মাতুরিদিরা তাদের বাতিল মতাদর্শ অনুযায়ী এগুলো সিফাতেরও আংশিক স্বীকার করে থাকে। – ***অনুবাদক।***

তাকয়িফ ও তামসিলের পরিচয় এবং এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য

(التكييف والتمثيل والفرق بينهما)

সিফাতের ধরন সাব্যস্ত করাকে তাকয়িফ বলে।[20] যেমন এরূপ বলা যে, আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণের ধরন এরকম এরকম। **আর কোনো কিছুর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করাকে (এক্ষেত্রে আল্লাহর সিফাতের সাদৃশ্য বর্ণনা করাকে) তামসিল বলে।** যেমন এরূপ বলা

[20] **অনুবাদকের টীকা :** তাকয়িফের ব্যাপারে শাইখের দেওয়া সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। সিফাতের ধরন সাব্যস্ত করা কেবল তখনই তাকয়িফ হবে, যখন ধরনের বিবরণ ও প্রকৃতি বলা হবে। এভাবে যে, *'আল্লাহর এই সিফাতটি এরকম বা এমন।'* অন্যথায় আল্লাহর সিফাতের ধরন আছে, কিন্তু সেই ধরন যে কেমন তা আমাদের জানা নেই। এজন্য ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

"এর ধরন (আমাদের) অজ্ঞাত, আরশের ওপর আরোহণ বিদিত, এর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, আর এর ধরন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা বিদাত।" **দ্রষ্টব্য :** আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আল-লালাকায়ি, শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ, তাহকিক : আহমাদ বিন সাদ আল-গামিদি (সৌদি আরব : দারু তাইবা, ৮ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), বর্ণনা নং : ৬৬৪, খ. ৩, পৃ. ৪৪১, **বর্ণনার মান :** সহিহ।

সুতরাং তাকয়িফের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা অধিক সুন্দর ও অগ্রাধিকারযোগ্য—

تعيين كُنه الصفة الإلهية.

"আল্লাহর সিফাতের ধরন নির্দিষ্ট করাই হলো তাকয়িফ।"

অনুরূপভাবে তামসিলের সংজ্ঞা হলো—

تعيين كُنه الصفة الإلهية بذكر مماثلٍ لها.

"সাদৃশ্য উল্লেখ করে আল্লাহর সিফাতের ধরন নির্দিষ্ট করাই হলো তামসিল।"

সংজ্ঞাদুটো উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট ছাত্র আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ তাঁর *'আকিদা ওয়াসিতিয়্যার'* দারসে। **টীকা সমাপ্ত।**

যে, আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— তামসিলের ক্ষেত্রে ধরন বর্ণনার সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করাও অপরিহার্যভাবে যুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে তাকয়িফের ক্ষেত্রে ধরন বর্ণনার সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা অপরিহার্যভাবে যুক্ত থাকে না (অর্থাৎ তাকয়িফে সাদৃশ্য দেওয়া হতেও পারে আবার নাও হতে পারে)।

উল্লিখিত চারটি বিষয়ের বিধান : এগুলোর সবই হারাম। এগুলোর কোনো কোনোটি কুফর বা শির্ক। এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত উল্লিখিত সকল বিষয় থেকে নিজেদের মুক্ত রাখে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সংক্রান্ত দলিলগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য এবং তৎসংক্রান্ত মৌলিক আলোচনা

(واجبنا نحو أدلة الأسماء والصفات والمباحث المتعلقة بها)

মূলপাঠ :

فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، وَلَا يُكَيِّفُونَ، وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفْءَ لَهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ. ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ، بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ.

আল্লাহ নিজেকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, সেসব বিশেষণ তথা গুণ তারা (আহলুস সুন্নাহ) নাকচ করে না এবং ওহির কথাকে যথাস্থান থেকে সরিয়ে ফেলে বিকৃত করে না। আল্লাহর নামসমগ্র ও তাঁর আয়াতে তারা ইলহাদ (অত্যাবশ্যক কর্তব্য এড়িয়ে

বিকৃতি) সাধন করে না এবং আল্লাহর গুণারাজিকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলির সাথে সাদৃশ্য দেয় না, আর না বর্ণনা করে সেসবের ধরন। কেননা মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ, সমতুল্য ও অনুরূপ কেউ নেই।

মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা দেওয়া যাবে না। কেননা তিনি নিজের ও অন্যের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন এবং তাঁর সৃষ্টির চেয়েও সত্য ও উত্তম কথা বলেন। তদুপরি তাঁর রসুলগণ হলেন সত্যবাদী ও সত্যায়িত। তাঁদের আদর্শ ওই সকল লোকের পরিপন্থি, যারা আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, "তারা যেসব (অন্যায়) গুণ বর্ণনা করে, তা থেকে তিনি মহাপবিত্র। মহান তোমার রব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। নিরাপত্তা ধার্য হোক রসুলগণের জন্য। যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"[21] রসুলবর্গের বিরোধীরা আল্লাহকে যেসব গুণে গুণান্বিত করে, তা থেকে আল্লাহ নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং রসুলগণের বক্তব্য দোষত্রুটি থেকে অক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুন তাঁদের জন্য ধার্য করেছেন নিরাপত্তা ও মুক্তি। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

এক্ষেত্রে কর্তব্য হলো— দলিলগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর বহাল রাখা এবং এসবের প্রকৃত অর্থকে আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয় সেভাবেই সাব্যস্ত করা। এর কারণ দুটো—

---

[21] সুরা সাফফাত : ১৮০-১৮২।

১. দলিলগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিবর্গের আদর্শের পরিপন্থি।

২. এসব দলিলকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে মাজাজ বা রূপক অর্থে সরিয়ে দেওয়া আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলার শামিল, যা সন্দেহাতীতভাবে হারাম।

আল্লাহর নাম ও গুণরাজি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দলিলনির্ভর বিষয়; এগুলো একদিক থেকে দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট (মুহকাম) বিষয়ের অন্তর্গত, আবার আরেকদিক থেকে দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) বিষয়ের অন্তর্গত।

আল্লাহর নাম ও গুণরাজি *তাওকিফি* তথা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ওপর নির্ভরশীল। ***তাওকিফি*** তাকে বলা হয়, যা সাব্যস্ত করা বা নাকচ করার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর ওপর নির্ভর করে। এভাবে যে, কুরআন-সুন্নাহর দলিল ব্যতিরেকে উক্ত বিষয় সাব্যস্ত করা এবং নাকচ করা জায়েজ নয়। এক্ষেত্রে বিবেকের কোনো স্থান নেই। কেননা বিবেক এসবের নেপথ্যে অবস্থান করে।

আল্লাহর নাম ও গুণরাজি সেসবের অর্থের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিষয়। কেননা এসবের অর্থ আমাদের কাছে বিদিত (জ্ঞাত, যা জানা রয়েছে এমন)। কিন্তু এসবের প্রকৃতি ও বিবরণের ক্ষেত্রে এগুলো (নাম ও গুণাবলি) অস্পষ্ট-অজানা বিষয়ের অন্তর্গত। কারণ এসবের ধরন-প্রকৃতি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। স্পষ্ট বিষয়কে বলা হয় মুহকাম। মুতাশাবিহ ঠিক এর বিপরীত।

মহান আল্লাহর নামসমগ্র কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়

(أسماء الله غير محصورة)

মহান আল্লাহর নামসমূহ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। কারণ হাদিসে বর্ণিত দোয়ায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ».

“হে আল্লাহ, আপনি নিজেকে যে নামে নামকরণ করেছেন, অথবা আপনার কোনো সৃষ্টিকে আপনার যে নাম শিখিয়েছেন, কিংবা আপনার কিতাবে যে নাম নাজিল করেছেন, অথবা অদৃশ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে আপনি যে নাম একান্তই নিজের করে রেখেছেন, সেসব

নামের অসিলায় আপনার কাছে চাইছি।”[22] আল্লাহ যে জ্ঞান একান্তই নিজের করে রেখেছেন, তাকে (নির্দিষ্ট সংখ্যায়) সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টন করার কোনো উপায় নেই।

আরেকটি হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

“নিশ্চয় আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে যাবে।”[23]

উল্লিখিত হাদিসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় করা হবে এভাবে যে, শেষোক্ত হাদিসটির অর্থ— আল্লাহর নামসমগ্রের মাঝে এমন বিশেষ নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে যাবে। এই নামগুলো ছাড়াও তাঁর যে আরও নাম থাকতে পারে, সে ব্যাপারটিকে আলোচ্য হাদিস নাকচ করে না। এর দৃষ্টান্ত হলো— আপনার এমন কথা বলা যে, আমার কাছে পঞ্চাশটি বর্ম আছে, যা আমি জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছি। এর মানে মানে এই নয় যে, আপনার কাছে আরও বর্ম থাকতে পারে না।

[22] মুসনাদে আহমাদ, হা. ৩৭১২; সিলসিলা সহিহা, হা. ১৯৯; সনদ : সহিহ।

[23] সহিহুল বুখারি, হা. ২৭৩৬; সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৭৭।

আর হাদিসে উদ্ধৃত আল্লাহর নামসমগ্র আয়ত্ত করার অর্থ : এগুলোর শব্দ জানা, শব্দগুলোর অর্থ জানা এবং এসব নামের দাবি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহর নামসমগ্রের প্রতি আনীত ইমান কীভাবে পরিপূর্ণ হবে?

(كيف يتم الإيمان بأسماء الله)

আল্লাহর নাম যদি সকর্মক (কর্ম বা প্রভাব সংবলিত এমন, transitive) হয়, তাহলে উক্ত নামের প্রতি তখনই পরিপূর্ণ ইমান আনয়ন সম্পন্ন হবে— যখন সেই নাম, নামের অন্তর্গত সিফাত তথা গুণ এবং উক্ত নামের যেই প্রভাব অপরিহার্যভাবে চলে আসে তার প্রতি (উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রতি) ইমান আনা হবে। যেমন আর-রহিম (দয়াবান)। এক্ষেত্রে আপনি নাম সাব্যস্ত করবেন, আল্লাহ হলেন আর-রহিম। নামের অন্তর্গত সিফাত সাব্যস্ত করবেন, আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ—রহমত তথা দয়া। নামের প্রভাব সাব্যস্ত করবেন, মহান আল্লাহ এই রহমত তথা দয়া দিয়ে (সৃষ্টিকুলের প্রতি) রহম করে থাকেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহর নাম যদি অকর্মক (কর্ম বা প্রভাব সংবলিত নয় এমন, intransitive) হয়, তাহলে উক্ত নামের প্রতি তখনই পরিপূর্ণ ইমান আনয়ন সম্পন্ন হবে, যখন সেই নাম এবং নামের অন্তর্গত সিফাত তথা গুণের প্রতি (উল্লিখিত দুটো বিষয়ের প্রতি) ইমান আনা হবে। যেমন আল-হাই (চিরজীবী)। এক্ষেত্রে আপনি নাম সাব্যস্ত করবেন, আল্লাহ হলেন আল-হাই। নামের অন্তর্গত সিফাত সাব্যস্ত করবেন, আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ—হায়াত তথা জীবন। এর ওপর ভিত্তি করেই বলতে হয়, আল্লাহর প্রতিটি নামই সিফাতকে ধারণ করে, কিন্তু প্রতিটি সিফাত আল্লাহর নামকে ধারণ করে না (তাঁর সব নাম থেকেই সিফাত সাব্যস্ত হয়, কিন্তু সব সিফাত থেকে তাঁর নাম সাব্যস্ত হয় না)।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে মহান আল্লাহর গুণাবলির প্রকার

(أقسام الصفات باعتبار الثبوت وعدمه)

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে মহান আল্লাহর গুণাবলি দু ভাগে বিভক্ত—

এক. ইতিবাচক গুণাবলি (الصفات الثبوتية) : যেসব গুণ আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে ইতিবাচক গুণাবলি (positive attributes) বলে। যেমন : জীবন, জ্ঞান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য।

দুই. নেতিবাচক গুণাবলি (الصفات السَلبية) : যেসব গুণ আল্লাহ নিজের থেকে নাকচ করেছেন, সেগুলোকে নেতিবাচক গুণাবলি (negative attributes) বলে। যেমন : ক্লান্তি, অত্যাচার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য।

নেতিবাচক গুণাবলির ক্ষেত্রে এসব গুণ থেকে যে নেতিবাচক বিষয় এবং এর বিপরীত ইতিবাচক বিষয় সাব্যস্ত হয়, সেসবের (নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়ের) প্রতি ইমান আনাও ওয়াজিব। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.

"তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না।"[24] এক্ষেত্রে আল্লাহ যে জুলুম থেকে মুক্ত তার প্রতি ইমান রাখা এবং এর বিপরীত বিষয় জুলুমবিহীন পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা যে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হয়, তার প্রতিও ইমান রাখা ওয়াজিব।

---

[24] সুরা কাহফ : ৪৯।

স্থায়ীত্ব ও নতুনভাবে হওয়ার বিবেচনায় আল্লাহর গুণাবলির প্রকার[25]

(أقسام الصفات باعتبار الدوام والحدوث)

এই বিবেচনায় আল্লাহর গুণাবলি দু ভাগে বিভক্ত—

এক. সার্বক্ষণিক বা চিরন্তন গুণাবলি (الصفات الدائمة) : যেসব গুণে আল্লাহ সীমাহীন অতীত থেকে সদা বিশেষিত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, সেগুলোকে সার্বক্ষণিক বা চিরন্তন গুণাবলি বলা হয়। যেমন : আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা প্রভৃতি। এগুলোকে সত্তাগত গুণরাজিও (الصفات الذاتية) বলা হয়ে থাকে।

দুই. যেসব গুণ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা কার্যকর করেন, আবার ইচ্ছা করলে তা কার্যকর করেন না। যেমন : দুনিয়ার আকাশে মহান আল্লাহর অবতরণ। **এগুলোকে কর্মগত গুণরাজি (الصفات الفعلية) বলা হয়ে থাকে।**

কখনো কখনো একটি সিফাত সত্তাগত ও কর্মগত উভয়ই হয়ে থাকে, যখন দুটো আলাদা দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। যেমন :

---

[25] **অনুবাদকের টীকা :** শাইখ সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের দারসে বলেছেন, *'কথাটি এভাবে বললে আরও বেশি ভালো হতো যে, আল্লাহর সত্তা ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্টতার বিবেচনায় আল্লাহর গুণাবলির প্রকার।'* **টীকা সমাপ্ত।**

কথা বলার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের মূলের দিকটি বিবেচনায় আনলে সাব্যস্ত হয়— এটি একটি সত্তাগত সিফাত। কেননা মহান আল্লাহ কথা বলার গুণে অতীত থেকেই সদা বিশেষিত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আবার কথার একক ও অংশের বিবেচনায়, অর্থাৎ মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে (একটির পর একটি) কথা বলে থাকেন, সেই বিবেচনায় এটি একটি কর্মগত সিফাত। কেননা *'কথা বলা'* আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত।

ইলহাদের পরিচয় (تعريف الإلحاد)

আভিধানিক অর্থে, ইলহাদ মানে ঝুঁকে যাওয়া (الميل)।

পরিভাষায়, الميل عما يجب اعتقاده أو عمله "যা বিশ্বাস করা বা আমল করা ওয়াজিব, তা এড়িয়ে (ভিন্নপথে) যাওয়াকে ইলহাদ বলে।"

ইলহাদ আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ.﴾.

"আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ করে।"[26]

---

[26] সুরা আরাফ : ১৮০।

আবার ইলহাদ আল্লাহর আয়াত ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾.

“যারা আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে তারা আমার কাছে গোপনীয় নয়।”[27]

আল্লাহর নামসমগ্রে ইলহাদ চারভাবে হয়ে থাকে :

১. আল্লাহর কোনো নাম অস্বীকার করা কিংবা নামের অন্তর্গত কোনো গুণকে অস্বীকার করা। যেমন কাজ জাহমিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে।

২. আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেননি, সে নামে তাঁকে নামকরণ করা। যেমন খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে ‘পিতা (الأب)’ বলে থাকে।

৩. আল্লাহর নামের মর্মার্থ থেকে সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়, এমন বিশ্বাস রাখা। যেমনটি মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে।

---

[27] সুরা ফুসসিলাত : ৪০।

৪. আল্লাহর নাম থেকে মূর্তির নাম নির্গত করা। যেমন মুশরিকরা আল্লাহর *‘আল-আজিজ (মহাপরাক্রমশালী)’* নাম থেকে *‘উজ্জা’* নাম নির্গত করেছিল।[28]

পক্ষান্তরে আল্লাহর আয়াতের ক্ষেত্রে ইলহাদ দুভাবে হয়ে থাকে :

১. সৃষ্টিগত আয়াত তথা নিদর্শনাবলিতে ইলহাদ করা। সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলি হলো সৃষ্টিরাজি। এগুলোর একক স্রষ্টা যে মহান আল্লাহ, তা অস্বীকার করা। এরকম বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এককভাবে এসবের স্রষ্টা, কিংবা এসবের কিয়দংশের স্রষ্টা, অথবা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক, কিংবা আল্লাহকে সহয়তাকারী।

---

[28] **অনুবাদকের টীকা :** ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ অতিরিক্ত আরেকটি প্রকার-সহ মোট পাঁচ প্রকার ইলহাদ উল্লেখ করেছেন। **অতিরিক্ত প্রকারটি হলো—** আল্লাহকে এমন গুণে গুণান্বিত করা, যা থেকে তিনি পবিত্র। যেমন ইহুদিরা বলেছিল, ‘আল্লাহর হাত আবদ্ধ (যা দান-খয়রাত করতে পারে না)।’ সুরা মায়িদা : ৬৪। **দ্রষ্টব্য :** ইবনুল কাইয়্যিম, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ*** (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, তাবি), খ. ১, পৃ. ১৬৯-১৭০।

শাইখ সালিহ আল-উসাইমি এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের দারসে জানিয়েছেন, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ইলহাদের এই শ্রেণিবিভাগটি সুশৃঙ্খল ও নিরীক্ষিত নয়। এরচেয়ে অধিকতর সুশৃঙ্খল ও তাহকিকি প্রকারভেদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর *‘আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা’* ও *‘আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া’* গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত প্রকারভেদ অনুযায়ী ইলহাদ তিন প্রকার। যথা : (১) নামের অর্থ অস্বীকার করা। (২) আল্লাহর নাম অস্বীকার করা। (৩) নামের মধ্যে শরিক স্থাপন করা, যেমন মুশরিকরা আল্লাহর *‘আজিজ’* নাম থেকে তাদের মূর্তির নাম দিয়েছিল *উজ্জা।* **দ্রষ্টব্য :** ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৭; ইবনুল কাইয়্যিম, ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া*** (শাইখ ফাওজানের ভাষ্য-সহ), পৃ. ৮১৫। **টীকা সমাপ্ত।**

২. শরয়ি আয়াতে ইলহাদ করা। শরয়ি আয়াত হলো নবিগণের প্রতি নাজিলকৃত ওহি। এসব আয়াতকে বিকৃত করা, অথবা অস্বীকার করা, কিংবা এসবের বিরোধিতা করা। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর গুণাবলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ— সংক্ষিপ্ত ও বিশদ বিবরণ দেওয়া

(طريقة القرآن والسنة في صفات الله : الإجمال والتفصيل)

মূলপাঠ :

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ: بَيْنَ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ. فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ المُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

মহান আল্লাহ নিজেকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন এবং নিজেকে গুণান্বিত করেছেন যেসব গুণে, সেসবের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিককেই তিনি একত্র করেছেন। এজন্য রসুলগণ আনীত দিন থেকে বিচ্যুত হওয়া আহলুস সুন্নাহর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তাঁদের আনীত দিনই সরল পথ। এ পথ তাঁদের, যাঁদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। যেসব অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্গত। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ— অধিকাংশ সময় নাকচ করার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে উল্লেখ করা এবং সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ দেওয়া। কেননা নাকচ করার সময় বিশদ বিবরণের চেয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই পবিত্রঘোষণার ক্ষেত্রে অধিক পূর্ণতর ও জোরালো হয়ে থাকে। এজন্য কুরআন-সুন্নাহয় আপনি ইতিবাচক গুণাবলিই বেশি পরিমাণে পাবেন। যেমন : আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়াবান প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে নেতিবাচক গুণাবলির সংখ্যা কম। যেমন : আল্লাহ জুলুম থেকে মুক্ত, তদ্রূপ ক্লান্তি, অমনোযোগ, জন্মদান, সদৃশ, সমতুল্য ও সমকক্ষ থেকেও মুক্ত। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

সুরা ইখলাসে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি

(الأسماء والصفات الإلٰهية في سورة الإخلاص)

মূলপাঠ :

وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ : مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ، الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، حَيْثُ يَقُولُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

মহান আল্লাহ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ সুরা ইখলাসের মধ্যে নিজেকে যেসব সিফাত তথা গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা উল্লিখিত মূলনীতির আওতাভুক্ত। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহই স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তা (যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে যিনি সবার কাছে কাংঙ্ক্ষিত)। তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।"[29] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

সুরা ইখলাস (একনিষ্ঠতার সুরা) হলো—

[29] সুরা ইখলাস : ১-৪।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

এ সুরাকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ এ সুরাকে নিজের জন্য একনিষ্ঠ করেছেন। এ সুরায় আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যকিছু উল্লেখ করেননি। এই নামে নামকরণ করার আরও একটি কারণ— এ সুরা তার পাঠককে শির্ক ও তাতিল (অস্বীকার, অপব্যাখ্যা ও অর্থ-অস্বীকৃতি) থেকে নিষ্কৃতি দান করে।

এ সুরা অবতীর্ণের কারণ— একদা মুশরিকরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে বলেছিল, "আমাদেরকে তোমার প্রভুর বংশধারা জানিয়ে দাও, তিনি আসলে কোথা থেকে এসেছেন!"[30]

আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ।[31] কেননা কুরআনে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত সংবাদ, তাঁর সৃষ্টিরাজি সম্পর্কিত সংবাদ এবং বিধিবিধান তথা আদেশনিষেধ। সুরা

[30] তিরমিজি, হা. ৩৩৬৪; সনদ : হাসান (তাহকিক : আলবানি ও সালিহ আল-উসাইমি)।

[31] সহিহুল বুখারি, হা. ৫০১৩; সহিহ মুসলিম, হা. ৮১১।

ইখলাসে প্রথম বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কিত সংবাদ।

এতে রয়েছে আল্লাহর নাম— আল্লাহ, আল-আহাদ (এক) এবং আস-সামাদ (অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ)। **ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে ইবাদত করা হয় এমন সত্য উপাস্য হলেন আল্লাহ।** সকল শরিক ও সদৃশ থেকে আলাদা এমন একক সত্তা হলেন আল-আহাদ। আর নিজের সমুদয় গুণের ক্ষেত্রে যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পুরো সৃষ্টিরাজি যাঁর মুখাপেক্ষী হয়, তিনি হলেন আস-সামাদ।

এ সুরায় রয়েছে পূর্বোক্ত নামগুলোতে উল্লিখিত গুণাবলি-সহ আরও বেশকিছু গুণ :

১. আল্লাহর উপাস্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য

২. একত্ব

৩. অমুখাপেক্ষিতা

৪. জনক না হওয়া (নিঃসন্তান হওয়া)। কেননা তিনি সন্তান থেকে অমুখাপেক্ষী এবং তাঁর কোনো সদৃশ নেই।

৫. জাতক (জন্মগ্রহণকারী) না হওয়া। কেননা তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম, যাঁর পূর্বে কোনোকিছুই নেই।

৬. আল্লাহর সমকক্ষ না থাকা। অর্থাৎ গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর সমতুল্য না থাকা। কেননা আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই। যেহেতু তাঁর

গুণগুলো পরিপূর্ণ (সেসবে কোনো কমতি ও ত্রুটি নেই)। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি

(الأسماء والصفات الإلٰهية في آية الكرسي)

মূলপাঠ :

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ، حَيْثُ يَقُولُ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾. وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فِي لَيْلَةٍ؛ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ. وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾.

তদ্রুপ আল্লাহ তাঁর কিতাবের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াতে নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেগুলোও উক্ত মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন এমন সত্তা, তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, আর না করতে পারে নিদ্রাও। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে শাফায়াত (সুপারিশ) করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি তাদের (সৃষ্টিকুলের) বিগত ও আগত-আসন্ন সবকিছুই জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো অংশকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে

যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। তাঁর কুরসি (মহান আল্লাহর দুই পা রাখার স্থান) সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর আসমান ও জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাকে ক্লান্ত হতে হয় না। বস্তুত তিনিই সর্বোচ্চ (সবকিছুর ওপরে) এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান।”[32]

এজন্য যে ব্যক্তি রাতে এ আয়াত পাঠ করে, আল্লাহর তরফ থেকে তার জন্য একজন সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত হয়ে যায়, আর প্রভাত পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।

আল্লাহ আরও বলেছেন, “তুমি ভরসা করো তাঁর ওপর, যিনি চিরজীবী, যিনি কখনো মারা যাবেন না।”[33] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আয়াতুল কুরসি হলো মহান আল্লাহর এই বাণী—

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ.[34]

[32] সুরা বাকারা : ২৫৫।

[33] সুরা ফুরকান : ৫৮।

[34] সুরা বাকারা : ২৫৫।

এ আয়াতে কুরসির উল্লেখ থাকায় একে ‘আয়াতুল কুরসি’ বলা হয়। এটি আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। যে ব্যক্তি রাতে এ আয়াত পাঠ করে, আল্লাহর তরফ থেকে তার জন্য একজন সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত হয়ে যায়, আর প্রভাত পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।

এ আয়াতে রয়েছে আল্লাহর এসকল নাম— **আল্লাহ**, এ নামের অর্থ গত হয়েছে; আল-হাই (চিরজীবী), আল-কাইয়্যুম (সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন এমন সত্তা), আল-আলি (সর্বোচ্চ), আল-আজিম (সবচেয়ে মর্যাদাবান)।

আল-হাই মূলত তিনি, যাঁর পরিপূর্ণ জীবন আছে, যে জীবন এমনসব পরিপূর্ণ গুণকে ধারণ করে, অতীতে যেসবের কোনো অস্তিত্বহীনতা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও যেগুলো কখনো বিলীন হবে না।

আল-কাইয়্যুম হলেন তিনি, যিনি নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন এমন সত্তা। যিনি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, আর সকল কিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী।

আল-আলি হলেন তিনি, যিনি সত্তাগতভাবে সর্বোচ্চ, সবকিছুর ওপরে, আবার স্বীয় সিফাতের পরিপূর্ণতার দিক থেকেও তিনি সর্বোচ্চ, কোনো কমতি ও ত্রুটি যুক্ত হয় না তাঁর সাথে।

আল-আজিম হলেন তিনি, যিনি বড়োত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।

উল্লিখিত পাঁচটি নামে আল্লাহর পাঁচটি গুণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও এ আয়াতে রয়েছে আল্লাহর নিম্নোক্ত গুণ :

৬. উপাস্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যে আল্লাহর একত্ব

৭. তন্দ্র ও নিদ্রা থেকে তাঁর মুক্ত থাকা। তন্দ্রা মানে ঝিমুনি। কারণ তাঁর জীবন ও সর্বধারণক্ষমতা পরিপূর্ণ।

৮. সর্বব্যাপী রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে, ***'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর।'***

৯. তাঁর বড়োত্ব ও রাজত্বের পূর্ণতা। যেহেতু তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ তাঁর কাছে শাফায়াত করতে পারে না।

১০. তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতা ও সর্বব্যাপিতা। যেহেতু আয়াতে বলা হয়েছে, ***'তিনি তাদের (সৃষ্টিকুলের) সামনের সবকিছু জানেন।'*** অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু। ***'এবং তাদের পেছনের সবকিছু জানেন।'*** অর্থাৎ অতীতের সবকিছু।

১১. ইচ্ছা।

১২. তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা। যেহেতু তাঁর সৃষ্টিরাজি সুবিশাল। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে, ***'তাঁর কুরসি (মহান আল্লাহর দুই পা রাখার স্থান) সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে।'***

১৩. তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, ক্ষমতা, সংরক্ষণশক্তি ও দয়া। যেহেতু আয়াতে বলা হয়েছে, ***'আর আসমান ও জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে***

তাকে ক্লান্ত হতে হয় না।’ আকাশ ও পৃথিবী রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাঁকে ভারাক্রান্ত ও অপারগ হতে হয় না।

কুরসির বিবরণ (بيان الكرسي)

কুরসি দয়াময় আল্লাহর দুই পা রাখার স্থান। এটি সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টিগুলোর অন্যতম। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে,

ما السموات السبع والأَرَضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة أُلقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة.

“নিশ্চয় সাত আসমান ও সাত জমিন কুরসির তুলনায় একটি আংটির মতো, যাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে দুনিয়ার কোনো মরুভূমিতে। আর নিশ্চয় কুরসির ওপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন মরুভূমির শ্রেষ্ঠত্ব এই আংটির ওপর।”[35] এ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার বিশালতা প্রতীয়মান হয়।

---

[35] আবু নুআইম, ***হিলয়াতুল আউলিয়া***, খ. ১, পৃ. ১৬৭; ইবনু আবি শাইবা, ***আল-আরশ***, হা. ৫৮; বাইহাকি, ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত***, হা. ৮৬২; সিলসিলা সহিহা, হা. ১০৯; সনদ : সহিহ।

কুরসি আসলে আরশ নয়। কারণ কুরসি আল্লাহর দুই পা রাখার স্থান।[36] পক্ষান্তরে আরশ সেটা, যার ওপর আল্লাহ আরোহণ করেছেন। পরন্তু কুরআন-সুন্নাহর দলিল থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আরশ ও কুরসি আলাদা। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

[36] বিষয়টি সাহাবি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে। দেখুন : ইবনু আবি শাইবা, ***আল-আরশ***, হা. ৬১; মুস্তাদরাকুল হাকিম, খ. ২, পৃ. ২৮২; সনদ : সহিহ।

সুরা হাদিদের ৩নং আয়াতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি

(الأسماء والصفات الإلهية في الآية الثالثة من سورة الحديد)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

(অনুরূপভাবে সামনে আসন্ন আয়াতগুলোও উল্লিখিত মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে) মহান আল্লাহ বলেছেন, "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই সর্বোচ্চ, তিনিই সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"[37] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহ বলেছেন, "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই সর্বোচ্চ, তিনিই সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"[38] আয়াতে উল্লিখিত প্রথম চারটি নামের ব্যাখ্যা স্বয়ং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। **আল-আওয়্যাল (সর্বপ্রথম)** হলেন

[37] সুরা হাদিদ : ৩।

[38] সুরা হাদিদ : ৩।

তিনি, যাঁর পূর্বে কিছুই নেই। **আল-আখির (সর্বশেষ)** হলেন তিনি, যাঁর পরে কিছুই নেই। **আজ-জাহির (সর্বোচ্চ)** হলেন তিনি, যাঁর ওপরে কিছুই নেই। **আল-বাতিন (সবচেয়ে নিকটবর্তী)** হলেন, যাঁর চেয়ে নিকটে কোনোকিছু নেই।[39]

এরপর আল্লাহ আয়াতে বলেছেন, ***'তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।'*** অর্থাৎ সামগ্রিক ও বিশদভাবে তাঁর ইলম সবকিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে। ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

---

[39] সহিহ মুসলিম, হা. হা. ২৭১৩, জিকির অধ্যায় (৪৯), পরিচ্ছেদ : ১৭।

মহান আল্লাহর জ্ঞান (علم الله)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾. ﴿الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾. ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾. ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾. ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, "তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাবান।"[40] তিনি আরও বলেছেন, "তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। যা ভূমিতে প্রবেশ করে, ভূমি থেকে বের হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয়, আর যা আকাশে ওঠে যায়, সবই তিনি জানেন।"[41] তিনি বলেছেন, "অদৃশ্যের চাবিকাঠি (ধনভাণ্ডার) তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবী ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতির বাইরে গাছ হতে একটি পাতাও পড়ে না। জমিনের গহীন অন্ধকারে কোনো শস্যদানা নেই, নেই কোনো ভেজা ও শুকনো জিনিস, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।"[42] তিনি

---

[40] সুরা তাহরিম : ২।

[41] সুরা সাবা : ১-২।

[42] সুরা আনআম : ৫৯।

বলেছেন, “তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না।”[43] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

কোনোকিছুকে যথাযথভাবে জানাকে ইলম তথা জ্ঞান বলে। আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ, যা সার্বিক ও বিশদভাবে সবকিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর সার্বিক জ্ঞানের অন্যতম দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

“আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী।”[44]

আর তাঁর বিশদ জ্ঞানের অন্যতম দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾.

“অদৃশ্যের চাবিকাঠি (ধনভাণ্ডার) তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবী ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতির বাইরে গাছ হতে একটি পাতাও পড়ে

---

[43] সুরা ফুসসিলাত : ৪৭।

[44] সুরা নিসা : ১৭৬।

না। জমিনের গহীন অন্ধকারে কোনো শস্যদানা নেই, নেই কোনো ভেজা ও শুকনো জিনিস, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।"[45]

মহান আল্লাহ যে তাঁর সৃষ্টিকুলের অবস্থা সম্পর্কেও জানেন, তার অন্যতম দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

"তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবগত।"[46]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিজিক আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। তিনি প্রত্যেকের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল সম্পর্কে জানেন; সবই রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহে মাহফুজে)।"[47]

আর **গায়েবের মাফাতিহ (مفاتح الغيب)** মানে অদৃশ্যের ধনভাণ্ডার কিংবা অদৃশ্যের চাবিকাঠি। অদৃশ্যের চাবিকাঠিগুলোর কথা মহান আল্লাহর এই বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে :

---

[45] সুরা আনআম : ৫৯।

[46] সুরা বাকারা : ২৮৩।

[47] সুরা হুদ : ৬।

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

"কেয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃজঠরে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন জায়গায় সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"[48] আয়াতে উল্লিখিত **'খবির (সবিশেষ অবহিত)'** হলেন তিনি, যিনি সবকিছুর ভেতরের বা গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।[49] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

[48] সুরা লুকমান : ৩৪।

[49] উক্ত আয়াতে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় অদৃশ্যের চাবিকাঠি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এ কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে সাব্যস্ত হয়েছে। **দ্রষ্টব্য :** সহিহুল বুখারি, হা. ৪৬২৭ ও ৪৬৯৭। – ***অনুবাদক।***

আল্লাহর ক্ষমতা (القدرة)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “যেন তোমরা বুঝতে পার, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং (স্বীয়) জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন।”[50] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

কুদরত তথা ক্ষমতা মানে কোনোরূপ অপারগতা ছাড়াই কাজ করার সক্ষমতা। আল্লাহর ক্ষমতা সর্বব্যাপী। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

“আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।”[51] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[50] সুরা তালাক : ১২।

[51] সুরা বাকারা : ২৮৪।

আল্লাহর শক্তি (القوة)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহই রিজিকদাতা, তিনি শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”[52] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

কোনো দুর্বলতা ছাড়াই কাজ করার সক্ষমতাকে শক্তি বলে। মহান আল্লাহর এই গুণের দলিল— তাঁর এই কথা, “নিশ্চয় আল্লাহই রিজিকদাতা, তিনি শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”[53] আয়াতে উদ্ধৃত **আল-মাতিন (পরাক্রমশালী)** মানে প্রচণ্ড শক্তিধর। **শক্তি (القوة) ও কুদরতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—** শক্তি একদিক থেকে কুদরতের চেয়ে অধিক নির্দিষ্ট, আবার আরেকদিক থেকে অধিক ব্যাপক। চেতনাশীল কুদরতওয়ালা প্রাণীর বিবেচনায় এটি অধিক নির্দিষ্ট। কেননা এতে কুদরত এবং তারচেয়ে অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে। পক্ষান্তরে এর অবস্থান যেরূপ ব্যাপক, সে বিবেচনায় এটি কুদরতের চেয়ে অধিকতর

[52] সুরা জারিয়াত : ৫৮।

[53] সুরা জারিয়াত : ৫৮।

ব্যাপক। কারণ শক্তির (القوة) গুণে চেতনাশীল ও চেতনাহীন সবাইকেই গুণান্বিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ লোহাকে 'শক্তিশালী (قوي)' বলা হয়, কিন্তু 'ক্ষমতাবান (قادر)' বলা হয় না। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর ‘*আল-হাকিম*’ নামের অর্থ এবং এ নামের আওতাভুক্ত গুণাবলি[54]

(الحكيم والصفات المستخرجة منه)

ব্যাখ্যা :

(হাকিম নাম থেকে থেকে প্রাপ্ত সিফাত তথা গুণ—) **হিকমা মানে** যাবতীয় জিনিসকে তার যথাস্থানে সুনিপুণভাবে স্থাপন করা (هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن)। মহান আল্লাহ এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾.

“তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাবান।”[55]

---

[54] **অনুবাদকের টীকা :** আল্লাহর *‘আল-হাকিম’* নামের ব্যাপারে *‘আল্লাহর জ্ঞান’* শীর্ষক আলোচনায় আয়াত উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম ইবনু উসাইমিন যেহেতু সেখানে *‘হাকিম’* নাম নিয়ে আলোচনা না করে এখানে করছেন, সেহেতু পুনরায় আয়াতটি উল্লেখ করছি। আল্লাহ বলেছেন, وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ “তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাবান।” **দ্রষ্টব্য :** সুরা তাহরিম : ২। **টীকা সমাপ্ত।**

[55] সুরা তাহরিম : ২।

আল-হাকিম নামের দুটো অর্থ রয়েছে :

এক. যিনি হিকমাসম্পন্ন। আল্লাহ হিকমা ছাড়া কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেন না এবং কোনোকিছু সৃষ্টিও করেন না। আর হিকমা ছাড়া তিনি কোনো বিষয় থেকে নিষেধও করেন না।

দুই. যিনি হুকুমদাতা। আল্লাহ যা ইচ্ছা হুকুম দেন। তাঁর হুকুমকে রদ করার কেউ নেই।

আল্লাহর হিকমার প্রকার :

আল্লাহর হিকমা দু ধরনের। যথা : **(১)** শরয়ি হিকমা, **(২)** সৃষ্টিগত হিকমা। শরয়ি হিকমার স্থান হলো শরিয়ত। আর রসুলগণ যে ওহি তথা প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছেন, সেটাই শরিয়ত। শরিয়তের সবকিছুই চূড়ান্ত কল্যাণকর ও সুনিপুণ। অপরপক্ষে সৃষ্টিগত হিকমার স্থান হলো সৃষ্টিজগত। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিরাজি। সুতরাং আল্লাহ যতকিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সবই সর্বোচ্চ কল্যাণকর ও সুনিপুণ।

আল্লাহর হুকুমের প্রকার :

আল্লাহর হুকুম দু ধরনের। যথা : **(১)** সৃষ্টিগত হুকুম **(২)** শরয়ি হুকুম।

মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে এবং ভাগ্যনির্ধারণ করে যে ফয়সালা দেন, সেটাই **সৃষ্টিগত হুকুম** (এ হুকুম সদাসর্বদা বাস্তবায়িত হয়, এর কোনো লঙ্ঘন হয় না)। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

যেখানে আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের এক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন :

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾.

"আমি কিছুতেই এই দেশ ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন, অথবা (আমাদের ভাই *বেনিয়ামিনকে* মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ আমার জন্য কোনো হুকুম (ফয়সালা) দিচ্ছেন।"[56]

অপরপক্ষে আল্লাহ শরয়িভাবে তথা শরিয়তে যে ফয়সালা দেন, সেটাই **শরয়ি হুকুম।** এর দলিল— এই আয়াত, যেখানে (কাফির ও মুমিন নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখার বিধান আলোচনা করে) আল্লাহ বলেছেন :

﴿ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾.

"এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন।"[57] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[56] সুরা ইউসুফ : ৮০।

[57] সুরা মুমতাহানা : ১০।

আল্লাহর রিজিকদান (الرَّزّْق)[58]

ব্যাখ্যা :

রিজিকপ্রাপ্ত সৃষ্টিকে উপকারী বিষয় প্রদান করার নাম রিজিকদান। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

"নিশ্চয় আল্লাহই রিজিকদাতা।"[59]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾.

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিজিক আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।"[60]

---

58 **অনুবাদকের টীকা :** আল্লাহর *'রিজিকদান'* গুণটির ব্যাপারে মূলপাঠে যে আয়াত এনেছেন শাইখুল ইসলাম, তা শাইখ আব্দুল মুহসিন কাসিমের তাহকিককৃত *'আকিদা ওয়াসিতিয়্যার'* ধারাবাহিকতা অনুযায়ী *'আল্লাহর শক্তি'* শীর্ষক আলোচনায় গত হয়েছে। বিধায় এখানে মূলপাঠ ছাড়াই স্রেফ ব্যাখ্যা উল্লিখিত হচ্ছে। **টীকা সমাপ্ত।**

59 সুরা জারিয়াত : ৫৮।

60 সুরা হুদ : ৬।

আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক দু ধরনের : (১) ব্যাপক রিজিক (الرزق العام), **(২)** নির্দিষ্ট রিজিক (الرزق الخاص)। **ব্যাপক রিজিক** তাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে শরীর প্রতিপালিত হয়। যেমন : খাবার প্রভৃতি। এই রিজিক সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক (সবাই এ রিজিক পায়)। পক্ষান্তরে **নির্দিষ্ট রিজিক** তাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। যেমন : ইমান, ইলম ও সৎ আমল। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন

(السمع والبصر)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

আল্লাহ বলেছেন, "তাঁর সদৃশ (মতো) কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[61] আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[62] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[63]

---

[61] সুরা শুরা : ১১।

[62] সুরা নিসা : ৫৮।

[63] বিদাতি কুল্লাবি-আশারি-মাতুরিদিদের খণ্ডনের জন্য আল্লাহর শোনা ও দেখা — গুণদুটোর ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম পুনরায় সামনে আয়াত নিয়ে এসেছেন। এজন্য ইমাম ইবনু উসাইমিন এখানে উক্ত সিফাতদুটোর আলোচনা না করে পরবর্তীতে করেছেন। এই গুণদ্বয়ের ব্যাখ্যা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ। – ***অনুবাদক।***

আল্লাহর ইচ্ছা (مَشِيْئَةُ اللهِ)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾. ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, “তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।”[64] তিনি আরও বলেছেন, “আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই সম্পন্ন করে থাকেন।”[65] তিনি বলেছেন, “তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের ওপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলো হালাল নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম দিয়ে থাকেন।”[66] তিনি আরও বলেছেন, “আল্লাহ যাকে হেদায়েত করার

---

[64] সুরা কাহফ : ৩৯।

[65] সুরা বাকারা : ২৫৩।

[66] সুরা মায়িদা : ১।

ইচ্ছা করেন, ইসলামের জন্য তার অন্তর খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তর তিনি খুবই সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকীর্ণ করেন যেন (ইসলাম পালন করতে যেয়ে তার মনে হয়) সে আকাশে আরোহণ করছে।”[67] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর মাশিয়াকে (مَشِيْئَةُ الله) তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা বলা হয়ে থাকে। তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা সর্বব্যাপী। আল্লাহর কর্মাবলি এবং তাঁর বান্দার কর্মাবলিও তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার আওতাভুক্ত। আল্লাহর কর্মাবলির ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾.

“আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম।”[68]

আর বান্দাদের কর্মে আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছার দলিল— তাঁর এই বাণী :

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾.

---

[67] সুরা আনআম : ১২৫।

[68] সুরা সাজদা : ১৩।

"আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তারা এসব কাজ করতে পারত না।"[69]

আল্লাহর ইরাদা (ইচ্ছা) ও তার প্রকার :

আল্লাহর ইরাদা তাঁর একটি অন্যতম সিফাত। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :

(১) সৃষ্টিগত বা জাগতিক ইরাদা, এটা *'মাশিয়া'* শব্দের সমার্থবোধক (অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন, তা ঘটবেই, তার কোনো নড়চড় হবে না)।

(২) শরয়ি ইরাদা, যা ভালোবাসার সমার্থবোধক।[70]

আল্লাহর সৃষ্টিগত বা জাগতিক ইচ্ছার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾.

"আল্লাহ যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, ইসলামের জন্য তার অন্তর খুলে দেন।"[71]

আর আল্লাহর শরয়ি ইচ্ছার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

---

[69] সুরা আনআম : ১৩৭।

[70] অর্থাৎ শরিয়তে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সেটাকে তিনি ভালোবাসেন; আর বান্দা কর্তৃক আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়িতও হতে পারে, আবার লঙ্ঘিতও হতে পারে; যেহেতু শরিয়ত এসেছে বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য। – ***অনুবাদক।***

[71] সুরা আনআম : ১২৫।

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾.

"আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন।"[72]

জাগতিক ইচ্ছা এবং শরয়ি ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য :

জাগতিক ইচ্ছায় যা ইচ্ছা করা হয়, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। জাগতিক ইচ্ছায় যা ইচ্ছা করা হয়, তা কখনো কখনো আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে, আবার কখনো কখনো তা পছন্দনীয় নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে শরয়ি ইচ্ছায় যা ইচ্ছা করা হয়, তা সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয় (বরং সংঘটিত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে)। আর শরয়ি ইচ্ছায় যা ইচ্ছা করা হয়, তা সর্বদাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়ে থাকে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর ভালোবাসা (المحبة والمودة)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

[72] সুরা নিসা : ২৭।

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾. ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. [﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾.]

মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা কল্যাণ সাধন করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ কল্যাণ সাধনকারীদের ভালোবাসেন।”[73] তিনি বলেছেন, “তোমরা সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।”[74] তিনি আরও বলেছেন, “সুতরাং যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে (চুক্তিতে) সঠিক থাকে, তোমরাও তাদের সাথে (চুক্তিতে) সঠিক থাকবে। অবশ্যই আল্লাহ সংযমশীলদের ভালোবাসেন।”[75] তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন তাদেরকেও, যারা পবিত্র থাকে।”[76]

তিনি আরও বলেছেন, “হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্বীয় ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করবে, আল্লাহ অচিরেই (তাদের জায়গায়) এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও ভালোবাসবে আল্লাহকে।”[77] তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে

---

[73] সুরা বাকারা : ১৯৫।

[74] সুরা হুজুরাত : ৯।

[75] সুরা তাওবা : ৭।

[76] সুরা বাকারা : ২২২।

[77] সুরা মায়িদা : ৫৪।

সীসাঢালা প্রাচীরের মতো, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।”[78] তিনি আরও বলেছেন, “তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো, ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।”[79] তিনি আরও বলেছেন, “আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ (তিনি নিজে ভালোবাসেন এবং তাঁকেও ভালোবাসা হয়ে থাকে)।”[80] [81] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর ভালোবাসা একটি অন্যতম কর্মগত সিফাত তথা গুণ। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾.

---

[78] সুরা সফ : ৪।

[79] সুরা আলে ইমরান : ৩১।

[80] সুরা বুরুজ : ১৪।

[81] *‘ওয়াসিতিয়্যার’* প্রসিদ্ধ নুসখাগুলোতে সুরা বুরুজের ১৪নং আয়াতটি নেই। কিন্তু বেশকিছু নুসখায় আয়াতটি রয়েছে এবং ইমাম ইবনু উসাইমিন, ইমাম ইবনু মানি, ইমাম খলিল হাররাস প্রমুখের ব্যাখ্যার কপিগুলোতেও আয়াতটির উপস্থিতি রয়েছে; বিধায় আয়াতটি উল্লেখ করা হলো। – ***অনুবাদক।***

“আল্লাহ অচিরেই (তাদের জায়গায়) এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও ভালোবাসবে আল্লাহকে।”[82]

তিনি আরও বলেছেন :

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾.

“আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ (তিনি নিজে ভালোবাসেন এবং তাঁকেও ভালোবাসা হয়ে থাকে)।”[83]

আয়াতে বর্ণিত ***‘ওয়াদুদ’*** নামের শব্দমূল ‘উদ্ বা ইদ্ (الوُدّ)’ মানে নির্ভেজাল বা খাঁটি ভালোবাসা। **আল্লাহর সিফাত ভালোবাসা মানে ‘সওয়াবদান’ বলে ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ। (১)** কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[82] সুরা মায়িদা : ৫৪।

[83] সুরা বুরুজ : ১৪।

আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া (المغفرة والرحمة)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾. ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾. ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾. ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।"[84] তিনি আরও বলেছেন, "হে আমাদের রব, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী।"[85] তিনি বলেছেন, "আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"[86] তিনি আরও বলেছেন, "আমার দয়া সকল বিষয়কে পরিব্যপ্ত করে রয়েছে।"[87] তিনি বলেছেন, "তোমাদের রব নিজের ওপর দয়া করার বিষয়কে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন।"[88] তিনি আরও বলেছেন, "তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল,

[84] সুরা ফাতিহা : ১।

[85] সুরা গাফির : ৭।

[86] সুরা আহজাব : ৪৩।

[87] সুরা আরাফ : ১৫৬।

[88] সুরা আনআম : ৫৪।

অতিশয় দয়ালু।”[89] তিনি বলেছেন, “আল্লাহই হেফাজতে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সবচেয়ে দয়ালু।”[90] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর যে ক্ষমা সিফাত ও দয়া সিফাত রয়েছে, তার দলিল— মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

“আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।”[91]

পাপ গোপন করা এবং তা মার্জনা করাকে ক্ষমা বলে (المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه**)।** আর দয়া এমন একটি গুণ, যার দাবি হলো— অনুগ্রহ করা এবং নেয়ামত দেওয়া। দয়া সিফাতটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : **এক.** ব্যাপক দয়া (الرحمة العامة) **দুই.** নির্দিষ্ট দয়া (الرحمة الخاصة)।

আল্লাহর ব্যাপক দয়া সবাইকে শামিল করে। এর দলিল— মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

---

[89] সুরা ইউনুস : ১০৭।

[90] সুরা ইউসুফ : ৬৪।

[91] সুরা নিসা : ৯৬।

“আমার দয়া সকল বিষয়কে পরিব্যপ্ত করে রয়েছে।”[92]

তিনি আরও বলেছেন :

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾.

“হে আমাদের রব, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী।”[93]

অপরপক্ষে **আল্লাহর নির্দিষ্ট দয়া** কেবল মুমিনদের জন্য নির্ধারিত। এর দলিল— মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

“আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।”[94]

আল্লাহর রহমত তথা দয়া মানে *‘ইহসান করা বা ইহসানের ইচ্ছা করা’* – এরূপ ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ। (১) কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

92 সুরা আরাফ : ১৫৬।

93 সুরা গাফির : ৭।

94 সুরা আহজাব : ৪৩।

আল্লাহর সন্তুষ্টি, রাগ, অপছন্দ, প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রবল ক্রোধ

(الرضا والغضب والكراهة والمقت والأَسَف)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾. [﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾.] وَقَوْلِهِ: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।”[95] [96] তিনি আরও বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তার মধ্যে সে সর্বদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত

[95] সুরা মায়িদা : ১১৯।

[96] কিছু নুসখায় সুরা মায়িদার ১১৯নং আয়াতটি নেই, যদিও অনেক নুসখায় তা বিদ্যমান রয়েছে। আবার কিছু নুসখায় আয়াতটি অন্য জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। – ***অনুবাদক।***

হন, আর তাকে অভিসম্পাত করেন।”[97] তিনি আরও বলেছেন, “এটা এ জন্য যে, আল্লাহকে যা অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করেছে তারা তা অনুসরণ করেছে এবং অপছন্দ করেছে তাঁর সন্তোষকে। ফলে তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।”[98] তিনি আরও বলেছেন, “নিজেদের জন্য তারা যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, তা সন্দেহাতীতভাবে মন্দ, যেজন্য আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।”[99] [100] তিনি বলেছেন, “যখন তারা আমাকে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত করল, তখন আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিলাম।”[101] তিনি আরও বলেছেন, “কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করলেন এবং তাদেরকে (তৌফিক না দিয়ে) পেছনে ফেলে রাখলেন।”[102] তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা নিজেরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় ঘৃণিত।”[103] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

---

[97] সুরা নিসা : ৯৩।

[98] সুরা মুহাম্মাদ : ২৮।

[99] সুরা মায়িদা : ৮০।

[100] বেশিরভাগ নুসখাতেই সুরা মায়িদার ৮০নং আয়াতটি নেই, যদিও কোনো কোনো নুসখায় তা পাওয়া গেছে। – ***অনুবাদক।***

[101] সুরা যুখরুফ : ৫৫।

[102] সুরা তাওবা : ৪৬।

[103] সুরা সফ : ৩।

সন্তুষ্টি আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ। যার দাবি হচ্ছে— সন্তোষভাজন সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং অনুগ্রহপ্রদান। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾.

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"[104]

অনুরূপভাবে **রাগ তথা ক্রোধও** আল্লাহর আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ। যার দাবি হচ্ছে— ক্রোধভাজন সৃষ্টিকে আল্লাহ অপছন্দ করবেন এবং তাকে শাস্তি দেবেন। এই গুণের নিকটবর্তী আরেকটি গুণ ***'ঘৃণাসংবলিত প্রচণ্ড ক্রোধ (السَّخَط)'।***[105] আল্লাহ যে এই দুটো গুণেই গুণান্বিত, তার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾.

"আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন, আর তাকে অভিসম্পাত করেন।"[106]

---

[104] সুরা মায়িদা : ১১৯।

[105] **অনুবাদকের টীকা :** শাইখ সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের দারসে বলেছেন, السخط : شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر "সাখাত বা সুখ্‌ত মানে প্রবল ঘৃণাসংবলিত প্রচণ্ড ক্রোধ।" **টীকা সমাপ্ত।**

[106] সুরা নিসা : ৯৩।

তিনি আরও বলেছেন :

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

"এটা এ জন্য যে, আল্লাহকে যা অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করেছে তারা তা অনুসরণ করেছে এবং অপছন্দ করেছে তাঁর সন্তোষকে। ফলে তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।"[107]

আর ***'অপছন্দ করা'*** আল্লাহর একটি কর্মগত গুণ, যার দাবি হচ্ছে— অপছন্দনীয় সৃষ্টিকে আল্লাহ বিতাড়িত করবেন এবং তার সাথে শত্রুতা করবেন। এই গুণের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾.

"কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করলেন এবং তাদেরকে (তৌফিক না দিয়ে) পেছনে ফেলে রাখলেন।"[108]

মূলপাঠের আয়াতে বর্ণিত ***'আল-মাক্‌ত'*** মানে প্রচণ্ড ঘৃণা। ঘৃণা মূলত *'অপছন্দের'* অর্থের নিকটতম। প্রচণ্ড ঘৃণা যে আল্লাহর গুণ, তার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

---

[107] সুরা মুহাম্মাদ : ২৮।

[108] সুরা তাওবা : ৪৬।

“তোমরা নিজেরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় ঘৃণিত।”[109]

পক্ষান্তরে মূলপাঠের আয়াতে বর্ণিত *‘আল-আসাফ’* সিফাতের দুটো অর্থ রয়েছে। যথা :

এক. (প্রচণ্ড) রাগ। এই অর্থে উক্ত বৈশিষ্ট্য আল্লাহর জন্য অনুমোদিত। এই বৈশিষ্ট্যের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾.

“যখন তারা আমাকে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত করল, তখন আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিলাম।”[110]

দুই. দুঃখিত বা ব্যথিত হওয়া। এই অর্থ আল্লাহর জন্য অনুমোদিত নয়। এই বৈশিষ্ট্যে আল্লাহকে বিশেষিত করা ঠিক নয়। কেননা দুঃখিত বা ব্যথিত হওয়া একটি ত্রুটিপূর্ণ গুণ। আর আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

***‘সন্তুষ্টি’* সিফাতের মানে সওয়াব দেওয়া, *‘রাগ’* সিফাতের মানে শাস্তি দেওয়া, *‘অপছন্দ’* ও *‘প্রচণ্ড ঘৃণা’* সিফাতদুটোর মানে শাস্তি দেওয়া বলে ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ। (১)** কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য

---

[109] সুরা সফ : ৩।

[110] সুরা যুখরুফ : ৫৫।

অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর আসা ও আগমন (المجيء والإتيان)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾. ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾. ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾. ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “তারা কি কেবল এই অপেক্ষাই করছে যে, সাদা মেঘমালার সাথে আল্লাহ ও ফেরেশতাবর্গ তাদের নিকট সমাগত হবেন? বস্তুত এ বিষয়ের (বা সকল বিষয়ের) ফয়সালা হয়ে গেছে।”[111] তিনি আরও বলেছেন, “তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষাই করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রব আসবেন? অথবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন (পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়) আসবে?”[112] তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে। আর যখন তোমার রব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও আগমন করবে।”[113] তিনি আরও বলেছেন, “সেদিন আকাশ মেঘমালা-সহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে।”[114] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

---

[111] সুরা বাকারা : ২১০।

[112] সুরা আনআম : ১৫৮।

[113] সুরা ফাজর : ২১-২২।

[114] সুরা ফুরকান : ২৫।

ব্যাখ্যা :

'আসা' ও ***'আগমন করা'*** আল্লাহর কর্মগত গুণাবলির অন্তর্গত। আল্লাহর সাথে যেভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, সেভাবেই এ দুটো গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে। উক্ত গুণদ্বয়ের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾.

"যখন তোমার রব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও আগমন করবে।"[115]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾.

"তারা কি কেবল এই অপেক্ষাই করছে যে, সাদা মেঘমালার সাথে আল্লাহ ও ফেরেশতাবর্গ তাদের নিকট সমাগত হবেন? বস্তুত এ বিষয়ের (বা সকল বিষয়ের) ফয়সালা হয়ে গেছে।"[116]

উক্ত গুণ দুটোকে *'আল্লাহর নির্দেশের আসা বা আগমন'* বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না (হারাম হবে)। (১) কেননা তা শব্দের

---

[115] সুরা ফাজর : ২১-২২।

[116] সুরা বাকারা : ২১০।

প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে।

মূলপাঠে উদ্ধৃত আয়াতে বলা হয়েছে, أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ "(তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষাই করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রব আসবেন?) অথবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে?"[117] **নিদর্শন বলতে উদ্দেশ্য—** পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, যার মাধ্যমে রুদ্ধ হবে তওবার প্রক্রিয়া। যেমনটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিদর্শনের ব্যাখ্যা হিসেবে সুসাব্যস্ত হয়েছে।[118]

আল্লাহর আগমনের দলিল হিসেবে লেখক এ আয়াত উল্লেখ করেছেন—

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا﴾.

"সেদিন আকাশ মেঘমালা-সহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে।"[119] অথচ এতে আগমনের কোনো উল্লেখ নেই। কারণ মেঘমালা-সহ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং

---

117 সুরা আনআম : ১৫৮।

118 সহিহুল বুখারি, হা. ৪৬৩৬; সহিহ মুসলিম, হা. ১৫৭।

119 সুরা ফুরকান : ২৫।

ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার দুটো তখনই ঘটবে, যখন বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ আগমন করবেন। দুটো বিষয়ের একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার দরুন একটিকে দিয়ে অপরটির দলিল গ্রহণ করা হয়ে থাকে; এই দলিলটি এরূপ বিষয়েরই অন্তর্গত। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর চেহারা (الوجه)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, “রয়ে যাবে কেবল তোমার রবের গৌরবময় ও মহানুভব চেহারা।”[120] তিনি আরও বলেছেন, “আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল।”[121] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

চেহারা আল্লাহর একটি প্রমাণিত সত্তাগত গুণ। আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে বাস্তবিক অর্থেই তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾.

“রয়ে যাবে কেবল তোমার রবের গৌরবময় ও মহানুভব চেহারা।”[122] *‘জালাল’* মানে গৌরব, মহত্ত্ব। আর *‘ইকরাম’* মানে

---

[120] সুরা রহমান : ২৭।

[121] সুরা কাসাস : ৮৮।

[122] সুরা রহমান : ২৭।

আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য *প্রস্তুতকৃত সম্মাননা* তাদেরকে প্রদান করা। **আল্লাহর চেহারাকে 'সওয়াব দেওয়া' বলে ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ।** **(১)** কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**[123]

---

[123] **অনুবাদকের টীকা :** মহান আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করার জন্য যেসব আয়াত পেশ করা হয়েছে, সেগুলো অনেকে ভুলভাবে বোঝে এবং আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে আপত্তি পেশ করে বলে, *'তাহলে কি আল্লাহর চেহারা বাদে তাঁর সমুদয় সত্তা ধ্বংস হয়ে যাবে?'* আমরা বলি, এ আয়াতে ব্যবহৃত "সবকিছু (كُلُّ شَيْءٍ)" – এর মধ্যে ইস্তিসনা তথা ব্যত্যয় রয়েছে। কারণ আরবি ভাষায় 'সমুদয় (كُلُّ)' শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত হলেও কখনো কখনো এ থেকে কিছু বিষয়কে ব্যত্যয় করা বা বাদ দেওয়া বিশুদ্ধ। যেমন রানি বিলকিসের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٍ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ﴾.

"তাকে সকল কিছু থেকে দেওয়া হয়েছে; এবং তার রয়েছে মহান সিংহাসন।" **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ২৭ (সুরা নামল) : ২৩।

অথচ রানি বিলকিসের সময় সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব ছিল এবং আরও অনেক বিষয় ছিল, যা তাঁকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং আয়াতের প্রকৃত মর্মার্থ হচ্ছে, রাজা-রানিদের কর্তৃত্ব ও রাজত্বে সাধারণত যেসব বিষয় থাকে, তাঁকে সেসব বিষয়ের সবই দেওয়া হয়েছিল।

তদ্রূপ আদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত ঝঞ্ঝাবায়ুর ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ بِأَمۡرِ رَبِّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمۡۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ﴾.

"আল্লাহর নির্দেশে এটা (ঝঞ্ঝাবায়ু) সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে। এরপর তাদের পরিণতি এই হলো যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ৪৬ (সুরা আহকাফ) : ২৫।

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে, ঝঞ্ঝাবায়ু যাদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছে। কেননা এই বায়ু হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রতি ইমান আনয়নকারী ব্যক্তিবর্গকে ধ্বংস করেনি। অনুরূপভাবে আল্লাহর চেহারা ব্যতিরেকে সবকিছু ধ্বংস হবে, এর মানে— *স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হবে।* এছাড়াও শরিয়তের দলিল থেকে যেসব বিষয় সম্পর্কে প্রমাণিত হয়েছে, *এসব বিষয় ধ্বংস হবে না;* সেগুলোও *'সবকিছু'* শব্দের ব্যাপকতা থেকে আলাদা থাকবে। যেমন সালাফগণের ঐক্যমতে আল্লাহর আরশ, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি ধ্বংস হবে না; বিধায়

এগুলো *'সবকিছু'* শব্দের ব্যাপকতা থেকে আলাদা থাকবে। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া***, খ. ১৮, পৃ. ৩০৭।

তাবিলপন্থিরা বলতে পারে, তাহলে তোমরাও তো আয়াতের প্রকাশ্য অর্থকে ভিন্ন অর্থে পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাবিল করছ। আমরা তাদেরকে বলব, আরবি ভাষায় এ ধরনের বাক্য শোনামাত্র কোনো আরবি-জানা মানুষ এরকম বোঝে না যে, মহান আল্লাহর সমুদয় সত্তা ধ্বংস হয়ে কেবল তাঁর চেহারা অবশিষ্ট থাকবে! সুতরাং এ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী স্বয়ং মহান আল্লাহ তাঁর চেহারা-সহ থেকে যাবেন, রয়ে যাবেন শাশ্বত অবিনশ্বর।

প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে সরাসরি *'আল্লাহর সত্তা অবশিষ্ট থাকবে,'* না বলে তাঁর চেহারা অবশিষ্ট থাকার কথা কেন বলা হলো? এর জবাব হচ্ছে, মহান আল্লাহর চেহারার মর্যাদা ও মহত্ত্বের কারণে বিশেষভাবে তাঁর চেহারার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কেননা বান্দা জান্নাতে আল্লাহর চেহারা দেখার উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগি করে। তাই আয়াতে বিশেষভাবে তাঁর চেহারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে বিষয়টি বান্দার অন্তরে অধিক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবিনাশের কথা যেমন জানানো যায়, তেমনি তাঁর সত্তাগত বৈশিষ্ট্য চেহারা থাকার কথাও জানানো যায়। তাই বিশেষভাবে চেহারার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৪০৬-৪২০; আল-বাররাক, ***তাওদিহু মাকাসিদিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পৃ. ৯৬-৯৮। **টীকা সমাপ্ত।**

আল্লাহর হাত (اليد)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾. ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾.

আল্লাহ বলেছেন, "আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?"[124] তিনি আরও বলেছেন, "ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত আবদ্ধ, এবং তাদের এই বক্তব্যের দরুণ তারা হয়েছে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত। বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছে তিনি ব্যয় করেন।"[125] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর দুই হাত তাঁর প্রমাণিত সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে বাস্তবিক অর্থেই তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি উভয় হাতকে প্রসারিত করেন এবং উভয় হাত দিয়ে যা ইচ্ছা কবজা করেন। তাঁর দুই হাতের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

---

[124] সুরা সাদ : ৭৫।

[125] সুরা মায়িদা : ৬৪।

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾.

"বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত।"[126]

আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾.

"আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?"[127]

'দুই হাত' মানে শক্তি (বা নেয়ামত) বলে ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ। (১) কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। তথাপি আয়াতের প্রসঙ্গে এমন বিষয় রয়েছে, যা এরূপ ব্যাখ্যাকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করে। বিষয়টি হলো দ্বিবচন (যেহেতু দুটো হাতের কথা বলা হয়েছে)। কেননা দ্বিবচনের শব্দরূপ দিয়ে আল্লাহকে শক্তির বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না[128]। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[126] সুরা মায়িদা : ৬৪।

[127] সুরা সাদ : ৭৫।

[128] এরকম বলা যায় না যে, 'আল্লাহর দুটি শক্তি রয়েছে।' – ***অনুবাদক।***

আল্লাহর চোখ (العين)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾. ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾. ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.

আল্লাহ বলেছেন, "ধৈর্যধারণ করো তোমার রবের হুকুমের প্রতি; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ।"[129] তিনি আরও বলেছেন, "তখন নুহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে; যা চলত আমার চোখের সামনে। এটা ছিল তার জন্য পুরস্কার, যে (কাফিরদের তরফ থেকে) অস্বীকৃত হয়েছিল।"[130] তিনি বলেছেন, "আমি আমার নিকট থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা দিয়েছিলাম, যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।"[131] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

---

[129] সুরা তুর : ৪৮।

[130] সুরা কামার : ১৩-১৪।

[131] সুরা তহা : ৩৯।

আল্লাহর দুই চোখ[132] তাঁর প্রমাণিত সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে বাস্তবিক অর্থেই তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। তিনি উভয় চোখ দিয়ে দেখেন, অবলোকন

---

[132] **অনুবাদকের টীকা :** আল্লাহর যে দুই চোখ আছে, তা হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

"আল্লাহ এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া কানা নন। সাবধান, মাসিহুদ দাজ্জালের ডান চোখ নষ্ট থাকবে। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো।" **দ্রষ্টব্য :** সহিহুল বুখারি, হা. ৩৪৩৯; সহিহ মুসলিম, হা. ১২৯; আরও দেখুন : সহিহুল বুখারি, হা. ৩০৫৭, ৩৪৩৯, ৪৪০২, ৬১৭৫, ৭১২৩, ৭১২৭, ৭৪০৭।

আরবিতে 'আওয়ার (أعور)' তাকে বলা হয়, যার দুটো চোখ আছে, তারমধ্যে একটি চোখের অনুভূতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন মুকার্রাম ইবনু মানজুর, ***লিসানুল আরব*** (কায়রো : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫১।

যেহেতু হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ আওয়ার নন, অর্থাৎ দু চোখের একটি নষ্ট এমন নন, সেহেতু প্রমাণিত হচ্ছে, আল্লাহর দুটো ত্রুটিহীন পরিপূর্ণ চোখ রয়েছে। আল্লাহর দু চোখ না থাকলে তাঁর ব্যাপারে নবিজির এমনকথা বলা আরবি ভাষায় বিশুদ্ধ হতো না। এ হাদিস থেকে আল্লাহর দু চোখ সাব্যস্ত করেছেন ইমাম উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি তদীয় *'আর-রাদ্দ আলা বিশর আল-মারিসি'* গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনু খুজাইমা তদীয় *'কিতাবুত তাওহিদ'* গ্রন্থে। [আবু সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আলাল মারিসি আল-জাহমিয়্যিল আনিদ ফি মা ইফতারা আলাল্লাহি মিনাত তাওহিদ***, তাহকিক : রশিদ বিন হাসান আল-আলমায়ি (প্রকাশনার স্থানবিহীন, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩২৭; আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনু খুজাইমা আন-নাইসাবুরি, ***কিতাবুত তাওহিদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির রব***, তাহকিক : আব্দুল আজিজ বিন ইবরাহিম আশ-শাহাওয়ান (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৬-১০৪।

আল্লাহর দুই চোখ থাকার বিষয়ে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পরিশীলন : সাদ বিন ফাওয়্যাজ আস-সুমাইল (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ১, পৃ. ৩১৪। **টীকা সমাপ্ত।**

করেন এবং দৃষ্টি দেন। তাঁর চোখের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী :

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.

"যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।"[133]

আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾.

"নুহের নৌযান চলত আমার চোখের সামনে।"[134]

আল্লাহর দুই চোখকে *'জ্ঞান'* আখ্যা দিয়ে এবং চোখ স্বীকার না করে চোখকে *'দর্শন'* বলে ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ। (১) কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো দলিল নেই শরিয়তে।

কতিপয় সালাফ মহান আল্লাহর এই বাণীকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন :

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾.

---

[133] সুরা তহা : ৩৯।

[134] সুরা কামার : ১৪।

“নুহের নৌযান চলত আমার চোখের সামনে।”[135] তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, *‘এর মানে : আমার দৃষ্টির সামনে।’* **তাঁদের এরূপ ব্যাখ্যার জবাব হলো—** তাঁরা এরকম ব্যাখ্যা করে চোখের বাস্তবিক অর্থকে অস্বীকার করেননি। বরং তাঁরা চোখের স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে চোখকে অপরিহার্য অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। তাঁদের কাজটি ওদের পুরোপুরি বিপরীত, যারা চোখকে দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করে, আর চোখের বাস্তবিক অর্থ অস্বীকার করে।

দুই হাত ও দুই চোখ সিফাতদ্বয় যেসব শব্দরূপে বর্ণিত হয়েছে

(الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين)

এই সিফাতদ্বয় তিনভাবে বর্ণিত হয়েছে— একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের শব্দরূপে উল্লিখিত হয়েছে।

একবচনের উদাহরণ : মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾.

“মহা মহিমান্বিত তিনি, সমুদয় রাজত্ব রয়েছে যাঁর হাতে।”[136]

---

[135] সুরা কামার : ১৪।

[136] সুরা মুলক : ১।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾.

"যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।"[137]

দ্বিবচনের উদাহরণ : মহান আল্লাহর বলেছেন,

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾.

"বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত।"[138]

হাদিসে এসেছে,

إذا قامَ أحدُكم يصلِّي فإنه بين عينَيِ الرحمنِ.

"যখন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ায়, সে দয়াময় আল্লাহর দুই চোখের সামনে থাকে।"[139]

বহুবচনের উদাহরণ : মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾.

---

[137] সুরা তহা : ৩৯।

[138] সুরা মায়িদা : ৬৪।

[139] উকাইলি, আদ-দুআফা, পৃ. ২৪; সিলসিলাতুদ দয়িফা, হা. ১০২৪, সনদ : খুবই দুর্বল। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "শাইখ ইবনু উসাইমিন নিজেই তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন; তবে হাদিসটি দুর্বল হলেও মহান আল্লাহ দুই চোখের বিষয়টি অন্য বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। দ্রষ্টব্য : ইবনু উসাইমিন, শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৩১৩-৩১৪।"

“তারা কি লক্ষ করে না যে, আমার হাতে তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত পশু?”[140]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾.

“নুহের নৌযান চলত আমার চোখের সামনে।”[141]

এই শব্দরূপগুলোর মাঝে এভাবে সমন্বয় করা হবে যে, একবচন ও দ্বিবচনের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা আরবি ভাষায় (মারিফার প্রতি তথা নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্যের প্রতি) সম্বন্ধযুক্ত একবচন শব্দ (المفرد المضاف) ব্যাপকতার অর্থ জ্ঞাপন করে। সুতরাং যখন বলা হবে, **“আল্লাহর হাত (يد الله), আল্লাহর চোখ (عين الله),”** তখন আল্লাহর জন্য যতগুলো হাত বা চোখ প্রমাণিত হয়েছে সবগুলোকে আলোচ্য কথা শামিল করে নেবে। অনুরূপভাবে দ্বিবচন ও বহুবচনের মাঝেও কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা এখানে বহুবচন

---

[140] সুরা ইয়াসিন : ৭১।

[141] সুরা কামার : ১৪।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য— আল্লাহকে সম্মান করা। এটা দ্বিবচনের পরিপন্থি নয়। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**[142]

---

[142] **অনুবাদকের টীকা :** ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এখানে যা বলেছেন, তারচেয়ে সুন্দর ও নিরীক্ষিত কথা আমার মুর্শিদ আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি ও আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ-সহ অন্যান্য উলামা উল্লেখ করেছেন। **একবচনের শব্দরূপ বিষয়ে তাঁরা বলেন—** আরবি ভাষায় একবচন দিয়ে অনেকগুলো জিনিসের শ্রেণি বা সমষ্টি (جنس) উদ্দেশ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে দ্বিবচনের সাথে একবচনের আর বৈপরীত্য থাকে না। যেমন সুরা হিজরের ৬৮ নং আয়াতে একাধিক মেহমানকে একবচনের শব্দরূপে (قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيۡفِي فَلَا تَفۡضَحُونِ) উল্লেখ করা হয়েছে।

আর বহুবচনের শব্দরূপ বিষয়ে তাঁরা বলেন— আরবি ভাষায় দ্বিবচন ও বহুবচনের দিকে যখন দ্বিবচনের শব্দকে সম্বন্ধযুক্ত (إضافة) করা হয়, তখন উক্ত সম্বন্ধযুক্ত দ্বিবচন শব্দকে (الكلمة المضافة) বহুবচনের শব্দে ব্যবহার করা সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও আলঙ্করিক গণ্য করা হয়ে থাকে। যেমন সুরা তাহরিমের ৪ নং আয়াতে দুটো অন্তরকে বহুবচনের শব্দরূপে (قُلُوبُكُمَا) উল্লেখ করা হয়েছে। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু ফারিস আর-রাজি, ***আস-সাহিবি ফি ফিকহিল লুগাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়া মাসায়িলিহা ওয়া সুনানিল আরাবি ফি কালামিহা***, তাহকিক : মুহাম্মাদ আলি বাইদুন (প্রকাশনার স্থানবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২১৬-২১৭; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***আস-সাওয়াইকুল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা***, তাহকিক : হুসাইন বিন উক্কাশা বিন রমাদান (রিয়াদ ও বৈরুত : দারু আতাআতিল ইলম ও দারু ইবনি হাজম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৪-৯১; সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা ফি শারহিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২২-৪২৪; সালিহ আল-উসাইমি, ***“তাকরিরাতুশ শাইখ সালিহ আল-উসাইমি আলা মুজাক্কিরাতিল ওয়াসিতিয়্যা লিল আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনি উসাইমিন (আল-মাজলিসুস সানি)”***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : মারকাজুদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ বিদ দাওয়াদিমি, দারস আপলোডের তারিখ : ২২শে এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ৪৯:৪০ মিনিট থেকে ৫২:০০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/EiKH-JzYSBo?si=vn5hbzYBsTo3N_3U। **টীকা সমাপ্ত।**

আল্লাহর শোনা ও দোয়া কবুল করা (السمع)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾. ﴿لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾. ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾. ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾. ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[143] তিনি আরও বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে, 'আল্লাহ দরিদ্র, আর তারা ধনবান'।"[144] তিনি বলেছেন, "তারা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা তাদের নিকটে থেকে সবকিছু

[143] সুরা মুজাদালা : ১।

[144] সুরা আলে ইমরান : ১৮১।

লিখে নেয়।”[145] তিনি আরও বলেছেন, “আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।”[146] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

শোনা ও দোয়া কবুল করা (السمع) আল্লাহর প্রমাণিত সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্গত। আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে বাস্তবিক অর্থেই তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

“তিনিই সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।”[147]

আল্লাহর ‘সামা (السمع)’ এর দুরকম অর্থ হয়ে থাকে। যথা :

এক. দোয়া কবুল করা। এ অর্থে এটি কর্মগত গুণাবলির অন্তর্গত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾.

“নিশ্চয় আমার রব প্রার্থনা কবুলকারী।”[148]

---

[145] সুরা যুখরুফ : ৮০।

[146] সুরা তহা : ৪৬।

[147] সুরা বাকারা : ১৩৭।

[148] সুরা ইবরাহিম : ৩৯।

দুই. শ্রবণযোগ্য জিনিস শোনা। এ অর্থে এটি সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্গত হবে।[149] যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.

"আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে।"[150]

শোনা অর্থে এই সিফাত দ্বারা কখনো কখনো সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের উদ্দেশে আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

"আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।"[151]

---

[149] **অনুবাদকের টীকা :** যেহেতু শোনার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, সেহেতু এটি আল্লাহর সত্তাগত গুণ। একইকথা দর্শন তথা দেখা গুণটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটিও অনুরূপ কারণে সত্তাগত গুণ। পাশাপাশি শোনা ও দেখার বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত, আল্লাহ যখন ইচ্ছা শ্রবণ করেন, তাঁর কোনো কোনো মাখলুকের দিকে তিনি চাইলে নাও তাকাতে পারেন, সেহেতু এটি আল্লাহর কর্মগত গুণাবলিরও অন্তর্গত। আহলুস সুন্নাহর একদল উলামা এমনটি বলে থাকেন।

পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহর অপরাপর উলামা মনে করেন, *শোনা* ও *দেখা* – গুণদুটো আল্লাহর মহান সত্তার অপরিহার্য বিষয়। শ্রবণযোগ্য বা দর্শনযোগ্য যতকিছুর অস্তিত্ব আছে সবগুলো কেবল আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর ইলম তথা জ্ঞানের মতো। শ্রবণযোগ্য বা দর্শনযোগ্য কিছু ঘটামাত্র তা আল্লাহর শোনা ও দেখা হয়ে যায়। বিধায় তাঁদের মতে এ দুটো সিফাতকে স্রেফ সত্তাগত গুণ হিসেবেই উল্লেখ করা হবে। একদিক থেকে সত্তাগত গুণ, আবার আরেকদিক থেকে কর্মগত গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হবে না। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউ ফাতাওয়া***, খ. ১৩, পৃ. ১৩৩-১৩৪। **টীকা সমাপ্ত।**

[150] সুরা মুজাদালা : ১।

[151] সুরা তহা : ৪৬।

আবার কখনো এর মাধ্যমে ধমক তথা হুঁশিয়ারি উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾.

“অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে, ‘আল্লাহ দরিদ্র, আর তারা ধনবান’।”[152]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾.

“তারা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি।”[153] [154]

---

[152] সুরা আলে ইমরান : ১৮১।

[153] সুরা যুখরুফ : ৮০।

[154] **অনুবাদকের টীকা :** এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে আল্লাহর কর্ণ তথা কান সাব্যস্ত করেন। তাঁরা মনে করেন, আল্লাহ যেহেতু শোনেন, সেহেতু তাঁর কান আছে। যারা এমনটি করেন, তারা মূলত আল্লাহর নাম ও গুণাবলির নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। আমরা ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর একটি অনবদ্য রচনা থেকে এ বিষয়ক মূলনীতি তুলে ধরছি।

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “কিতাব ও সুন্নাহর দলিল দিয়ে আল্লাহর সিফাত তিনটি পদ্ধতিতে সাব্যস্ত হয়। যথা :

এক. সরাসরি সিফাতের কথা (কিতাব ও সুন্নাহয়) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। যেমন : সম্মান (আল-ইজ্জাহ), ক্ষমতা (আল-কুওয়্যাহ), রহমত, পাকড়াও (আল-বাতশু), চেহারা (আল-ওয়াজহু), হস্তদ্বয় (আল-ইয়াদাইন) প্রভৃতি।

দুই. আল্লাহর নাম তাঁর সিফাতকে শামিল করে। যেমন : আল-গফুর (ক্ষমাশীল) নামটি *মাগফিরাত* তথা *ক্ষমা* নামক সিফাতকে অন্তর্ভুক্ত করে, আস-সামি (সর্বশ্রোতা) নামটি ‘*শ্রবণ*’ সিফাতকে অন্তর্ভুক্ত করে ইত্যাদি।

তিন. কোনো ক্রিয়া বা বিশেষণের কথা (কুরআন-সুন্নাহয়) বলা হয়, যা আল্লাহর সিফাতের প্রমাণ বহন করে। যেমন : আরশের ওপর আরোহণ, পৃথিবীর আকাশে

অবতরণ, কেয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আগমন, অপরাধীদেরকে কঠিন শাস্তিপ্রদান।

এসব সিফাত প্রতীয়মান হয় যথাক্রমে নিম্নোক্ত দলিলগুলো থেকে :

ক. আল্লাহ বলেন, দয়াময় আল্লাহ আরশে আরোহণ করেছেন (সুরা তহা : ৫)।

খ. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন (সহিহুল বুখারি, হা. ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, হা. ৭৫৮)।

গ. আল্লাহ বলেন, (সেদিন) তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশতাবর্গ সারিবদ্ধভাবে আগমন করবেন (সুরা ফাজর : ২২)।

ঘ. আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দিব (সুরা সাজদা : ২২)।” **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা*** (মদিনা : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৮-২৯; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল***, সংকলন ও বিন্যাস : ফাহাদ বিন নাসির আস-সুলাইমান (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান ও দারুস সুরাইয়া, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪১৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৯০-২৯১।

উক্ত তিন পদ্ধতিতে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা হয়। এর বাইরে আর কোনো পদ্ধতি নাই। সুতরাং *‘সামি’* তথা *‘সর্বশ্রোতা’* আল্লাহর একটি নাম। এই নাম থেকে একটি সিফাত পাওয়া যাচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী— আল্লাহর *‘সামা’* তথা *‘শ্রবণ’* সিফাত। কিন্তু উক্ত নাম থেকে *‘কান’* সাব্যস্ত করা চরমতম অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। কারণ এই বিভ্রান্তিকর মানহাজ অনুসরণ করলে আল্লাহর জন্য আরও একগাদা সিফাত সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হয়ে যাবে, যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেননি। **সুতরাং আমরা বলব না, আল্লাহর কান আছে। আবার এও বলব না যে, আল্লাহর কান নেই। কারণ আল্লাহ আমাদের জানাননি, তাঁর কান আছে, নাকি নেই।**

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ আকিদার মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন,

والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك.

“আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নিকটে আল্লাহর জন্য *‘কান’* সাব্যস্ত করা যাবে না, আবার নাকচও করা যাবে না; যেহেতু এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় কোনো দলিল বর্ণিত হয়নি।” **দ্রষ্টব্য :** ইবনু উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ২১১।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার বিষয়টি তাওকিফি তথা পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহর দলিলনির্ভর। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ আহলুস সুন্নাহর মূলনীতি বর্ণনা করে বলেছেন,

لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله.

“মহান আল্লাহ নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, কিংবা তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার চেয়ে বৃদ্ধি করে আল্লাহকে কোনো গুণে গুণান্বিত করা যাবে না।” **দ্রষ্টব্য :** মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন

(رؤية الله)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾. ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, "সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?"[155] তিনি আরও বলেছেন, "যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (নামাজের জন্য) দাঁড়াও। আর দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার ওঠাবসা।

ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি, ***জাম্মুত তাউয়িল***, তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন হামিদ (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল বাসিরা, তাবি), পৃ. ২৮।

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "জেনে রেখ, আল্লাহর *'সামা (শ্রবণ)'* সিফাত থেকে তাঁর কান সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হয় না। আল্লাহর *'বাসার (দৃষ্টি/দর্শন)'* সিফাত থেকে তাঁর চোখ সাব্যস্ত করাও অপরিহার্য হয় না। এজন্য আমরা বলি, আমরা আল্লাহর কান সাব্যস্ত করব না। কেননা এমনটি বর্ণিত হয়নি যে, আল্লাহর কান আছে। আমরা আল্লাহর চোখ সাব্যস্ত করি; কিন্তু এই আয়াত দিয়ে না, বরং ভিন্ন আয়াত দিয়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, *'যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।'* (সুরা তহা : ৩৯) তিনি আরও বলেছেন, *'তা (নুহের কিশতি) চলত আমার চোখের সামনে।'* (সুরা কামার : ১৪) কেউ যদি বলে, কেন আপনারা এ কথা বলছেন না যে, অপরিহার্যতার ভিত্তিতে *'সামা (শ্রবণ)'* সিফাত থেকে কান সাব্যস্ত করা জরুরি? জবাবে বলব, আমরা *'আল্লাহর কান আছে'* এমনটি বলি না। পৃথিবী কি তার সংবাদ বলে দেবে না? ভূপৃষ্ঠে যেসব ভালো বা মন্দকর্ম সম্পাদিত হয়, যেসব কথা বলা হয়, যেসব কাজ করা হয়, তা কি পৃথিবী বলে দেবে না? অথচ এই পৃথিবীর কান নেই!" **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহু আকিদাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ*** (আল-কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি.), পৃ. ১১৯। **টীকা সমাপ্ত।**

[155] সুরা আলাক : ১৪।

তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”[156] তিনি আরও বলেছেন, “তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাক, এরপর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রসুল ও ইমানদারগণ।”[157] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

দেখা ও জানা (الرؤية) আল্লাহর প্রমাণিত সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্গত। আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে বাস্তবিক অর্থেই তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। আল্লাহর রু'ইয়া (الرؤية) এর দুরকম অর্থ হয়ে থাকে। যথা :

এক. দেখা। দর্শনযোগ্য ও দেখার উপযোগী সকল কিছু অবলোকন করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

“আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।”[158]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

---

[156] সুরা শুয়ারা : ২১৮-২২০।

[157] সুরা তাওবা : ১০৫।

[158] সুরা তহা : ৪৬।

“তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”[159]

দুই. জানা। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾.

“তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। কিন্তু আমি জানি, তা আসন্ন (সন্নিকটে)।”[160] এ আয়াতে জানা অর্থে *রু’ইয়া* শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

দেখা অর্থে এই সিফাত দ্বারা কখনো কখনো *সাহায্য* ও *পৃষ্ঠপোষকতা* উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের উদ্দেশে আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

“আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।”[161]

আবার কখনো এর মাধ্যমে *ধমক* তথা *হুঁশিয়ারি* উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾.

“সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?”[162] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[159] সুরা শুরা : ১১।

[160] সুরা মাআরিজ : ৬-৭।

[161] সুরা তহা : ৪৬।

[162] সুরা আলাক : ১৪।

ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কৌশল এবং গুপ্ত পাকড়াও

(المكر والكيد والمِحال)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾. ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর তিনি মহাকৌশলী।”[163] তিনি আরও বলেছেন, “তারা (কাফিররা) ষড়যন্ত্র করল, আর আল্লাহও কৌশল করলেন। আল্লাহ তো সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।”[164] তিনি বলেছেন, “তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আমিও ভীষণ কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।”[165] তিনি আরও বলেছেন, “তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। আর আমিও ভীষণ কৌশল করি।”[166] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

---

[163] সুরা রাদ : ১৩।

[164] সুরা আলে ইমরান : ৫৪।

[165] সুরা নামল : ৫০।

[166] সুরা তারিক : ১৫-১৬।

ব্যাখ্যা :

আলোচ্য তিনটি শব্দের অর্থ কাছাকাছি। এসবের অর্থ— গুপ্ত মাধ্যম অবলম্বন করে শত্রুকে শাস্তি দেওয়া। **নিঃশর্তভাবে বিলকুল আল্লাহকে এসব গুণে গুণান্বিত করা জায়েজ নয়। বরং শর্তযুক্তভাবে আল্লাহকে এসব গুণে গুণান্বিত করতে হবে।** কেননা নিঃশর্তভাবে এসব সিফাত প্রয়োগ করা হলে, তা প্রশংসা ও নিন্দা উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে। অথচ মহান আল্লাহ এমন বৈশিষ্ট্য থেকে মহাপবিত্র, যা নিন্দনীয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। পক্ষান্তরে আল্লাহকে এসব গুণে এমনভাবে সীমাবদ্ধ পরিসরে গুণান্বিত করতে হবে, যা কেবল প্রশংসার অর্থই জ্ঞাপন করে, নিন্দনীয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে না এবং তা আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তির প্রমাণবহন করে। এমনভাবে গুণান্বিত করা জায়েজ। কেননা এতে আল্লাহর পরিপূর্ণতা প্রতীয়মান হয়।[167]

---

[167] **অনুবাদকের টীকা :** অর্থাৎ, *'আল্লাহ ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত পাকড়াও করেন,'* এরকম ব্যাপকভাবে এই গুণ বর্ণনা করা যাবে না। বরং বলতে হবে, ***'ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কৌশল করেন, অথবা ষড়যন্ত্রকারীদের জবাবে তাদেরকে গুপ্ত-পাকড়াও করেন।'*** আরবি ভাষায় *মাকর*, *কাইদ*, *মিহাল*— শব্দগুলো 'গোপনে কৌশল করা, আকস্মিকভাবে পাকড়াও করা, বাইরে ভালো বিষয় জাহির করে গোপনে ধরাশায়ী করা প্রভৃতি' – বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। **বিস্তারিত দেখুন :** আবু আব্দুর রহমান আল-খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি, ***আল-আইন***, তাহকিক : মাহদি আল-মাখজুমি ও ইবরাহিম সামুরায়ি (বৈরুত : দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, তাবি), খ. ৩, পৃ. ২৪২, খ. ৫, পৃ. ৩৭০; আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস আর-রাজি, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ***, তাহকিক : আব্দুস সালাম হারুন (দেমাস্ক : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৪৫; আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ***,

তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়াদ মুরয়িব (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৩৫।

ধ্রুপদী তাফসিরকারক ইমাম ইবনু জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন,

معنى : مكر الله، بمن مكر به، وما وجه ذلك، وأنه أخذه من أخذه منهم على غرّة، أو استدراجه منهم من استدرج على كفره به، ومعصيته إياه، ثم إحلاله العقوبة به على غِرّة وغفلة.

“যারা আল্লাহর সাথে মাকর করে আল্লাহও তাদের সাথে মাকর করেন, কথাটির অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে— মানুষদের মধ্যে যারা (আল্লাহর বান্দাদেরকে গোপনে) পাকড়াও করে, আল্লাহও তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেন। কিংবা যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি ও তাঁর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায়, তাদেরকেও তিনি ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করেন (ফলে তারা বুঝতে পারে না), এরপর তাদের অসতর্কতার মুহূর্তে অকস্মাৎ তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসেন।” **দ্রষ্টব্য :** আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন***, তাহকিক: আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১৮, পৃ. ৯২।

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন,

والمكرُ والكيدُ: تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن النفع. فالذي يريد أن يمكر يظهر المحبة، ويظهر الإحسان، وهو يتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه.

“*মাকর* ও *কাইদ* মানে এমন গোপন কৌশল, যা এরকমভাবে অনিষ্ট করার বিষয়কে নিজের মধ্যে সন্নিবেশ করে যে, ব্যাপারটিকে ফলপ্রসূ বলে মনে হয়। এজন্য যে *মাকর* তথা *গোপন কৌশল* করতে চায়, সে ভালোবাসা জাহির করে, সদয়তা প্রকাশ করে, এবং এটাকে তার শত্রু ও বিরোধীকে আঘাত করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।” দ্রষ্টব্য : আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক, ***তাওদিহু মাকাসিদিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুত তাদমুরিয়া, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ৯২।

বাংলা ভাষায় এই সিফাতগুলোর অর্থ হিসেবে আমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে *‘কৌশল’* বা ‘*গুপ্ত পাকড়াও’* শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি, যেগুলো আরবি ‘ইহতিয়াল (الاحتيال)’ ও ‘খদিয়া (الخديعة)’ শব্দের অনুবাদ হিসেবে বাংলায় ব্যবহারযোগ্য। আর *ইহতিয়াল* ও *খদিয়া* শব্দগুলোকে প্রাচীন আরবি ভাষাবিদগণ *মাকর* ও *কাইদের* প্রতিশব্দ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যার রেফারেন্স আমরা কিছুপূর্বে উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে বাংলা *‘ষড়যন্ত্র’* শব্দটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ এই শব্দ অন্যায় কৌশলের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তদ্রূপ *‘চক্রান্ত’* শব্দও আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়; কারণ এই শব্দ পুরোপুরি আরবি ‘মাকর ও কাইদ’ শব্দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না এবং এর অর্থও আল্লাহর শানে ব্যবহার-উপযোগী নয়।

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে এসেছে, “ষড়যন্ত্র, ষড়, ষড়্যন্ত্র [শড়োজন্ত্রো, শড়্, শড়্–] (বিশেষ্য) ১ সমূহ ক্ষতি করার ছয় রকমের আভিচারিক উপায়, (তা থেকে) চক্রান্ত; কূটকৌশল; অন্যায়ভাবে ফাঁদে ফেলার জন্য প্রতিকূল ব্যক্তিদের

মহান আল্লাহ যে এসব গুণে গুণান্বিত, তার দলিল— আল্লাহর এসব বাণী,

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.

"তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহও (স্বীয় নবিকে বাঁচানোর) কৌশল করেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী।"[168]

তিনি আরও বলেছেন,

কুমন্ত্রণা কৌশলজাল। ২ একাধিক ব্যক্তির কূটপরামর্শ।" **দ্রষ্টব্য :** বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ১০৯৫।

'চক্রান্ত' শব্দের ব্যাপারে *'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'* বলা হয়েছে, "চক্রান্ত [চক্‌ক্রান্‌তো] (বিশেষ্য) ষড়যন্ত্র; কূটমন্ত্রণা; কারো অনিষ্ট বিধানের জন্য গুপ্ত পরামর্শ।" দ্রষ্টব্য : বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৩৯৪।

সালাফি আকিদাবিশারদদের বক্তব্য থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, মাকর-কাইদ প্রভৃতি দুই ধরনের হয়ে থাকে—

এক. প্রশংসনীয় : যেই কৌশল ও গুপ্ত-পাকড়াও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে করা হয়, বা অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্র করে যারা, তাদের বিরুদ্ধে করা হয়। আল্লাহর জন্য কেবল এ ধরনের কৌশল ও গুপ্ত-পাকড়াও সাব্যস্ত করা হবে সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট অর্থে। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ও নিঃশর্তভাবে *'আল্লাহ গুপ্ত-পাকড়াও করেন,'* এমনটি বলা হবে না। বরং বলতে হবে, *'যারা অন্যায়ভাবে কৌশল, ষড়যন্ত্র, গুপ্ত-পাকড়াও করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কৌশল ও গুপ্ত-পাকড়াও করেন।'*

দুই. নিন্দনীয় : যেই কৌশল ও গুপ্ত-পাকড়াও জুলুমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহ এই বৈশিষ্ট্য থেকে মহাপবিত্র ও মুক্ত। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আল-বাররাক, ***তাওদিহু মাকাসিদিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পৃ. ৯২; ইবনু উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৩৩১।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা বাংলা ভাষায় আলোচ্য সিফাতের অর্থ হিসেবে ***'কৌশল'*** ও ***'গোপন পাকড়াও'*** শব্দগুলোকেই উপযুক্ত পেয়েছি, যা মহান আল্লাহর শানে সিফাতগুলোর অর্থ হিসেবে ব্যবহার-উপযোগী। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। **টীকা সমাপ্ত।**

[168] সুরা আনফাল : ৩০।

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾.

"তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। আর আমিও ভীষণ কৌশল করি।"[169]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾.

"ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে; যদিও তিনি মহাকৌশলী।"[170]

হককে সাব্যস্ত করা এবং বাতিলকে অপনোদন করার জন্য কৌশল করা এবং গোপনে পাকড়াও করা (المكر والكيد والمِحال) প্রশংসামূলক গুণ হিসেবে বিবেচিত। অন্যথায় অন্যান্য ক্ষেত্রে এগুলো নিন্দনীয় গুণ হিসেবেই পরিগণিত। উল্লেখ্য যে, এসব সিফাত থেকে আল্লাহর নাম নির্গত করে তাঁকে *'আল-মাকির (কৌশলকারী)'* ও *'আল-কায়িদ (কৌশলকারী)'* বলা না-জায়েজ। কেননা আল্লাহর নান্দনিক নামগুলো কোনোদিক থেকেই নিন্দনীয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। আর এসব গুণ নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হলে, তা নিন্দনীয় অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে, যেমনটি কিছুপূর্বে আলোচিত হয়েছে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[169] সুরা তারিক : ১৫-১৬।

[170] সুরা রাদ : ১৩।

আল্লাহ ক্ষমাশীল (العَفُوّ)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা সৎ কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান।"[171] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

যিনি অপরের অপরাধ মার্জনা করেন, তিনি হলেন ক্ষমাশীল। এটি আল্লাহর একটি অন্যতম নাম। এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.

"আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।"[172] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[171] সুরা নিসা : ১৪৯।

[172] সুরা নিসা : ৯৯।

আল্লাহর ক্ষমা, প্রতাপ ও সম্মান-মর্যাদা

(المغفرة والعزة والجلال والإكرام)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾. ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, "তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[173] মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রসুল ও মুমিনদের।"[174] ইবলিস প্রসঙ্গে বলেছেন, সে বলল, "আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব।"[175] তিনি আরও বলেছেন, "কত মহান তোমার রবের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!"[176] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[177]

---

[173] সুরা নুর : ২২।

[174] সুরা মুনাফিকুন : ৮।

[175] সুরা সাদ : ৮২।

[176] সুরা রহমান : ৭৮।

[177] **অনুবাদকের টীকা :** ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর *'গফুর (ক্ষমাশীল বা মার্জনাকারী)'* নাম, উক্ত নাম সংশ্লিষ্ট গুণ এবং তাঁর *প্রতাপ* ও *সম্মান-মর্যাদা* — প্রভৃতি গুণ নিয়ে *'ওয়াসিতিয়্যা'* গ্রন্থে বর্ণিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেননি। **টীকা সমাপ্ত।**

আল্লাহর নেতিবাচক গুণাবলি

(الصفات السلبية)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾. ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾. ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾. ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾. ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “অতএব তুমি তাঁরই ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক; তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান?”[178] তিনি আরও

[178] সুরা মারইয়াম : ৬৫।

বলেছেন, “তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।”[179] তিনি বলেছেন, “সুতরাং তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির কোরো না।”[180] তিনি আরও বলেছেন, “আর মানুষের মধ্যে এরূপ আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তারা তাদেরকে ভালোবাসে।”[181] তিনি বলেছেন, “বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশী নেই এবং তিনি নত (বা দুর্বল) নন যে, তাঁর কোনো সহায়কের প্রয়োজন আছে; সুতরাং স্বসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।”[182]

তিনি আরও বলেছেন, “আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।”[183] তিনি বলেছেন, “কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি *‘ফুরকান’* অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ।”[184] তিনি

---

[179] সুরা ইখলাস : ৪।

[180] সুরা বাকারা : ২২।

[181] সুরা বাকারা : ১৬৫।

[182] সুরা ইসরা : ১১১।

[183] সুরা তাগাবুন : ১।

[184] সুরা ফুরকান : ১-২।

আরও বলেছেন, “আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোনো মাবুদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মাবুদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ অতি পবিত্র! তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে তাঁর শরিক করে তিনি তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।”[185]

তিনি বলেছেন, “সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।”[186] তিনি আরও বলেছেন, “তুমি বল, অবশ্যই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।”[187] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহর গুণাবলি দু ধরনের হয়ে থাকে। যেসব গুণ আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে *ইতিবাচক গুণাবলি* (*positive attributes*) বলে। আবার যেসব গুণ আল্লাহ্ নিজের থেকে নাকচ করেছেন, সেগুলোকে

---

[185] সুরা মুমিনুন : ৯১-৯২।

[186] সুরা নাহল : ৭৪।

[187] সুরা আরাফ : ৩৩।

নেতিবাচক গুণাবলি (*negative attributes*) বলে। **আর প্রত্যেক নেতিবাচক গুণ (তার বিপরীতার্থক) প্রশংসনীয় ইতিবাচক গুণ ধারণ করে থাকে।** লেখক রাহিমাহুল্লাহ নেতিবাচক গুণাবলির ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾.

"তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান?"[188]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

"তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[189]

তিনি বলেছেন,

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾.

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির কোরো না।"[190]

আয়াতগুলোতে উদ্ধৃত *সমগুণসম্পন্ন*, *সমতুল্য* ও *সমকক্ষ* (السمي والكفؤ والنِّدّ) শব্দগুলোর অর্থ কাছাকাছি। এসবের অর্থ— সদৃশ, সমতুল্য প্রভৃতি। আল্লাহর তরফ থেকে এসবকে নাকচ করার দরুন উল্লিখিত বিষয়গুলোকে যেমন নাকচ করা হয়, তেমনি আল্লাহর

---

[188] সুরা মারইয়াম : ৬৫।

[189] সুরা ইখলাস : ৪।

[190] সুরা বাকারা : ২২।

পরিপূর্ণতাকেও সাব্যস্ত করা হয়। আর তা সাব্যস্ত করা হয় এই অর্থে যে, আল্লাহর পরিপূর্ণতার দরুন তাঁর সদৃশ কিছুই নেই।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾.

"বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশী নেই এবং তিনি নত (বা দুর্বল) নন যে, তাঁর কোনো সহায়কের প্রয়োজন আছে; সুতরাং স্বসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।"[191]

আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর থেকে ত্রুটিপূর্ণ গুণগুলোকে নাকচ করার জন্য। ত্রুটিপূর্ণ গুণগুলোর একটি হলো সন্তান নেওয়া। আল্লাহকে এ গুণ থেকে মুক্ত ঘোষণা করার দরুন যেমন এই গুণকে নাকচ করা হয়, তেমনি আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা যে পরিপূর্ণ সেটাও সাব্যস্ত হয়। আল্লাহকে শরিক থেকে মুক্ত ঘোষণা করার ফলে সাব্যস্ত হয়ে যায় তাঁর একত্ব ও ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গতা। *'নত হওয়ার দরুন প্রয়োজন পড়ে এমন সহায়কের'* অস্তিত্বকে নাকচ করার ফলে সাব্যস্ত হয়ে যায় তাঁর সম্মান ও প্রতাপের পরিপূর্ণতা।

---

[191] সুরা ইসরা : ১১১।

এখানে (*সহায়ক* অর্থে) যেই অলিকে নাকচ করা হয়েছে, তা অন্য জায়গায় (*সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দা* অর্থে) সাব্যস্তকৃত অলির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

"আল্লাহই হচ্ছেন মুমিনদের অলি (সহায়ক বা অভিভাবক)।"[192]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾.

"জেনে রেখ, আল্লাহর অলিদের (সাহায্যপ্রাপ্ত নেক বান্দাদের) কোনো ভয় নেই।"[193]

কেননা যেই অলিকে নাকচ করা হয়েছে, সেটা এমন অলি, নত বা দুর্বল হওয়ার দরুন যার প্রয়োজন পড়ে অন্যের কাছে (মহান আল্লাহ যা থেকে মুক্ত, অমুখাপেক্ষী)। পক্ষান্তরে পৃষ্ঠপোষকতা বা সহয়তার অর্থবোধক অলিকে নাকচ করা হয়নি (আল্লাহ নিজেই মুমিনদের অলি তথা পৃষ্ঠপোষক বা সহায়ক, আবার মুমিনরাও আল্লাহর অলি তথা সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দা)।

---

[192] সুরা বাকারা : ২৫৭।

[193] সুরা ইউনুস : ৬২।

নেতিবাচক গুণাবলি বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

"আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে।"[194]

তাসবিহ করা তথা পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ— দোষত্রুটি থেকে আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা দেওয়া। এতেও নিহিত রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, কাফির ছাড়া সবকিছু প্রকৃত অর্থেই অবস্থা ও কথার জবানে আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে থাকে। কেননা কাফির কেবল অবস্থার জবানে তাসবিহ পাঠ করে। যেহেতু সে তার প্রকৃত জবান দিয়ে আল্লাহকে এমন গুণে গুণান্বিত করে, যা মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়।

তিনি আরও বলেছেন,

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

"আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোনো মাবুদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মাবুদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ অতি পবিত্র!"[195]

---

[194] সুরা তাগাবুন : ১।

[195] সুরা মুমিনুন : ৯১।

এ আয়াতে সন্তান নেওয়াকে এবং একাধিক সত্যিকারের উপাস্যকে নাকচ করা হয়েছে। আর মুশরিকরা আল্লাহকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছে, তা থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর তরফ থেকে এসবকে নাকচ করার দরুন উল্লিখিত বিষয়গুলোকে যেমন নাকচ করা হয়, তেমনি আল্লাহর পরিপূর্ণতা ও একত্বকেও সাব্যস্ত করা হয়, যা আল্লাহর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

আর একাধিক সত্য উপাস্য না থাকার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ দুটো বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল উল্লেখ করেছেন। যথা :

এক. যদি আল্লাহর সাথে কোনো সত্যিকারের উপাস্য থাকত, তাহলে সে নিজের সৃষ্টবস্তু নিয়ে আল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে যেত। আর বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য উভয় দিক থেকেই এটি সুবিদিত যে, মহাবিশ্বের নিয়ম একইরকম, এতে কখনো সংঘর্ষ লাগে না এবং বৈপরীত্যও দেখা যায় না। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মহাবিশ্বের পরিচালক একজন।

দুই. আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সত্যিকারের উপাস্য থাকলে সেও চাইত, সবচেয়ে উঁচুতে থাকতে। তখন হয় একজন অপরজনকে পরাজিত করে ফেলত, ফলে সেই হয়ে যেত সত্যিকারের উপাস্য। আর নয়তো উভয়েই একে অপরকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে যেত।

ফলে তাদের কেউ উপাস্য হওয়ার হকদার থাকত না। কারণ প্রত্যেকেই অপারগ।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

"তুমি বল, অবশ্যই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।"[196]

আয়াতে উল্লিখিত পাঁচটি হারাম বিষয়ে সকল নবির শরিয়ত একমত ছিল। এতে আল্লাহর প্রজ্ঞা এবং তাঁর আত্মসম্মান সাব্যস্ত হয়। যেহেতু তিনি এসব বিষয় হারাম করেছেন।

আয়াতে বলা হয়েছে, *'যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি।'* এটা মূলত পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়ার জন্য উল্লিখিত শর্ত। কেননা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপনের ব্যাপারে দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই শর্তের কোনো আমলযোগ্য

---

[196] সুরা আরাফ : ৩৩।

তাৎপর্য নেই (এমন বোঝার সম্ভাবনা নেই যে, কোনো কোনো শির্কের ব্যাপারে আল্লাহ দলিল অবতীর্ণ করেছেন)।

এ আয়াতে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যদানকারী মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের খণ্ডন রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, ‘(*আল্লাহ আরও হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি।*’ কেননা মুশাব্বিহা সম্প্রদায় আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে, যেহেতু তারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্য দিয়ে থাকে।

আবার এ আয়াতে রয়েছে তাতিলকারী (অস্বীকার, অপব্যাখ্যা ও অর্থ-অস্বীকৃতির ধারক) মুয়াত্তিলা সম্প্রদায়ের খণ্ডন। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, ‘(*আল্লাহ আরও হারাম করেছেন) আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।*’ কেননা মুয়াত্তিলা সম্প্রদায় আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলে থাকে। যেহেতু তারা বাতিল যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে আল্লাহর সিফাতকে নাকচ করে। এই আকিদার পুস্তিকায় এ আয়াত উল্লেখ করার প্রাসঙ্গিকতা এটাই।

আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন[197]

(استواء الله على عرشه)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ. [فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ؛ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ وَقَالَ فِي سُورَةِ يُونُسَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ وَقَالَ فَي سُورَةِ الرَّعْدِ: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ وَقَالَ فِي سُورَةِ طَهَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ وَقَالَ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ وَقَالَ فِي سُورَةِ آلم السَّجْدَةِ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

---

[197] **অনুবাদকের টীকা :** ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ *'আরশের ওপর আরোহণ'* বিষয়ক আলোচনা *'আল্লাহর ওপরে থাকা'* সিফাতের পরে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে মূলগ্রন্থ *'ওয়াসিতিয়্যার'* যেসব নুসখা আছে, সেগুলোতে আগে *'আরশের ওপর আরোহণ'* বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে, এরপর *'আল্লাহর ওপরে থাকা'* সিফাতের আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে। বিধায় মূলগ্রন্থের সাথে মিল রেখে আমরা ব্যাখ্যাকারের পরের আলোচনাকে আগিয়ে এনেছি এবং আগের আলোচনাকে পিছিয়ে দিয়েছি। **টীকা সমাপ্ত।**

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ وَقَالَ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾].

মহান আল্লাহ বলেছেন, “দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।”[198] তিনি আরও বলেছেন, “এরপর তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।”[199] হুবহু এই কথা কুরআনের ছয় জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।[200]

সুরা আরাফে এসেছে, “নিশ্চয় তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।”[201] সুরা ইউনুসে বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব, যিনি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, এরপর তিনি আরশে আরোহণ করেছেন।”[202]

সুরা রাদে বলেছেন, “আল্লাহ খুঁটি ছাড়াই আকাশরাজিকে উঁচু করেছেন, যা তোমরা দেখছ। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করেছেন।”[203] সুরা ফুরকানে বলেছেন, “তিনি আকাশরাজি, পৃথিবী

---

[198] সুরা তহা : ৫।

[199] সুরা আরাফ : ৫৪।

[200] **অনুবাদকের টীকা :** বেশকিছু নুসখায় *‘ছয় জায়গায়’* কথাটি এসেছে। অর্থাৎ হুবহু এই কথা— *‘এরপর তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন’* ছয় জায়গায় আছে। আবার কিছু নুসখায় ছয়ের বদলে *‘সাত জায়গায়’* বলা হয়েছে এবং সবগুলো আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে *‘আরশের ওপর আরোহণ’* সিফাতটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সিফাতের উল্লেখ কুরআনের সাত জায়গায় আছে। **টীকা সমাপ্ত।**

[201] সুরা আরাফ : ৫৪।

[202] সুরা ইউনুস : ৩।

[203] সুরা রাদ : ২।

এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করেন। তিনিই রহমান; তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।”[204] সুরা সাজদায় বলেছেন, “আল্লাহ আকাশরাজি, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করেছেন।”[205] সুরা হাদিদে বলেছেন, “তিনি ছয় দিনে আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এরপর আরশে আরোহণ করেছেন।”[206] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ করার (استواء الله على عرشه) মানে আরশের ওপর ওঠা এবং অবস্থান করা। সালাফগণের নিকট থেকে এর চারটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যথা : ওঠা, স্থায়ী অবস্থান নেওয়া, আরোহণ করা এবং চড়া (العلوّ والاستقرار والصعود والارتفاع)। আরবি *সুউদ* ও *ইরতিফা* (আরোহণ করা ও চড়া) শব্দদুটোর অর্থ *উলুর* (ওপরে ওঠার) সমার্থবোধক।[207]

---

[204] সুরা ফুরকান : ৫৯।

[205] সুরা সাজদা : ৪।

[206] সুরা হাদিদ : ৪।

[207] **অনুবাদকের টীকা :** ব্যাখ্যাকারের ভাষ্য অনুযায়ী সালাফদের থেকে *‘ইস্তিওয়া’* শব্দের যেই চারটি অর্থ প্রমাণিত হয়েছে, ক্রিয়ামূল হিসেবে সেই চারটি অর্থের শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ। আর ক্রিয়া হিসেবে শব্দগুলো হবে এমন—عَلَا وَارْتَفَعَ وَصَعِدَ وَاسْتَقَرَّ। কুরআনে শব্দটি *‘ইস্তাওয়া’* হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা একটি

ক্রিয়াপদ; এর ক্রিয়ামূল *'ইস্তিওয়া'।* বোঝার সুবিধার্থে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ামূলের জায়গায় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি, আশা করি সম্মাননীয় পাঠক বিষয়টি সমঝদারিতার সাথে গ্রহণ করবেন। আর আমরা সালাফদের করা চারটি অর্থের যে বাংলা অনুবাদ করেছি, সেটাকে আমরা সঠিক মনে করি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এ বিষয়ে অধমের লেখা একটি প্রামাণ্য নিবন্ধ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযুক্তি হিসেবে পেশ করা হলো। আগ্রহী ভাইয়েরা ***'আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন, ওঠেছেন, স্থায়ী হয়েছেন এবং সমাসীন হয়েছেন'*** – শীর্ষক নিবন্ধসংবলিত পরিশিষ্টটি পড়ে দেখতে পারেন।

জনৈক সম্মাননীয় দায়ি আমাকে বলেছেন, *'সয়িদা'* শব্দটিকে 'সাআদা' পড়তে হবে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, *'সয়িদা'* শব্দের আইন বর্ণে জের দিয়ে *'সয়িদা'* পড়া ভুল। এজন্য তিনি নিজেও তাঁর বক্তব্যে আইন বর্ণে জবর দিয়ে শব্দটিকে 'সাআদা' পড়ে থাকেন। যদিও আমি আমার উস্তাজগণের কাছে *'সয়িদা'* পড়তে শিখেছি এবং আরবের বড়ো বড়ো শাইখের দারসেও আমি তাঁদেরকে এমনটিই বলতে শুনেছি। তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আমার পড়াটি যে ভুল নয়, তা আমি কয়েকটি বিশ্বনন্দিত আরবি অভিধান থেকে তুলে ধরছি। প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আর-রাজি (মৃ. ৬৬৬ হি.) তাঁর সংকলিত বিখ্যাত অভিধান *'মুখতারুস সিহাহ'* গ্রন্থে বলেছেন,

صَعِدَ في السلّم بالكَسْر.

"সয়িদা ফিস সুল্লামি (সে সিঁড়িতে চড়ল), আইন বর্ণে জের দিয়ে পড়তে হয়।" **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আর-রাজি, ***মুখতারুস সিহাহ*** (বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, তাবি), পৃ. ১৫২।

প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ফায়্যুমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭০ হি.) তদীয় *'আল-মিসবাহুল মুনির'* গ্রন্থে বলেছেন,

صعِد في السلّم والدرجة (يصعَد) من باب تَعِبَ.

"সয়িদা ফিস সুল্লামি ওয়াদ দারাজাহ (সে সিঁড়িতে ও ধাপে চড়ল), *সয়িদা* শব্দটি *'তায়িবা'* শব্দের শ্রেণিভুক্ত (অর্থাৎ আইন বর্ণে জের দিয়ে পড়তে হবে)।" **দ্রষ্টব্য :** আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ফায়্যুমি, ***আল-মিসবাহুল মুনির***, তাহকিক : আব্দুল আজিম (কায়রো, দারুল মায়ারিফ, ২য় প্রকাশ, তাবি), পৃ. ৩৪০।

এতদ্ব্যতীত আমার হাতের কাছে সুবৃহৎ আরবি অভিধান ইবনু মানজুর বিরচিত *লিসানুল আরবের* এবং আধুনিক আরবি অভিধান *মুজামুল ওয়াসিতের* যে কপি আছে, সেসবেও *'সয়িদা'* শব্দটিকে আইন বর্ণে জের দিয়ে *'সয়িদা'* লেখা হয়েছে। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররাম ইবনু মানজুর আল-আনসারি, ***লিসানুল আরব*** (কায়রো : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯৩; মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা পর্ষদ, ***আল-মুজামুল ওয়াসিত*** (কায়রো : মাকতাবাতুশ শুরুক আদ-দুওয়ালিয়্যা, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ৫১৫।

এমনকি আমার জানামতে বাংলাদেশে যেসব আরবি-বাংলা অভিধান পাওয়া যায়, সেসবেও *'সাআদা'* না লিখে *'সয়িদা'* লেখা হয়ে থাকে। সুতরাং আমার ব্যক্তীকৃত *'সয়িদা'* উচ্চারণ নিঃসন্দেহে সঠিক। আর আল্লাহই সম্যক অবগত। **টীকা সমাপ্ত।**

এই সিফাতের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾.

“দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।”[208]

কুরআনের সাত জায়গায় আল্লাহর এই গুণ উল্লিখিত হয়েছে। যথা : সুরা আরাফ, সুরা ইউনুস, সুরা রাদ, সুরা তহা, সুরা ফুরকান, সুরা তানজিল আস-সাজদা ও সুরা হাদিদে। **যারা বলে, এই গুণের মানে *‘কর্তৃত্ব করা’* ও *‘দখল করা’*, তাদেরকে আমরা নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করব। যথা : (১)** তাদের এরূপ ব্যাখ্যা কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত; **(২)** সালাফগণ এই গুণের যে অর্থ করেছেন তার বিপরীত; **(৩)** তাদের এমন (ভ্রান্ত) ব্যাখ্যার ফলে অনেক বাতিল বিষয় অপরিহার্যভাবে চলে আসে।[209]

আভিধানিক অর্থে, *আরশ* মানে রাজার জন্য সুনির্ধারিত সিংহাসন (سرير الملك الخاص به)। শরিয়তের পরিভাষায়, *আরশ* সেটা, যার ওপর

---

[208] সুরা তহা : ৫।

[209] যেমন *‘ইস্তিওয়া আলাল আরশের’* মানে যদি তাদের কথা মোতাবেক *‘আরশ দখল করা’* বা *‘আরশের কর্তৃত্ব লাভ করা’* হয়ে থাকে, তাহলে দখল করার পূর্বে কি আরশ মহান আল্লাহর কর্তৃত্বে ছিল না? কারণ আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী আকাশ-জমিন সৃষ্টির পরে তিনি আরশে ইস্তিওয়া করেছেন। অথচ আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পূর্ব থেকেই আরশ বিদ্যমান ছিল (সহিহুল বুখারি, হা. ৩১৯১, ৪৬৮৪ ও ৭৪১৮)। তখন কি আরশ তাঁর দখলে কিংবা মালিকানায় ছিল না?! – ***অনুবাদক।***

আল্লাহ ওঠেছেন (ما استوى الله عليه)। আরশ আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টিগুলোর অন্যতম। বরং আমরা যেসব সৃষ্টির ব্যাপারে জানি, সেসবের মধ্যে আরশ সবচেয়ে বড়ো। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

ما السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة.

"নিশ্চয় সাত আসমান ও সাত জমিন কুরসির তুলনায় একটি আংটির মতো, যাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে দুনিয়ার কোনো মরুভূমিতে। আর নিশ্চয় কুরসির ওপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন মরুভূমির শ্রেষ্ঠত্ব এই আংটির ওপর।"[210] জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বড়োই বরকতময়। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[210] আবু নুআইম, ***হিলয়াতুল আউলিয়া***, খ. ১, পৃ. ১৬৭; ইবনু আবি শাইবা, ***আল-আরশ***, হা. ৫৮; বাইহাকি, ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত***, হা. ৮৬২; সিলসিলা সহিহা, হা. ১০৯; সনদ : সহিহ।

আল্লাহ সবচেয়ে ওপরে আছেন এবং তাঁর ওপরে থাকার প্রকারভেদ

(علوّ الله وأقسامه)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾. ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾. ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾. ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন, হে ইসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে গ্রহণ করব (মৃত্যু ছাড়াই দুনিয়া থেকে কবজ করব) এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব।”[211] তিনি আরও বলেছেন, “বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।”[212] তিনি বলেছেন, “তাঁরই দিকে পবিত্র কথা আরোহণ করে এবং সৎকাজ ওকে উঠিয়ে দেয় (কিংবা আল্লাহ সৎকাজকে

[211] সুরা আলে ইমরান : ৫৫।

[212] সুরা নিসা : ১৫৮।

উঠিয়ে দেন)।"[213] তিনি আরও বলেছেন, "ফেরাউন বলল, হামান, আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পথ পাই। আসমানে আরোহণের পথ, যেন আমি দেখতে পাই মুসার মাবুদকে; যদিও আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।"[214] তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা কি নিজেদের নিরাপদ মনে করে নিয়েছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের সহকারে ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না, যখন ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিজেদের নিরাপদ মনে করে নিয়েছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর-বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী!"[215] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

উলু মানে ঊর্ধ্বে যাওয়া বা সমুচ্চ হওয়া। **মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতা তিন ধরনের।** যথা :

এক. সত্তাগত ঊর্ধ্বতা, অর্থাৎ আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর সৃষ্টিকুলের ওপরে রয়েছেন।

---

[213] সুরা ফাতির : ১০।

[214] সুরা গাফির : ৩৬-৩৭।

[215] সুরা মুলক : ১৬-১৭।

দুই. মর্যাদাগত ঊর্ধ্বতা, অর্থাৎ আল্লাহ সুমহান মর্যাদার অধিকারী, তাঁর কোনো সৃষ্টিই মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায়ে যেতে পারে না। আর আল্লাহর মর্যাদায় কোনো ত্রুটিও আপতিত হয় না।

তিন. প্রতাপগত ঊর্ধ্বতা, অর্থাৎ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপর বিজয়ী হয়েছেন। আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে বের হতে পারে না।

আল্লাহ সবচেয়ে ওপরে আছেন — এ কথার পক্ষে দলিল হলো কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা (মতৈক্য), আকল (সুস্থ বিবেক) ও ফিতরাত (স্বভাবজাত প্রকৃতি)।

কিতাব থেকে দলিল : মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾.

“তিনিই সর্বোচ্চ (সবকিছুর ওপরে) এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান।”[216]

সুন্নাহ থেকে দলিল : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ».

---

[216] সুরা বাকারা : ২৫৫।

“হে আমাদের রব, আল্লাহ, যিনি আসমানের ওপরে রয়েছেন।”[217]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীর কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন,

أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ.

‘আল্লাহ কোথায়?’ দাসী বলল, ‘আকাশের ওপরে।’ তিনি দাসীকে তিরস্কার করেননি। বরং তার মনিবের উদ্দেশে বলেছেন,

«أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

“তুমি একে মুক্ত করে দাও। সে একজন মুমিন নারী।”[218]

বিদায় হজে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রব আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন, তিনি যে শরিয়তের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তাঁর উম্মত স্বীকৃতি দিচ্ছে। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙুল আকাশের দিকে তুলে মানুষের দিকে ফেরাচ্ছিলেন, আর বলছিলেন, اللَّهُمَّ اشْهَدْ “ইয়া আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।”[219]

---

[217] আবু দাউদ, হা. ৩৮৯২; নাসায়ি, ***আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা***, হা. ১০৩৭; **সনদ :** দুর্বল।

[218] সহিহ মুসলিম, হা. ৫৩৭, মসজিদ ও নামাজের স্থানসমূহ অধ্যায় (৫), পরিচ্ছেদ : ৭।

[219] সহিহ মুসলিম, হা. ১২১৮, হজ অধ্যায় (১৬), পরিচ্ছেদ : ১৯।

ইজমা (মতৈক্য) : আল্লাহর ওপরে থাকার ব্যাপারে উম্মতের মতৈক্য (একমতে পৌঁছা) সালাফদের মাঝে সুবিদিত ছিল। সালাফদের (সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িগণের) কোনো একজনের ব্যাপারেও এমনটি জানা যায় না যে, তিনি এর বিপরীত কথা বলেছেন।

সুস্থ বিবেক থেকেও প্রতীয়মান হয়, *'ওপরে থাকা'* একটি পরিপূর্ণ গুণ। আর মহান আল্লাহ যাবতীয় পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত, পূর্ণতার বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং ওপরে থাকার গুণটি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা অপরিহার্য।

আর **ফিতরাত তথা স্বভাবজাত প্রকৃতির** ব্যাপারটি হচ্ছে, সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের এ বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ ওপরে আছেন। এজন্য মানুষ যখন আপন রবের কাছে প্রার্থনা করে বলে, *'হে আমার রব,'* তখন তার অন্তর কেবল আকাশের দিকেই ধাবিত হয়।

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ঊর্ধ্বতার প্রকারগুলোর মধ্যে সত্তাগত ঊর্ধ্বতাকে অস্বীকার করে (এরা বলে, *আল্লাহ ওপরে আছেন* – এর মানে তিনি মর্যাদা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে ওপরে আছেন, স্বয়ং

নিজে ওপরে নেই)। পূর্বোদ্ধৃত দলিলগুলো দিয়ে আমরা তাদের খণ্ডন করে থাকি।[220] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

[220] ইতঃপূর্বে এ ধরনের ভ্রান্ত অপব্যাখ্যার জবাব ব্যাখ্যাকার রাহিমাহুল্লাহ বারবার উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত,** তাদের অপব্যাখ্যা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। **দ্বিতীয়ত,** তাদের অপব্যাখ্যা সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত। **তৃতীয়ত,** তারা যে ব্যাখ্যা করেছে, তার পক্ষে কোনো দলিল নেই শরিয়তে। – ***অনুবাদক।***

আল্লাহর *‘সাথে থাকা’* সিফাত এবং ওপরে থাকা ও সাথে থাকার মাঝে সমন্বয়সাধন

(المَعِيَّةُ والجمع بينها وبين العلو)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾. ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

وَقَوْلِهِ: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾. ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾. ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “তিনি ছয় দিনে আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এরপর আরশে আরোহণ করেছেন। তিনি জানেন যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।”[221] তিনি আরও বলেছেন, “তিন ব্যক্তির মধ্যে

---

[221] সুরা হাদিদ : ৪।

এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; তারা এরচেয়ে কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কেয়ামত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পুরোপুরি অবগত।"[222]

তিনি বলেছেন, "তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"[223] তিনি আরও বলেছেন, "আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।"[224] মহান আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[225] তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[226] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! বস্তুত আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।"[227] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

---

[222] সুরা মুজাদিলা : ৭।

[223] সুরা তাওবা : ৪০।

[224] সুরা তহা : ৪৬।

[225] সুরা নাহল : ১২৮।

[226] সুরা আনফাল : ৪৬।

[227] সুরা বাকারা : ২৪৯।

ব্যাখ্যা :

মায়িয়্যা (المَعِيَّةُ) মানে সাথে থাকা, সঙ্গে থাকা। আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাদের সাথে থাকেন, তার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।"[228]

আল্লাহর *'সাথে থাকার'* এই বৈশিষ্ট্য দুভাগে বিভক্ত। যথা : **(১)** সার্বজনিকভাবে সাথে থাকা **(২)** সুনির্দিষ্টভাবে সাথে থাকা।

সার্বজনিকভাবে সাথে থাকা : সাথে থাকার এই প্রকারটি সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।"[229]

এখানে সাথে থাকার দাবি হলো— জ্ঞান, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করা।

সুনির্দিষ্টভাবে সাথে থাকা : সাথে থাকার এই প্রকারটি রসুলগণ ও তাঁদের অনুসারীবর্গের জন্য সুনির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

---

[228] সুরা হাদিদ : ৪।

[229] সুরা হাদিদ : ৪।

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾.

"তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"[230]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[231]

পরিবেষ্টনের পাশাপাশি সাথে থাকার এই প্রকারটি দাবি করে—সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা।

দুই দিক থেকে মহান আল্লাহর *'ওপরে থাকা'* ও *'বান্দাদের সাথে থাকার'* মাঝে সমন্বয়সাধন করা যায়। যথা :

এক. বাস্তবিকপক্ষে মহান আল্লাহর *'ওপরে থাকা'* ও *'বান্দাদের সাথে থাকার'* মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। একটি বিষয়ের মাঝেও দুটো বিষয় জমায়েত হতে পারে। এজন্য আপনি বলে থাকেন,

---

[230] সুরা তাওবা : ৪০।

[231] সুরা নাহল : ১২৮।

‘আমরা নৈশভ্রমণ করে চলেছি, আর চাঁদ রয়েছে আমাদেরই সাথে;’ অথচ চাঁদ আছে আকাশে।[232]

দুই. যদি ধরেও নেওয়া হয়, মাখলুকের ক্ষেত্রে *‘ওপরে থাকা’* ও *‘সাথে থাকার’* মাঝে বৈপরীত্য আছে। এ থেকে তো এটা অপরিহার্য হয় না যে, স্রষ্টার ক্ষেত্রেও *‘ওপরে থাকা’* ও *‘সাথে থাকার’* মাঝে বৈপরীত্য থাকবে। কেননা তাঁর সদৃশ কিছুই নেই, আর তিনি আছেন সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে।

আল্লাহর সাথে থাকা মানে ***‘সত্তাগতভাবে তিনি আমাদের জায়গায় আমাদের সাথে রয়েছেন’*** এমন ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়। এর কারণ নিম্নরূপ :

এক. এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেননা একথা তাঁর ওপরে থাকার বৈশিষ্ট্যের সরাসরি পরিপন্থি। আর আল্লাহর ওপরে থাকার বৈশিষ্ট্য তাঁর সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্গত, যা কখনোই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

দুই. সালাফগণ (সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িগণ) সাথে থাকার যে ব্যাখ্যা করেছেন, উল্লিখিত (ভ্রান্ত) ব্যাখ্যা তার পরিপন্থি।

---

[232] চাঁদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর ওই কথাটি সঠিক। কারণ সাথে থাকা মানেই মিশে থাকা নয়। আর তাইতো ভক্তকুল নেতার উদ্দেশে শ্লোগান দেয়, ‘অমুক ভাই, তমুক ভাই, আমরা আছি আপনার সাথে।’ অথচ নেতা আছে হয়তো তার অফিসে কিংবা বাসভবনে। – ***অনুবাদক।***

তিন. এই (ভ্রান্ত) ব্যাখ্যার ফলে অনেক বাতিল বিষয় অপরিহার্যভাবে চলে আসে।[233]

‘আল্লাহ আকাশে আছেন’— এ কথার ব্যাখ্যা

(معنى كون الله في السماء)

‘আল্লাহ আকাশে আছেন’— এ কথার মানে, আল্লাহ আকাশের ওপরে আছেন (معناه على السماء أي فوقها)। এখানে আরবি ‘ফি (في)’ অব্যয়টি ‘আলা (على)’ তথা *‘ওপরে’* অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এই অর্থে *‘ফি’* অব্যয় নিম্নোক্ত আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে; মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

"তুমি বলে দাও, তোমরা জমিনে পরিভ্রমণ করো।"[234] অর্থাৎ জমিনের ওপরে।

আবার *‘ফি’* অব্যয়টি ‘মধ্যে বা আধার (الظرفية)’ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন *‘ফিস সামা’* কথাটিতে *আস-সামা*–র মানে হবে

---

[233] যেমন সর্বেশ্বরবাদী জাহমি সুফি সম্প্রদায়ের লোকদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহ যদি সত্তাগতভাবেই সৃষ্টিকুলের জায়গায় সৃষ্টিকুলের সাথে থাকেন, তাহলে তিনি কি ডাস্টবিন আর টয়লেটেও থাকেন?! এই বাতিলপন্থিরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে মহাপবিত্র রয়েছেন। – ***অনুবাদক।***

[234] সুরা আনআম : ১১।

ঊর্ধ্বতা (فالسماء على هذا بمعنى العلو)। তখন এই কথার মানে হবে, আল্লাহ ঊর্ধ্বতার মধ্যে রয়েছেন। ঊর্ধ্বতা অর্থে 'আস-সামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾.

"তিনি সামা (ওপর/মেঘ) থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"[235] [236]

---

[235] সুরা রাদ : ১৭।

[236] **অনুবাদকের টীকা :** আরবরা *'আস-সামা'* শব্দ প্রয়োগ করে স্রেফ *'আকাশ'* বোঝাত না। বরং উঁচুতে ও ওপরে থাকা বিভিন্ন বিষয়কে *'আস-সামা'* বলে অভিহিত করত। এজন্য *'মুআওয়িয়্যিদুল হুকামা'* খ্যাত জাহেলি যুগের কবি বৃষ্টি অর্থে 'আস-সামা' শব্দ প্রয়োগ করে বলেছিল,

إذا نزل السماء بأرض قوم * رعيناه و إن كانوا غضابًا

"কোনো সম্প্রদায়ের জমিনে যদি হয় বৃষ্টি (সামা) বর্ষিত, আমরা তা সংরক্ষণ করে রাখি, যদিও তারা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত।" **দ্রষ্টব্য :** ইবনু কুতাইবা, ***গারিবুল হাদিস***, খ. ১, পৃ. ৪৪০; ***আল-হামাসাতুল বাসরিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৭৯; **গৃহীত :** সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৫৩৮; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আনসারি আল-কুরতুবি, ***আল-জামি লি আহকামিল কুরআন***, তাহকিক : আহমাদ বারদুনি ও ইবরাহিম আতফিশ (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৬।

কুরআনে বৃষ্টিকেও *'আস-সামা'* বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾.

"আমি তাদের প্রতি মুষলধারায় বৃষ্টি (সামা) বর্ষণ করেছিলাম।" **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ৬ (সুরা আনআম) : ৬; আরও দেখুন : আল-কুরআনুল কারিম, ৭১ (সুরা নুহ) : ১১।

কুরআনে মেঘকে *'আস-সামা'* বলা হয়েছে,

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾.

"আর তিনি মেঘ (সামা) থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি।" **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ২ (সুরা বাকারা) : ২২।

আবার কুরআনে ছাদকেও *'আস-সামা'* বলা হয়েছে,

‘আস-সামা’ বলে যদি ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য আকৃতি বা কাঠামো (দৃশ্যমান আকাশ) উদ্দিষ্ট হয়, তাহলে আলোচ্য কথায় *‘ফি’* অব্যয়ের অর্থ *‘মধ্যে’* করা ঠিক হবে না। কেননা এরূপ অর্থ এমন ভ্রমাত্মক ধারণার জন্ম দেয় যে, আকাশ আল্লাহকে পরিবেষ্টন করে আছে। অথচ এ অর্থ বাতিল। কারণ আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো, তাঁর কোনো সৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾.

“যে মনে করে, আল্লাহ কখনোই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে ছাদের (সামার) দিকে রশি প্রলম্বিত করুক, এরপর সেটা কেটে দিক; তারপর দেখুক তার এই প্রচেষ্টা তার আক্রোশের কারণ দূর করে কি না!” **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ২২ (সুরা হাজ) : ১৫।

আরবি ভাষায় *‘আস-সামা’* শব্দের এরকম নানাবিধ প্রয়োগ থেকে প্রতীয়মান হয়, *আস-সামা* মানে নিরঙ্কুশ ঊর্ধ্বতা। **টীকা সমাপ্ত।**

আল্লাহর কথার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য

(قول أهل السنة في كلام الله تعالى)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾. ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾. ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾. ﴿مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ﴾. ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾. ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾. ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾.

মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ অপেক্ষা কথায় কে বেশি সত্যপরায়ণ?"[237] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ অপেক্ষা কথায় কে বেশি সত্যপরায়ণ?"[238] তিনি আরও বলেছেন, "তোমার রবের কথা সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ।"[239] তিনি আরও বলেছেন,

---

[237] সুরা নিসা : ৮৭।

[238] সুরা মায়িদা : ১১৬।

[239] সুরা আনআম : ১১৫।

“আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।”[240] তিনি আরও বলেছেন, “রসুলদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন।”[241] তিনি বলেছেন, “মুসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো, তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন।”[242] তিনি আরও বলেছেন, “আমি তাকে ডাক দিয়েছিলাম তুর পর্বতের ডান দিক থেকে এবং আমি একান্তে আলাপের জন্য তাকে করেছিলাম নিকটবর্তী।”[243] তিনি আরও বলেছেন, “স্মরণ করো, যখন তোমার রব মুসাকে ডেকে বললেন, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও।”[244] তিনি বলেছেন, “তাদের রব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে (এর কাছে যেতে) তোমাদেরকে নিষেধ করিনি?”[245] তিনি আরও বলেছেন, “আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসুলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে?”[246] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

---

[240] সুরা নিসা : ১৬৪।

[241] সুরা বাকারা : ২৫৩।

[242] সুরা আরাফ : ১৪৩।

[243] সুরা মারইয়াম : ৫২।

[244] সুরা শুয়ারা : ১০।

[245] সুরা আরাফ : ২২।

[246] সুরা কাসাস : ৬৫।

মহান আল্লাহর কথার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য হচ্ছে—এটি আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ। আল্লাহ্ সর্বদা বাস্তবিক অর্থেই কথা বলার গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং থাকবেন। তাঁর কথায় আওয়াজ আছে, কিন্তু তা মাখলুকের আওয়াজের মতো নয়। আবার তাঁর কথায় হরফ তথা বর্ণ আছে। তিনি যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা কথা বলে থাকেন। এ ব্যাপ্যারে আহলুস সুন্নাহর অনেক দলিল রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾.

"আল্লাহ্ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।"[247]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾.

"মুসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো, তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন।"[248]

তাঁর কথায় যে আওয়াজ আছে, তার দলিল— মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾.

---

[247] সুরা নিসা : ১৬৪।

[248] সুরা আরাফ : ১৪৩।

“আমি তাকে (মুসাকে) ডাক দিয়েছিলাম তুর পর্বতের ডান দিক থেকে এবং আমি একান্তে আলাপের জন্য তাকে করেছিলাম নিকটবর্তী।”[249]

সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ».

“আল্লাহ তাআলা আদমকে বলবেন, ‘হে আদম।’ আদম আলাইহিস সালাম জবাবে বলবেন, ‘হে আল্লাহ, আপনার নিকটে আমি হাজির, আপনার প্রতি আমি পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ এরপর আল্লাহ তাঁকে আওয়াজ করে ডাকবেন, ‘আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের করবে’। আদাম বলবেন, ‘হে রব, জাহান্নামি দলের পরিমাণ কী?’ (বলা হবে, প্রতি হাজারে নয়শো নিরানব্বইজন)।”[250]

---

[249] সুরা মারইয়াম : ৫২।

[250] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৮৩, ৪৭৪১, ৬৫২৯ ও ৬৫৩০; সহিহ মুসলিম, হা. ৩২২ ও ৩৭৯।

তাঁর কথায় যে হরফ তথা বর্ণ আছে, তার দলিল— মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾.

"আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো।"[251]

এখানে (আদমের উদ্দেশে প্রদত্ত) বক্তব্যের কথাগুলো— হরফ তথা বর্ণ।[252]

আল্লাহ যে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক (বিভিন্ন সময়) কথা বলে থাকেন, তার দলিল— মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾.

"মুসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো, তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন।"[253]

---

[251] সুরা বাকারা : ৩৫।

[252] যেমন *'ইয়া আদাম'* কথায় ইয়া একটি হরফ, আলিফ একটি হরফ, দাল একটি হরফ, মিম একটি হরফ। জাহমিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায় বিলকুলই আল্লাহর কথাকে 'তাঁর সত্তায় বিদ্যমান এমন গুণ' হিসেবে স্বীকার করে না। আর কুল্লাবিয়া, আশারিয়া ও মাতুরিদিয়ার মতো পথভ্রষ্ট কালামি সম্প্রদায় আল্লাহর কথার আওয়াজ ও হরফ অস্বীকার করে থাকে। –***অনুবাদক।***

[253] সুরা আরাফ : ১৪৩।

অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম উপস্থিত হওয়ার পরই আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন।[254]

মহান আল্লাহর কথা মূলত তাঁর সত্তাগত গুণ। কেননা আল্লাহ সর্বদাই কথা বলতে সক্ষম এবং কথা বলার গুণটি কখনোই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। **আবার কথার এককের বিবেচনায় এটি তাঁর কর্মগত গুণ।** কেননা কথার এককগুলো আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলে থাকেন। লেখক *'কথা বলা'* গুণের অনেক দলিল উল্লেখ করেছেন। কেননা আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত মাসায়েলের মধ্যে এই গুণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিবাদবিসংবাদ আর ফিতনা সংঘটিত হয়েছে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[254] **অনুবাদকের টীকা :** আল্লাহ যে বিভিন্ন সময়ে কথা বলেন, তা পথভ্রষ্ট কুল্লাবি, আশারি ও মাতুরিদিরা অস্বীকার করে থাকে। কারণ এর ফলে 'কথা বলা' সিফাতটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন কর্মগত গুণ হয়ে যায়। আর তাদের আকিদা অনুযায়ী আল্লাহর কথা মানে একটিই কথা, যা তাঁর নফসের ভাব তথা মনের কথা (كلام نفسي), তাঁর সেই কথা কখনো বিভাজিত হয় না। তাদের এ আকিদা অতিশয় ভ্রষ্ট বিদাতি আকিদা। **টীকা সমাপ্ত।**

কুরআনের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য

(قول أهل السنة في القرآن الكريم)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾. ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾. ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾. ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾. ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾.

তিনি বলেছেন, মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান করো, যাতে সে আল্লাহর কথা (কুরআন) শুনতে পায়।”[255] তিনি আরও বলেছেন,

---

[255] সুরা তাওবা : ৬।

“অথচ তাদের মধ্যে এমন কতক লোক গত হয়েছে যারা আল্লাহর কথা শুনত, এরপর তা বুঝার পর জেনেশুনে তাকে বিকৃত করত।”[256] তিনি আরও বলেছেন, “তারা আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের অনুসরণ করবে না। আল্লাহ পূর্বেই এমনটি বলেছেন।”[257] তিনি আরও বলেছেন, “তুমি তোমার প্রতি ওহিকৃত তোমার রবের কিতাব পড়; তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই।”[258] তিনি আরও বলেছেন, “বানি ইসরাইল সম্প্রদায় যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশই তাদের নিকট বর্ণনা করে।”[259]

তিনি বলেছেন, “আর এই কিতাব (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা বরকতময় কিতাব।”[260] তিনি আরও বলেছেন, “যদি আমি এই কুরআন পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে।”[261] তিনি আরও বলেছেন, “আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলে, তুমি তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু তাদের

---

[256] সুরা বাকারা : ৭৫।

[257] সুরা ফাতহ : ১৫।

[258] সুরা কাহফ : ২৭।

[259] সুরা নামল : ৭৬।

[260] সুরা আনআম : ৯২।

[261] সুরা হাশর : ২১।

অধিকাংশই জানে না। তুমি বল, তোমার রবের নিকট হতে রুহুল কুদুস (জিবরাইল) সত্য-সহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যারা মুমিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হেদায়েত ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য। নিশ্চয় আমি জানি তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় জনৈক ব্যক্তি। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবি নয়; অথচ এটা (কুরআনের ভাষা) স্পষ্ট আরবি ভাষা।”[262] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত বলে থাকে, কুরআন আল্লাহর কথা, যা নাজিলকৃত বাণী এবং সৃষ্ট নয়; আল্লাহর নিকট থেকেই কুরআন এসেছে এবং (শেষ যুগে) তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

কুরআন যে আল্লাহর কথা, এর দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾.

“মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান করো, যাতে সে আল্লাহর কথা (কুরআন) শুনতে পায়।”[263] এখানে আল্লাহর কথা মানে কুরআন।

---

[262] সুরা নাহল : ১০১-১০৩।

[263] সুরা তাওবা : ৬।

কুরআন যে নাজিলকৃত বাণী, এর দলিল— মহান আল্লাহর এই আয়াতে, যেখানে তিনি বলেছেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾.

"বড়োই বরকতময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন।"[264]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

"আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো, আর আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"[265]

কুরআন যে সৃষ্ট নয়, তার দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾.

"জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও (চলবে) তাঁর।"[266]

আল্লাহ এখানে *'আমর'* তথা *'নির্দেশকে'* সৃষ্টি থেকে আলাদা করেছেন। আর কুরআন নির্দেশের অন্তর্গত। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

[264] সুরা ফুরকান : ১।

[265] সুরা আনআম : ১৫৫।

[266] সুরা আরাফ : ৫৪।

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾.

"অনুরূপভাবে আমি তোমার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রুহকে (কুরআনকে) ওহি করেছি।"[267]

তথাপি কুরআন আল্লাহর কথার অন্তর্গত। আল্লাহর কথা তাঁর একটি অন্যতম গুণ। আর আল্লাহর গুণাবলি সৃষ্ট নয়।

***'আল্লাহর নিকট থেকেই কুরআন এসেছে'* – এর মানে :** আল্লাহ সর্বপ্রথম কুরআন বলেছেন।

***'আল্লাহর কাছেই কুরআন ফিরে যাবে'* – এর মানে :** শেষ যুগে কুরআন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, যখন কুরআনকে উঠিয়ে নেওয়া হবে কুরআনের মুসহাফ ও মানুষের সিনা থেকে। কুরআনের সম্মানার্থেই কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে, যখন মানুষ কুরআনকে গ্রহণ করবে ঠাট্টাবিদ্রুপ আর খেলতামাশা হিসেবে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[267] সুরা শুরা : ৫২।

আল্লাহ প্রকাশিত হবেন আর বান্দারা আল্লাহকে দেখবে

(الله يتجلى والعباد يرونه)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾. ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾. ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾. ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾. وَهَذَا البَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ، مَنْ تَدَبَّرَ القُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ.

মহান আল্লাহ বলেছেন, “সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।”[268] তিনি আরও বলেছেন, “তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।”[269] তিনি আরও বলেছেন, “যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং তারচেয়েও অতিরিক্ত।”[270] তিনি আরও বলেছেন, “সেখানে তারা যা ইচ্ছে করবে তাই পাবে,

---

[268] সুরা কিয়ামা : ২২-২৩।

[269] সুরা মুতাফফিফিন : ২৩।

[270] সুরা ইউনুস : ২৬।

আর আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।”[271] আল্লাহর কিতাবে এ সংক্রান্ত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সংক্রান্ত) আয়াত অনেক রয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন থেকে হেদায়েত অন্বেষণের জন্য কুরআন অনুধাবন করবে, তার কাছে এ বিষয়ে হকপথ প্রতিভাত হয়ে যাবে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[272]

---

[271] সুরা কফ : ৩৫।

[272] **অনুবাদকের টীকা :** ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনু উসাইমিন এখানে এসব আয়াত নিয়ে আলোচনা করেননি। বরং আল্লাহকে দেখা সম্পর্কিত আলোচনা তিনি পরবর্তীতে সিফাত বিষয়ক হাদিসের আলোচনায় পিছিয়ে দিয়েছেন। এজন্য আমি (অধম অনুবাদক) এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি। এসব আয়াত থেকে আল্লাহর ***‘প্রকাশিত হওয়া’*** গুণটি সাব্যস্ত হয়। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***“শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা (১) / বারনামাজু মুহিম্মাতিল ইলম ১৪৪২ / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি”***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, দারস আপলোডের তারিখ : ২২শে এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ১:০০:১৫ মিনিট থেকে ১:০০:৫০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/gWAaZ1Nt4LI?si=KIw3MrpID4Qz-Xym।

আর *‘প্রকাশিত হওয়া’* গুণটির কথা কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যেও এসেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا **تَجَلَّىٰ** رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

“মুসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো, তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, ‘হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন।’ আল্লাহ বললেন, ‘তুমি আমাকে (দুনিয়াতে) কখনোই দেখতে পারবে না, তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।’ অনন্তর **তার রব যখন পাহাড়ে প্রকাশিত হলেন,** তখন তিনি (তাঁর প্রকাশের দরুন) পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন, আর মুসা হয়ে গেল সংজ্ঞাহীন। যখন চেতনা ফিরে এল, তখন সে বলল, আপনি মহাপবিত্র, আপনার কাছেই আমি তওবা করছি এবং আমিই (আমার উম্মতের মধ্যে) সর্বপ্রথম ইমান আনয়নকারী।” **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ৭ (সুরা আরাফ) : ১৪৩।

পাশাপাশি মূলপাঠে উদ্ধৃত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, মুমিনরা স্বচক্ষে সরাসরি মহান আল্লাহকে কেয়ামতের প্রান্তরে এবং জান্নাতে যেয়ে দেখতে পাবে। এ বিষয়টি সর্ববাদিসম্মত। আর দুনিয়ায় কেউ আল্লাহকে দেখতে পাবে না। পক্ষান্তরে

সুন্নাহর পরিচয় এবং সুন্নাহসম্মত বিধানের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব

(التعريف بالسنة والإيمان بما جاءت به)

মূলপাঠ :

فَصْلٌ: ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: تُفَسِّرُ القُرْآنَ، وَتُبَيِّنُهُ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، وَتُعَبِّرُ عَنْهُ. وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ - مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِالقَبُولِ -: وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ.

পরিচ্ছেদ : (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতেও আল্লাহর গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে) প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ কুরআনকে ব্যাখ্যা করে, কুরআনের বিবরণ দেয়, কুরআনের পক্ষে প্রমাণ বহন করে এবং কুরআনের বিষয়বস্তু ব্যক্ত করে। বিদ্বানগণ যেসব বিশুদ্ধ হাদিসকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন, সেসব হাদিসে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেসকল গুণের প্রতিও একইভাবে ইমান আনা ওয়াজিব। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

কাফিররা কেয়ামতের প্রান্তরে আল্লাহকে দেখতে পাবে কিনা সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আস-সিন্ধি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (সনতারিখবিহীন ট্রান্সক্রিপ্ট), পৃ. ৪৯০-৪৯৩। **টীকা সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আভিধানিক অর্থে, সুন্নাহ মানে তরিকা বা আদর্শ। বিবৃতিমূলক হোক, কিংবা অনুজ্ঞাসূচক, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদন তথা তাঁর সামগ্রিক শরিয়তকেই *'নবির সুন্নাহ'* বলা হয়। সুন্নাহয় যা এসেছে তার প্রতি ইমান আনা কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি ইমান আনয়নের মতোই ওয়াজিব। চাই তা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে হোক, কিংবা অন্যক্ষেত্রে (সকল বিষয়ের প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব)। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾.

"রসুল তোমাদেরকে যা দেয়, তোমরা তা গ্রহণ করো।"[273]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾.

"যে ব্যক্তি রসুলের অনুগত হয়, সে মূলত আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে।"[274] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[273] সুরা হাশর : ৭।

[274] সুরা নিসা : ৮০।

আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন
(نزول الله إلى السماء الدنيا)

মূলপাঠ :

مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

যেমন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহান আল্লাহ প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।”[275] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

সুন্নাহয় আল্লাহর এমনকিছু সিফাত বর্ণিত হয়েছে, যা কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। তারমধ্যে অন্যতম একটি সিফাত– *‘দুনিয়ার আসমানে*

[275] সহিহুল বুখারি, হা. ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, হা. ৭৫৮।

আল্লাহর অবতরণ।’ দলিল— রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»

“মহান আল্লাহ প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।”[276]

আহলুস সুন্নাহর অভিমত অনুযায়ী অবতরণ করার মানে, মহান আল্লাহ সত্যিকারার্থেই এমনভাবে অবতরণ করেন, যা তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই। তাঁর অবতরণের ধরন কেমন, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। **পক্ষান্তরে তাবিলকারী (অপব্যাখ্যাকারী) সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী অবতরণ করার মানে, মহান আল্লাহর নির্দেশ (কিংবা তাঁর ফেরেশতা) অবতরণ করে। আমরা নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের খণ্ডন করে থাকি। যথা :**

[276] সহিহুল বুখারি, হা. ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, হা. ৭৫৮।

১. তাদের ব্যাখ্যা হাদিসের শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত এবং সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যেরও বিপরীত।

২. আল্লাহর নির্দেশ সবসময় অবতীর্ণ হয়, রাতের শেষ তৃতীয়াংশের সাথে তা খাস নয়।

৩. নির্দেশের (কিংবা ফেরেশতার) পক্ষে এমনটি বলা সম্ভব নয় যে, *'কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব।...'*

দুনিয়ার আসমানে মহান আল্লাহর অবতরণের সাথে তাঁর ওপরে থাকার কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা মহান আল্লাহর মতো কিছুই নেই। সৃষ্টিকুলের অবতরণের সাথে তাঁর অবতরণকে তুলনা করা চলবে না। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর খুশি এবং হাসি (الفرَح والضحك)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ ...» الحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَوْلِهِ ﷺ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কোনো লোক হারানো সওয়ারি পাওয়ার পর যেমন আনন্দিত হয়, মুমিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ এরচেয়েও বেশি খুশি হন।"[277] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে।"[278] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

শুধু হাদিসে বর্ণিত আরেকটি সিফাত– খুশি হওয়া। দলিল—

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ».

---

[277] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৩০৯; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৪৭।

[278] সহিহুল বুখারি, হা. ২৮২৬; সহিহ মুসলিম, হা. ১৮৯০।

"তোমাদের কোনো লোক হারানো সওয়ারি পাওয়ার পর যেমন আনন্দিত হয়, মুমিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ এরচেয়েও বেশি খুশি হন।"[279]

এটি এমন সত্যিকারের খুশি, যা আল্লাহর সাথে মানানসই। **আল্লাহর *'খুশি হওয়া'* মানে *'সওয়াবদান'* বলে ব্যাখ্যা করা না-জায়েজ। (১)** কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** আর সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যেরও বিপরীত।

স্রেফ হাদিসে বর্ণিত আরেকটি সিফাত– হাসা (হাস্য করা)। দলিল— রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ».

"দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে।"[280]

আহলুস সুন্নাহ আল্লাহর হাসির ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাখ্যা করে যে, এটি সত্যিকারের এমন হাসি, যা আল্লাহর সাথেই মানানসই। **অপরপক্ষে তাবিলকারীরা আল্লাহর *'হাসি'* সিফাতের ব্যাখ্যা করে, এর মানে সওয়াব দেওয়া। আমরা তাদেরকে নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে**

---

[279] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৩০৯; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৪৭।

[280] সহিহুল বুখারি, হা. ২৮২৬; সহিহ মুসলিম, হা. ১৮৯০।

খণ্ডন করে থাকি— (১) তাদের ব্যাখ্যা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যেরও বিপরীত।

হাদিসে বর্ণিত বিষয়টির স্বরূপ হচ্ছে— একজন কাফির জিহাদ চলাকালীন সময়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করে। এরপর উক্ত কাফির ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের ওপরই মারা যায়। এরা দুজনই জান্নাতে যাবে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহ আশ্চর্য হন (العجَب)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلِينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ؛ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» حَدِيثٌ حَسَنٌ.

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের রব তাঁর বান্দাদের নিরাশা এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তনের নিকটত্ব দেখে আশ্চর্য হন। তিনি তোমাদেরকে বিপদাপন্ন, নিরাশ দেখেন। অনন্তর তিনি হাসতে শুরু করেন। তিনি জানেন যে, তোমাদের বিপদমুক্তি অতি নিকটে।" হাদিসটির সনদ হাসান।[281] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

'আশ্চর্য হওয়া' যে মহান আল্লাহর সিফাত, তা কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿بَلْ عَجِبْتُ﴾.

"বরং আমি আশ্চর্য হয়েছি।"[282]

---

281 আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১১; ইবনু মাজাহ, হা. ১৮১; সনদ : দুর্বল।

282 সুরা সাফফাত : ১২।

‘আজিবতু’ শব্দের *‘তা’* বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে যেই কেরাতে, সেই কেরাত অনুযায়ী (আশ্চর্য হওয়া আল্লাহর সিফাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে)।[283]

আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ».

“আমাদের রব তাঁর বান্দাদের নিরাশা এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তনের নিকটত্ব দেখে আশ্চর্য হন।”[284] [285]

আল্লাহর ক্ষেত্রে যেই আশ্চর্যবোধ অসম্ভব, তা হলো— আশ্চর্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যবোধ। কারণ আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপনীয় নয়। পক্ষান্তরে যে বিষয়টি

---

283 **অনুবাদকের টীকা :** বলা বাহুল্য, কুরআনের প্রসিদ্ধ সাতটি কেরাত রয়েছে, যার সবগুলোই মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনা) সূত্রে প্রমাণিত। হামজা, কিসায়ি ও খালাফের কেরাত অনুযায়ী এ আয়াতের অর্থ হয়, *‘বরং আমি আশ্চর্য হয়েছি।’* আর আবু আমর, আসিম প্রমুখের কেরাত অনুযায়ী এ আয়াতের অর্থ হয়, *‘বরং আপনি আশ্চর্য হয়েছেন।’* **দেখুন :** আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন***, খ. ১৯, পৃ. ৫১৩-৫১৪; শামসুদ্দিন আবুল খাইর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল জাজারি, ***আন-নাশর ফিল কিরাআতিল আশর***, তাহকিক : আলি মুহাম্মাদ আদ-দাব্বা (প্রকাশনার স্থানবিহীন : আল-মাতবাআতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, তাবি), খ. ২, পৃ. ৩৫৬। **টীকা সমাপ্ত।**

284 আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১১; ইবনু মাজাহ, হা. ১৮১; **সনদ :** দুর্বল।

285 **অনুবাদকের টীকা :** লেখক ও ব্যাখ্যাকারের উল্লিখিত হাদিসটি দুর্বল হলেও *বুখারি-মুসলিমের* হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

“আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের উভয়ের ব্যবহারে আল্লাহ আশ্চর্য হয়েছেন।” **দ্রষ্টব্য :** সহিহুল বুখারি, হা. ৩৭৯৮; সহিহ মুসলিম, হা. ২০৫৪। **টীকা সমাপ্ত।**

তার সমতুল্য বিষয়াবলি থেকে কিংবা তার জন্য যেমনটি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল তা থেকে আলাদা হয়ে যায়, এর দরুন সংঘটিত আশ্চর্য আল্লাহর জন্য সুসাব্যস্ত। এজন্য আহলুস সুন্নাহ আল্লাহর আশ্চর্য হওয়ার এরূপ ব্যাখ্যা করে যে, এটি সত্যিকারের আশ্চর্যবোধ, যা আল্লাহর সাথেই মানানসই। **অপরপক্ষে তাবিলকারী (অপব্যাখ্যাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর *'আশ্চর্য/বিস্ময়'* সিফাতের ব্যাখ্যা করে, এর মানে আল্লাহর সওয়াবদান কিংবা শাস্তিপ্রদান। তাদেরকে নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করা হবে— (১)** তাদের ব্যাখ্যা কুরআন-সুন্নাহর শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যেরও বিপরীত। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর পা (الرِّجْل أو القَدَم)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অনবরত জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তবুও জাহান্নাম বলবে, আরও বেশি আছে কি? অবশেষে প্রতাপশালী আল্লাহ জাহান্নামের ওপর আপন পা স্থাপন করবেন। তখন এর একাংশ অপরাংশের সাথে চেপে যাবে, আর বলবে, ‘যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে’।”[286] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত সিফাতগুলোর অন্যতম– মহান আল্লাহর পা। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ».

[286] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩৮৪; সহিহ মুসলিম, হা. ২৮৪৮।

“অনবরত জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তবুও জাহান্নাম বলবে, আরও বেশি আছে কি? অবশেষে প্রতাপশালী আল্লাহ জাহান্নামের ওপর আপন পা স্থাপন করবেন। তখন এর একাংশ অপরাংশের সাথে চেপে যাবে, আর বলবে, ‘যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে’।”[287]

আহলুস সুন্নাহ আল্লাহর পায়ের এরূপ ব্যাখ্যা করে যে, এটি সত্যিকারের পা; যেভাবে আল্লাহর জন্য সঙ্গতিপূর্ণ হবে, সেভাবেই তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত। **অপরপক্ষে তাবিলকারী (অপব্যাখ্যাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর ‘পা (الرِّجْل)’ সিফাতের ব্যাখ্যা করে, এর মানে এমন একটি দল যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে দেবেন। আবার ‘পা (القَدَم)’ সিফাতের আরেকটি ব্যাখ্যা করে, এর মানে জাহান্নামের দিকে পাঠানো হয়েছে এমন দল। আমরা তাদেরকে নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করব— (১)** তাদের ব্যাখ্যা কুরআন-সুন্নাহর শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)** সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যেরও বিপরীত, **(৩)** তাদের এরূপ ব্যাখ্যার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[287] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩৮৪; সহিহ মুসলিম, হা. ২৮৪৮।

মহান আল্লাহর কথা (كلام الله)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَوْلِهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ».

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আদমকে বলবেন, 'হে আদম।' আদম আলাইহিস সালাম জবাবে বলবেন, 'হে আল্লাহ, আপনার নিকটে আমি হাজির, এবং আপনার আনুগত্যের ওপরই আমি রয়েছি (আপনার হুকুম তামিল করতে আমি সদাপ্রস্তুত)।' এরপর আল্লাহ তাঁকে আওয়াজ করে ডাকবেন, 'আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের করবে'।"[288]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন।

[288] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৮৩, ৬৫২৯ ও ৬৫৩০; সহিহ মুসলিম, হা. ৩২২ ও ৩৭৯।

আর সেদিন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না।”[289]
মূলপাঠ সমাপ্ত।[290]

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর কথার ব্যাপারে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হলো— আল্লাহর কথা তাঁর একটি অন্যতম সৃষ্টি; তাঁর (সত্তায় বিদ্যমান) অন্যতম সিফাত তথা গুণ নয়। মহান আল্লাহ কথাকে স্রেফ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার নিমিত্তে নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন, যেমন তিনি নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন গৃহ ও উটনীকে। তিনি বলেছেন,

﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾.

“আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে।”[291]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ﴾.

“এটি আল্লাহর উটনী।”[292]

---

[289] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৫৩৯; সহিহ মুসলিম, হা. ৬৭ ও ১০১৬।

[290] ব্যাখ্যাকার রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর কথা বিষয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছেন এবং পুনরায় সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত সিফাতগুলোর শেষে গিয়ে এ বিষয়ক আলোচনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের অনুসৃত নুসখাসমূহ অনুযায়ী মূলগ্রন্থের সাথে মিল রাখার জন্য আলোচনাটি আমরা এগিয়ে নিয়ে আসলাম। – ***অনুবাদক।***

[291] সুরা হাজ : ২৬।

[292] সুরা আরাফ : ৭৩।

আল্লাহর কথার ব্যাপারে আশারিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হলো— আল্লাহর কথা তাঁর একটি অন্যতম গুণ। কিন্তু উক্ত কথা আসলে অন্তরে অবস্থিত ভাব (অন্তরের কথা)। আর কথায় বিদ্যমান বর্ণগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্তরের ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য। অপরপক্ষে কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আশারিয়া সম্প্রদায়ের মতো একই মতবাদ ব্যক্ত করে। তবে তারা কথার শব্দগুচ্ছকে *'আল্লাহর কথার হুবহু বিবরণ'* আখ্যা দেয়। বলে না, এগুলো *'আল্লাহর কথার ভাব'* (যা আশারিরা বলে থাকে)। উক্ত দুই ফের্কার উভয় মতাদর্শ অনুযায়ী মহান আল্লাহর কথায় কোনো বর্ণ ও আওয়াজ নেই; বরং আল্লাহর কথা স্রেফ অন্তরের ভাব (বা ভাবনা)। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহ যে ওপরে আছেন সে বিষয়ক হাদিস

(الأحاديث التي تُثبِت علو الله)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ فِي رُقْيَةِ المَرِيضِ: «رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوَجَعِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَوْلِهِ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟!» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَوْلِهِ: «وَالعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَقَوْلِهِ لِلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে ঝাড়ফুঁক করার দোয়ায় বলেছেন, "হে আমাদের রব, আল্লাহ, যিনি আসমানের ওপরে রয়েছেন, আপনার নাম পবিত্র, আপনার যাবতীয় নির্দেশ আসমান ও জমিনে কার্যকর। আপনার রহমত যেমন আকাশে বিদ্যমান, তেমন জমিনেও আপনার রহমত বর্ষণ করুন! আমাদের ছোটোবড়ো পাপগুলো ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্র বান্দাদের রব, আপনার দয়া থেকে দয়া বর্ষণ করুন এবং এ রোগের জন্য আপনার আরোগ্যব্যবস্থা

থেকে আরোগ্য দিন।” হাদিসটির সনদ হাসান।[293] রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কি আমার ওপর আস্থা রাখ না, অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন?”[294] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, “তার ওপর রয়েছে আরশ, আর আল্লাহ রয়েছেন আরশের ওপর। তোমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি জানেন।” হাদিসটির সনদ হাসান। আবু দাউদ ও অন্যান্যরা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[295]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আল্লাহ কোথায়?’ দাসী বলে, ‘আকাশের ওপরে।’ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমি কে?’ সে বলে, ‘আপনি আল্লাহর রসুল।’ তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দাসীর

---

[293] আবু দাউদ, হা. ৩৮৯২; নাসায়ি কৃত আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, হা. ১০৩৭; সনদ : দুর্বল (তাহকিক : সালিহ আল-উসাইমি)।

[294] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৩৫১; সহিহ মুসলিম, হা. ১০৬৪।

[295] **অনুবাদকের টীকা :** শাইখুল ইসলাম এখানে আবু দাউদের রেফারেন্স দিয়েছেন, কিন্তু আবু দাউদে হাদিসটি (হা. ৪৭২৩) অন্য শব্দে এসেছে। আবু দাউদে বর্ণিত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসই যে তিনি উদ্দেশ্য করেছেন এখানে, সেটা *‘মুনাজারাতুল ওয়াসিতিয়্যা’* এবং *‘আল-হামাবিয়্যা’* গ্রন্থদ্বয়ে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন শাইখুল ইসলাম। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া***, খ. ৩, পৃ. ১৭৮; আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***আল-ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যাহ আল-কুবরা***, তাহকিক : হামাদ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুওয়াইজিরি (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২০৭-২০৯।

তবে মূলপাঠে উল্লিখিত শব্দরূপে হাদিসটি ইমাম ইবনু খুজাইমা তদীয় *‘আত-তাওহিদ’* গ্রন্থে (হা. ১৪৯-১৫০) এবং ইমাম তাবারানি তাঁর *‘আল-মুজামুল কাবির’* গ্রন্থে (হা. ৮৯৮৭) বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ (তাহকিক : আলবানি ও ইবনু বাজ)। **টীকা সমাপ্ত।**

মনিবকে) বলেন, 'তুমি একে মুক্ত করে দাও, সে একজন মুমিন নারী।'[296] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

রোগীকে ঝাড়ফুঁক করার হাদিসে আল্লাহর যেসব সিফাত সাব্যস্ত হয়, তারমধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো— আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্ব, আকাশের ওপরে তাঁর অবস্থান, যাবতীয় ত্রুটি থেকে তাঁর নামসমগ্রের পবিত্রতা, আসমান ও জমিনে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব, যার দরুন আসমান ও জমিনে কার্যকর হয় তাঁর সকল নির্দেশ, তাঁর দয়া, আরোগ্যদান তথা রোগ-দূরীকরণ।

আর দাসীর হাদিসে আল্লাহর সিফাত হিসেবে তাঁর স্থান সাব্যস্ত হয়, প্রমাণিত হয় যে, তিনি আকাশের ওপরে আছেন (وفي حديث الجارية من صفات الله: إثبات المكان لله وأنه في السماء)। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**[297]

---

[296] সহিহ মুসলিম, হা. ৫৩৭, মসজিদ ও নামাজের স্থানসমূহ অধ্যায় (৫), পরিচ্ছেদ : ৭।

[297] **অনুবাদকের টীকা :** ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এখানে আল্লাহর জন্য *'মাকান'* তথা *'স্থান'* সাব্যস্ত করেছেন। সালাফগণের বক্তব্যেও আমরা আল্লাহর জন্য *'মাকান'* সাব্যস্তের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন তাবেয়ি তাফসিরকারক ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

عَن مُجَاهِد ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نجيا﴾ قَالَ بَين السَّمَاء السَّابِعَة وَبَين الْعَرْش سَبْعُونَ أَلف حجاب فَمَا زَالَ يقرب مُوسَى حَتَّى كَانَ بَينه وَبَينه حجاب فَلَمَّا رأى مَكَانَهُ وَسمع صريف الْقَلَم قَالَ ﴿رب أَرِنِي أنظر إِلَيْك﴾.

মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত, *"এবং আমি একান্তে আলাপের জন্য তাকে করেছিলাম নিকটবর্তী"* – শীর্ষক আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সপ্তম আকাশ ও আরশের মাঝে সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম (আল্লাহর) নিকটবর্তী হতে হতে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর মাঝে ব্যবধান ছিল কেবল পর্দা। তিনি

যখন তাঁর স্থান (*মাকান*) দেখেন এবং কলমের খসখস আওয়াজ শোনেন, তখন বলে ওঠেন, *"হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।"* **দ্রষ্টব্য :** শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গফফার ফি ইদাহি সহিহিল আখবার ওয়া সাকিমিহা***, তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ (রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১২৮, বর্ণনা নং : ৩৫০; **বর্ণনার মান :** ইমাম জাহাবি বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেছেন, *"তাফসিরশাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ থেকে এই বর্ণনা প্রমাণিত, বাইহাকি 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"* জাহমি-গুরু গোঁড়া হানাফি জাহিদ আল-কাওসারি বর্ণনাটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছে, কিন্তু তার খণ্ডন করে শাইখ আলবানি বলেছেন, *'বর্ণনাটির সনদ সহিহ।'* **দেখুন :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***মুখতাসারুল উলু লিল আলিয়্যিল আজিম*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৩২।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করেন, তাঁদের মাঝে আল্লাহর জন্য *'মাকান'* তথা *'স্থান'* সাব্যস্ত করা নিয়ে মতভেদ হয়েছে; কেউ কেউ সাব্যস্ত করেছেন, কেউ কেউ করেননি। এরপর ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে বিশদ-বিবরণসংবলিত বিধান উল্লেখ করে বলেছেন :

وحقيقة الأمر في المعنى أن ينظر إلى المقصود، فمن اعتقد أن **المكان** لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن، سواء كان محيطًا به أو كان تحته فمعلوم أن الله سبحانه ليس في **مكان** بهذا الاعتبار، ومن اعتقد أن العرش هو **المكان**، وأن الله فوقه، مع غناه عنه، فلا ريب أنه في **مكان** بهذا الاعتبار.

প্রকৃতপ্রস্তাবে এ বিষয়ে (কথকের) উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ করতে হবে। যিনি মনে করেন, ***মাকান*** তথা ***স্থান*** বলতে কেবল এমনকিছুই বোঝায়, যার মুখাপেক্ষী হতে হয় *মাকান-গ্রহণকারীকে*; চাই সেই *স্থান* মাকান-গ্রহণকারীকে পরিবেষ্টন করে থাকুক, কিংবা মাকান-গ্রহণকারীর নিচে থাকুক, (তাঁর উক্ত ধারণা অনুযায়ী) এটা সুবিদিত যে, এই বিবেচনায় মহান আল্লাহ কোনো ***স্থানেই*** বিদ্যমান নন। পক্ষান্তরে যিনি মনে করেন, আরশ হচ্ছে ***স্থান***, আর আরশ থেকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী থাকা সত্ত্বেও তিনি আরশের ওপরে রয়েছেন, তাহলে এই বিবেচনায় নিঃসন্দেহে আল্লাহ একটি ***স্থানে*** রয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু তাইমিয়া, দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকল, খ. ৬, পৃ. ২৪৯। **টীকা সমাপ্ত।**

আল্লাহ বান্দাদের সাথে থাকেন (معية الله)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ.

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম ইমান হলো তোমার এটা জেনে রাখা যে, তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার সাথে রয়েছেন।" হাদিসটির সনদ হাসান।[298] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[299]

---

[298] আবু নুয়াইম, ***হিলইয়াতুল আউলিয়া***, খ. ৬, পৃ. ১২৪; সনদ : দুর্বল (তাহকিক : সালিহ আল-উসাইমি)।

[299] ব্যাখ্যাকার রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে এখানে আলোচনা করেননি। যেহেতু ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। – ***অনুবাদক।***

আল্লাহ নামাজরত বান্দার সামনে থাকেন

(كون الله قِبَلَ وجهِ المصلي)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ায়, সে যেন তার সামনের দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে। কেননা সে যখন নামাজ পড়ে, তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ থাকেন। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা তার বাম পায়ের নীচে থুতু ফেলে।"[300] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

যেভাবে আল্লাহর জন্য সঙ্গতিপূর্ণ, ঠিক সেভাবে এই সামনাসামনি হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত হবে। আবার **বান্দার সামনে থাকার বিষয়টি মহান আল্লাহর ওপরে থাকার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থিও নয়। দুই দিক থেকে সামনে থাকা ও ওপরে থাকার মাঝে সমন্বয়সাধন করা যায়। যথা :**

---

[300] সহিহুল বুখারি, হা. ৪০৬, ৪০৮ ও ৪০৯; সহিহ মুসলিম, হা. ৫৪৭।

এক. মাখলুকের মাঝেও উক্ত দুটো গুণ একত্রিত হতে পারে। যেমন সূর্যোদয়ের সময় যে ব্যক্তি পূর্বদিকে মুখ ফেরায়, তখন সূর্য তার সামনে থাকে, অথচ সূর্য রয়েছে আকাশে। মাখলুকের মাঝেই যদি এই দুটো বৈশিষ্ট্য একত্রিত হতে পারে, তাহলে স্রষ্টার ক্ষেত্রে উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের সম্মিলন আরও অধিকতর উপযোগী হবে।

দুই. মাখলুকের মাঝে যদি উক্ত দুটো গুণ একত্রিত হতে নাও পারে, তা থেকে তো এটা অপরিহার্য হয় না যে, স্রষ্টার ক্ষেত্রেও আলোচ্য গুণদ্বয়ের সম্মিলন অসম্ভব। কারণ আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহ বান্দার নিকটে থাকেন (قرب الله)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَوْلِهِ - لَمَّا رَفَعَ أَصْحَابُهُ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ -: «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আল্লাহ, আপনি আকাশরাজি, জমিন ও মহান আরশের প্রতিপালক। আমাদের রব ও সকল কিছুর পালনকর্তা। আপনি শস্য ও বীজের সৃষ্টিকর্তা, আপনি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার নিকট সকল বিষয়ের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, যেসব বিষয়ের পরিচালনাকারী আপনিই। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার আগে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে কোনো কিছু নেই। আপনিই সর্বোচ্চ, আপনার ঊর্ধ্বে কেউ নেই। আপনিই (ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে) সবচেয়ে নিকটবর্তী, আপনার চেয়ে নিকটে কিছু নেই (আপনার অগোচরে কিছু নেই)। আপনি আমাদের

তরফ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং অভাব থেকে মুক্ত করে আমাদের সচ্ছলতা দিন।”[301]

সাহাবিগণ জিকির করতে গিয়ে তাঁদের স্বর উঁচু করলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের ওপর দয়া করো। কারণ তোমরা কোনো বধির অথবা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না, বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তোমরা যাকে ডাকছ, তিনি তোমাদের সওয়ারি উটের গর্দানের চেয়েও অতি নিকটবর্তী।”[302] **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

মহান আল্লাহর নিকটবর্তিতা কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত। কিতাবে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.

“যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি অতি নিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে ডাকে, তখনই আমি তার ডাকে সাড়া দিই।”[303]

সুন্নাহয় এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[301] সহিহ মুসলিম, হা. ২৭১৩, জিকির অধ্যায় (৪৯), পরিচ্ছেদ : ১৭।

[302] সহিহুল বুখারি, হা. ২৯৯২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭০৪।

[303] সুরা বাকারা : ১৮৬।

«إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا».

“বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে, যিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।”[304]

এটা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর এমন নিকটবর্তিতা, যা আল্লাহর সাথে মানানসই। আল্লাহর এই নিকটে থাকার ব্যাপারটি তাঁর ওপরে থাকার পরিপন্থি নয়। কেননা তিনি সকল বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁকে তুলনা করা যায় না। কারণ তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**[305]

---

[304] সহিহুল বুখারি, হা. ২৯৯২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭০৪।

[305] **অনুবাদকের টীকা :** আমাদের মুর্শিদ আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের দারসে জানিয়েছেন, আহলুস সুন্নাহর অধিকাংশ বিদ্বানের মতে আলোচ্য নিকটবর্তিতা *‘সাথে থাকা’* গুণটির মতো দুভাগে বিভক্ত। যথা :

এক. সর্বব্যাপী নিকটবর্তিতা, আল্লাহ জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সবকিছুর নিকটবর্তী। **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ৫০ (সুরা কাফ) : ১৬।

দুই. সুনির্দিষ্ট নিকটবর্তিতা, আল্লাহ দয়ার মাধ্যমে মুমিন বান্দাদের নিকটবর্তী। **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ২ (সুরা বাকারা) : ১৮৬।

পক্ষান্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখ বিদ্বান মনে করেন, আল্লাহর জন্য কেবল সুনির্দিষ্ট নিকটবর্তিতাই সাব্যস্ত হবে। সর্বব্যাপী নিকটবর্তিতার উল্লেখ রয়েছে এমন দলিলগুলোর ব্যাপারে তাঁরা বলেন, এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সবার নিকটবর্তী। এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো পর্যবেক্ষণ করলে শাইখুল ইসলামের মতটির প্রতি অন্তর ধাবিত হয়। শাইখ উসাইমি এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে সমকালীন বিদ্বানদের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত মতটি ব্যক্ত করেছেন এবং একে প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ইমাম ইবনু উসাইমিন, আল্লামা জাইদ আল-ফাইয়্যাদ, আল্লামা আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি, আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ প্রমুখ। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পরিশীলন : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম (প্রকাশনার নামবিহীন, ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হি.), পৃ. ১১৭; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আত-তালিক আলা সাহিহি মুসলিম*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম

প্রকাশ, ১৪৩৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৪১-২৪২; জাইদ বিন আব্দুল আজিজ আল-ফাইয়্যাদ, ***আর-রাওদাতুন নাদিয়্যা শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুল আলুকা, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি.), পৃ. ২৮৭; আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি, ***আন-নাফাহাতুল মিসকিয়্যা ফিত তালিকি আলাল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুত তাওহিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৫০; সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ, ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা***, পরিশীলন : আদিল বিন মুহাম্মাদ মুরসি রিফায়ি (আলেকজান্দ্রিয়া : মাকতাবাতু দারিল হিজাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.), পৃ. ৩৬৪-৩৬৬; সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা***, খ. ২, পৃ. ১০০-১০১। **টীকা সমাপ্ত।**

বান্দারা তাদের রব আল্লাহকে দেখবে

(رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى)

মূলপাঠ :

وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও, তেমনি তোমাদের প্রতিপালককে অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভীড় বা জুলুমের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ (জামাতে) আদায় করতে সমর্থ হলে তোমরা তাই করবে।"[306]
মূলপাঠ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা :

আল্লাহকে বান্দারা দেখতে পাবে, এ বিষয়টি কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে সুসাব্যস্ত। কিতাবে এসেছে, আল্লাহ বলেছেন,

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾.

[306] সহিহুল বুখারি, হা. ৫৫৪; সহিহ মুসলিম, হা. ৬৩৩।

“যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং তারচেয়েও অতিরিক্ত।”[307] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন, *‘তারচেয়েও অতিরিক্ত’* মানে আল্লাহর চেহারার দর্শনলাভ।[308]

সুন্নাহয় এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا».

“তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও, তেমনি তোমাদের প্রতিপালককে অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভীড় বা জুলুমের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ (জামাতে) আদায় করতে সমর্থ হলে তোমরা তাই করবে।”[309]

এই হাদিসে দর্শনের সাথে দর্শনের সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে, দর্শিতের সাথে দর্শিতের সাদৃশ্য দেওয়া হয়নি (আল্লাহর সাথে চাঁদের সাদৃশ্য দেওয়া হয়নি)। কেননা এখানে সাদৃশ্যদানের *‘কাফ’* (كاف التشبيه) দর্শনলাভের ক্রিয়ার পূর্বে এসেছে, যেই ক্রিয়াটি হয়েছে

[307] সুরা ইউনুস : ২৬।

[308] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮১, ইমান অধ্যায় (১), পরিচ্ছেদ : ৮০।

[309] সহিহুল বুখারি, হা. ৫৫৪; সহিহ মুসলিম, হা. ৬৩৩।

মাসদারের মাধ্যমে তাবিলকৃত (مصدر مُؤَوَّل)।[310] কেননা আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই। আর হাদিসে যে দুটো নামাজের কথা বলা হয়েছে, তা হলো ফজর ও আসরের নামাজ।

কেবল পরকালেই আল্লাহকে দেখা যাবে, দুনিয়ায় নয়। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁর উদ্দেশে বলেছিলেন,

﴿لَنْ تَرَانِي﴾.

"তুমি আমাকে (দুনিয়ায়) কখনোই দেখতে পারবে না।"[311]

আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«واعلموا أنَّكُم لن ترَوا ربَّكُم حتَّى تموتوا».

---

[310] **অনুবাদকের টীকা :** ব্যাখ্যাকারের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, হাদিসে উল্লিখিত كَمَا تَرَوْنَ শব্দদ্বয়ে *'কামা'* শব্দটি দুটো অব্যয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। *'কাফ'* হচ্ছে হারফু জার (জার প্রদানকারী অব্যয়), আর *'মা'* হচ্ছে হারফুল মাসদার। হারফুল মাসদার এবং তৎপরবর্তী ক্রিয়া দিয়ে গঠিত হয় *তাবিলকৃত মাসদার* (مصدر مؤول), যা সরাসরি *মাসদার* তথা *ক্রিয়ামূল* নয়, কিন্তু মাসদারের অর্থবোধক। এ অনুযায়ী হাদিসের বাক্যটি যেন এরকম— إن رؤيتكم لربكم تكون كرؤيتكم للقمر *'অর্থাৎ, রবের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি দেওয়াটা হবে চাঁদের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি দেওয়ার মতো।'* **তাবিলকৃত মাসদার বিষয়ে ব্যাকরণিক আলোচনা দ্রষ্টব্য :** রাদিউদ্দিন মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-ইস্তিরবাজি, ***শারহুর রাদি লি কাফিয়াতি ইবনিল হাজিব***, তাহকিক : ইয়াহইয়া বাশির মিসরি (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৩৮২-১৩৮৩। **টীকা সমাপ্ত।**

[311] সুরা আরাফ : ১৪৩।

“জেনে রেখ, তোমরা মৃত্যুর আগে তোমাদের রবকে কখনোই দেখতে পাবে না।”[312]

তবে কাফিররা আল্লাহকে দেখতে পাবে না।[313] কেননা আল্লাহ বলেছেন,

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾.

“কখনো নয়, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।”[314]

নিম্নোক্ত দলিলগুলোর ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহ এই দেখাকে *‘চোখ দিয়ে দেখা’* বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। যথা :

---

[312] ইবনু হাজার, ***আল-গুনইয়া ফি মাসআলাতির রু’ইয়া***, খ. ১, পৃ. ২৪; সামান্য শব্দের পরিবর্তনে হাদিসটি অন্যান্য গ্রন্থেও এসেছে। **দেখুন :** সহিহ মুসলিম, হা. ২৯৩১, ফিতনা অধ্যায় (৫৪), পরিচ্ছেদ : ১৯; তিরমিজি, হা. ২২৩৫; ইবনু মাজাহ, হা. ৪০৭৭।

[313] **অনুবাদকের টীকা :** কাফিররা যে জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে না, সে বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট ও সর্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে কাফিররা কেয়ামতের প্রান্তরে আল্লাহকে দেখতে পাবে কিনা সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাদের মাঝে তিনটি মতে মতভিন্নতা হয়েছে। একদল উলামার মতে, কাফিররা বিলকুল দেখতে পাবে না। আরেকদল উলামার মতে, প্রকাশ্য কাফিররা দেখতে পাবে না, কিন্তু অপ্রকাশ্য তথা মুনাফেক কাফিররা দেখতে পাবে। আরেকদল উলামার মতে, সকল কাফির আল্লাহকে দেখতে পাবে। তবে তাদের দেখাটি প্রশান্তির হবে না, বরং কষ্ট ও আজাবের হবে সেই দর্শন। এ বিষয়টি ইজতিহাদি মাসায়েলের অন্তর্গত, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি অনুচিত। আমার সামান্য জানাশোনায় প্রতিটি মতের পক্ষে খুবই জোরালো ও শক্তিশালী দলিল রয়েছে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **দ্রষ্টব্য :** আস-সিন্ধি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পৃ. ৪৯০-৪৯৩। **টীকা সমাপ্ত।**

[314] সুরা মুতাফফিফিন : ১৫।

এক. আল্লাহ দেখার বিষয়টিকে চেহারার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, যেই চেহারা হলো দেখার জায়গা। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

"সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[315]

দুই. হাদিসে এসেছে,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».

"তোমরা অচিরেই স্বচক্ষে তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।"[316]

তাবিলকারী (অপব্যাখ্যাকারী) সম্প্রদায় এই দেখা মানে *'সওয়াব দেখা'* বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। *'অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সওয়াব তথা প্রতিদান দেখতে পাবে।'* আমরা তাদেরকে নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করব— (১) তাদের ব্যাখ্যা কুরআন-সুন্নাহর শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, **(২)**

---

[315] সুরা কিয়ামা : ২২-২৩।

[316] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৩৫।

সালাফগণের ইজমা তথা মতৈক্যের বিপরীত, **(৩)** তাদের এরূপ ব্যাখ্যার কোনো দলিল নেই শরিয়তে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**[317]

---

[317] **অনুবাদকের টীকা :** আলোচ্য হাদিস থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সাব্যস্ত হয়। প্রমাণিত হয় *‘প্রকাশিত হওয়া’* আল্লাহর একটি গুণ। *‘প্রকাশিত হওয়ার’* কথা সুস্পষ্টভাবে *সহিহ মুসলিমে* এসেছে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কেয়ামত দিবসের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করে বলেছেন,

«ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ. فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ».

“অনন্তর আমাদের রব আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করবেন, ‘তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ?’ মুমিনগণ বলবে, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি।’ তিনি বলবেন, ‘আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক।’ তারা প্রত্যুত্তর করবে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখছি (আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না)।’ এরপর আল্লাহ হাস্যরত অবস্থায় তাদের কাছে প্রকাশিত হবেন (নিজেকে প্রকাশ করবেন)।” **দ্রষ্টব্য :** সহিহ মুসলিম, হা. ১৯১, ইমান অধ্যায়, অধ্যায় নং : ১, পরিচ্ছেদ : ৮৪। আল্লাহ আমাদেরকে ওই সৌভাগ্যবান বান্দাদের অন্তর্গত করুন, যারা তাঁকে দেখবে এবং তিনিও তাদের প্রতি দয়া করবেন, হাস্যরত অবস্থায় প্রকাশিত হবেন তাদের কাছে। আমিন। **টীকা সমাপ্ত।**

আহলুস সুন্নাহ উম্মতের ফের্কাগুলোর মাঝে মধ্যপন্থি দল, যেমন সকল উম্মতের মাঝে এই উম্মত মধ্যপন্থি

(أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الأمم)

মূলপাঠ :

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ. فَإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ - أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ - يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. بَلْ هُمُ الوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ، كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الوَسَطُ فِي الأُمَمِ. فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ، وَبَيْنَ أَهْلِ التَّمْثِيلِ المُشَبِّهَةِ. وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ: بَيْنَ القَدَرِيَّةِ وَالجَبْرِيَّةِ. وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ: بَيْنَ المُرْجِئَةِ، وَبَيْنَ الوَعِيدِيَّةِ - مِنَ القَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ـ. وَفِي بَابِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ: بَيْنَ الحَرُورِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ. وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَ الرَّوَافِضِ، وَبَيْنَ الخَوَارِجِ.

এ জাতীয় আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেসব হাদিসে আল্লাহপ্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত দল

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত যেমনভাবে আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় কিতাবে প্রদত্ত সংবাদের প্রতি ইমান রাখে, তেমনিভাবে এসব (প্রমাণিত) হাদিসের প্রতিও ইমান রাখে। কোনোরূপ তাহরিফ (অর্থ বা শব্দগত বিকৃতি), তাতিল (অস্বীকার, অপব্যাখ্যা, বা অর্থ-অস্বীকৃতি) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন বর্ণনা) ও তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে। বরং তারা এই উম্মতের ফের্কাগুলোর মাঝে মধ্যপন্থি দল, যেমন সকল উম্মতের মাঝে এই উম্মত মধ্যপন্থি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত মহান আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে তাতিলকারী জাহমিয়া সম্প্রদায় এবং তামসিলকারী মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। আল্লাহর কর্মাবলির ক্ষেত্রে জাবরিয়া সম্প্রদায় এবং কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। আল্লাহর হুঁশিয়ারির ক্ষেত্রে মুরজিয়া সম্প্রদায় এবং *কাদারিয়া ফের্কা ও অন্যান্য দলের 'ওয়ায়িদিয়্যা (অর্থাৎ মুতাজিলা ও খারেজি)'* সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। দিন ও ইমানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে তারা হারুরিয়্যা-মুতাজিলা ফের্কাদ্বয় এবং মুরজিয়া-জাহমিয়া ফের্কাদ্বয়ের মাঝে মধ্যপন্থি। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ক্ষেত্রে রাফিদি শিয়া সম্প্রদায় ও খারেজি সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই উম্মত সমুদয় উম্মতের মাঝে মধ্যপন্থি। দলিল— মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾.

“এভাবে আমি তোমাদেরকে করেছি মধ্যপন্থি উম্মত।”[318]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾.

“তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।”[319]

ইবাদতের ক্ষেত্রে এই উম্মত মধ্যপন্থি হওয়ার দৃষ্টান্ত : আল্লাহ এই উম্মতের ওপর থেকে এমনসব কষ্টকর ও জটিল বিষয় উঠিয়ে নিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর বলবৎ ছিল। এই উম্মত পানি না পেলে তায়াম্মুম করে যেকোনো (পবিত্র) জায়গায় নামাজ পড়ে নেয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য উম্মত পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়ে না এবং নির্দিষ্ট (ইবাদতের) জায়গা ব্যতীত নামাজ পড়ে না।

ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এই উম্মত মধ্যপন্থি হওয়ার দৃষ্টান্ত : ইহুদিদের জন্য হত্যার বদলে হত্যার বিধান ফরজ ছিল, আর খ্রিষ্টানদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে এই উম্মতকে এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে— তারা চয়ন করতে পারে হত্যার বদলে হত্যা, কিংবা করতে পারে বিলকুল ক্ষমা, কিংবা নিতে পারে রক্তপণ।

---

[318] সুরা বাকারা : ১৪৩।

[319] সুরা আলে ইমরান : ১১০।

এই উম্মতের রয়েছে তিয়াত্তরটি ফের্কা। এসব ফের্কার মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হবে তারাই, যারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি ছাড়া সবগুলো ফের্কাগুলো জাহান্নামে যাবে। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً، قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : من كان على مثل مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

"ইহুদিরা একাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে। অচিরেই আমার উম্মত তিয়াত্তর ফের্কায় বিভক্ত হবে। তারমধ্যে কেবল একটি ছাড়া সবগুলো হবে জাহান্নামী। বলা হলো, 'হে আল্লাহর রসুল, কোন দলটি (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত হবে?' তিনি বললেন, 'যারা আমার ও সাহাবিদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তারাই হবে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)'।"[320]

পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ উম্মতের ফের্কাগুলোর মাঝে মধ্যপন্থি দল। যথা :

এক. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি : আহলুস সুন্নাহ মহান আল্লাহর নাম ও গুণরাজির ক্ষেত্রে *তাতিলকারী* (অস্বীকার, অপব্যাখ্যা,

[320] কাছাকাছি শব্দগুচ্ছে হাদিসটি দেখুন : ইবনু মাজাহ, হা. ৩৯৯২; আবু দাউদ, হা. ৪৫৯৬; তিরমিজি, হা. ২৬৪১-২৬৪১; সনদ : হাসান।

অর্থ-অস্বীকৃতিকারী) সম্প্রদায় এবং *সাদৃশ্যদানকারী মুশাব্বিহা* সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। কেননা তাতিলকারী মুয়াত্তিলা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার (কিংবা অপব্যাখ্যা ও অর্থ-অস্বীকার) করে। আর মুশাব্বিহা সম্প্রদায় সাদৃশ্যযোগে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ সাদৃশ্য না দিয়ে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করে থাকে।

দুই. ভাগ্য ও ফয়সালা : লেখক (ইবনু তাইমিয়া) এ বিষয়টিকে *'আল্লাহর কর্মাবলি'* হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। আহলুস সুন্নাহ তাকদির তথা ভাগ্যের ক্ষেত্রে *জাবারিয়া* ও *কাদারিয়া* সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। কেননা জাবারিয়া সম্প্রদায় বান্দার কার্যাবলিতে আল্লাহর ফয়সালা সাব্যস্ত করে বলে থাকে, *'বান্দা তার কাজে বাধ্য, তার স্বাধীন কর্মক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি নেই।'* অপরদিকে কাদারিয়া সম্প্রদায় বান্দার কার্যাবলিতে আল্লাহর ফয়সালা সাব্যস্ত করে বলে থাকে, *'বান্দা নিজের কাজে পূর্ণ ক্ষমতাধর ও বিলকুল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, তার কাজ আল্লাহর ফয়সালার সাথে যুক্ত নয়।'* পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ বান্দার কার্যাবলিতে আল্লাহর ফয়সালা সাব্যস্ত করে বলে, *'কাজ করার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি বান্দার আছে, যেই ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে আল্লাহ বান্দার মাঝে দিয়েছেন। আর উক্ত ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ফয়সালার*

সাথে সম্পৃক্ত (আল্লাহ চাইলে বান্দা ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারবে, নচেৎ পারবে না, আবার সে বাধ্যও নয়)।'

তিন. শাস্তির হুঁশিয়ারি : আহলুস সুন্নাহ এক্ষেত্রে *ওয়ায়িদিয়্যা* (*মুতাজিলা ও খারেজি*) সম্প্রদায় এবং *মুরজিয়া* সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। কেননা ওয়ায়িদিয়্যা সম্প্রদায় বলে, '*(বড়ো শির্ক-কুফর করেনি এমন) কবিরা গুনাহগার জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।'* আর মুরজিয়া সম্প্রদায় বলে, '*সে জাহান্নামে যাবে না। আর জাহান্নামে যাওয়ার হকদারও সে নয়।'* পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ বলে, '*সে জাহান্নামে যাওয়ার হকদার। তবে জাহান্নামে গেলে সে চিরস্থায়ী হবে না।'*

চার. ইমান ও দিনের পরিচয় : আহলুস সুন্নাহ এক্ষেত্রে *মুরজিয়া* সম্প্রদায় এবং *মুতাজিলা* ও *হারুরিয়া* (*খারেজি*) সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। কেননা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কবিরা গুনাহগারকে '*পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন*' বলে। আর মুতাজিলা ও হারুরিয়া সম্প্রদায় কবিরা গুনাহগারকে '*মুমিন নয়*' হিসেবে অভিহিত করে। এক্ষেত্রে মুতাজিলারা বলে, '*সে মুমিনও নয়, কাফিরও নয়, বরং দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভুক্ত।'* আর হারুরিয়া খারেজিরা বলে, '*সে কাফির।'* পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ বলে থাকে, '*কবিরা গুনাহগার*

ত্রুটিপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন।' কিংবা বলে, *'সে তার ইমানের কারণে মুমিন, আর কবিরা গুনাহর কারণে ফাসিক।'*

পাঁচ. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিবর্গ : আহলুস সুন্নাহ এক্ষেত্রে *রাফিদি শিয়া* সম্প্রদায় এবং *খারেজি* সম্প্রদায়ের মাঝে মধ্যপন্থি। রাফিদি শিয়ারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করে এবং তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদের প্রকৃত মর্যাদাগত স্তর থেকে ওপরের স্তরে তুলে দেয়। আর খারেজিরা সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁদেরকে গালি দেয়। আহলুস সুন্নাহ সকল সাহাবিকে ভালোবাসে এবং কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি না করে তাঁদেরকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে।

আলোচিত মৌলিক বিষয়গুলোতে লেখক উল্লিখিত বিদাতি ফের্কাগুলোর পরিচয়

(التعريف ببعض الفرق البدعية)

লেখক (শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া) বিদাতিদের বেশকিছু দলের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা :

এক. জাহমিয়া :

এরা জাহম বিন সাফওয়ানের অনুসারী। যেই জাহম বিন সাফওয়ান *তাতিলের (সিফাত অস্বীকারের)* আকিদা নিয়েছিল জাদ বিন দিরহামের কাছ থেকে। ১২৮ হিজরিতে খোরাসান প্রদেশে তাকে হত্যা করা হয়।

আল্লাহর গুণরাজির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হচ্ছে— আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা। এদের মধ্যকার চরমপন্থিরা গুণাবলির পাশাপাশি নাম পর্যন্ত অস্বীকার করে। এজন্য এদেরকে মুয়াত্তিলা বলা হয়।

বান্দার কর্মাবলির ক্ষেত্রে এদের মতাদর্শ— বান্দা তার কাজে বাধ্য, তার স্বাধীন কর্মক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি নেই। এজন্য এদেরকে জাবারিয়াও বলা হয়।

শাস্তির হুঁশিয়ারি এবং দিন ও ইমানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এদের মতাদর্শ— কবিরা গুনাহগার পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন, সে কখনোই জাহান্নামে যাবে না। এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। এদের মধ্যে জমায়েত হয়েছে তিনটি *'জিম'* হরফ— জাহমিয়া মতাদর্শ, জাবরিয়া মতাদর্শ, আর মুরজিয়া মতাদর্শ (تجهمٌ وجبرٌ وإرجاءٌ)।

দুই. মুতাজিলা :

এরা ওয়াসিল বিন আতার অনুসারী। যেই *ওয়াসিল বিন আতা* হাসান বাসরির (মতো মহান তাবেয়ির) মজলিস ত্যাগ করেছিল, যখন হাসান বাসরি সাব্যস্ত করেছিলেন, কবিরা গুনাহগার ত্রুটিপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন। তখন ওয়াসিল তাঁর মজলিস ত্যাগ করে সাব্যস্ত করতে থাকে, কবিরা গুনাহগার দুটো স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর গুণরাজির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হচ্ছে— জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতো আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা।

বান্দার কর্মাবলির ক্ষেত্রে এদের মতাদর্শ— বান্দা তার কর্মে পুরোপুরি স্বাধীন। আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও ফয়সালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বান্দা পরিপূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কর্ম সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে এরা জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীত। এজন্য এদেরকে *'তাকদির অস্বীকারকারী কাদারিয়া'* বলা হয়।

শাস্তির হুঁশিয়ারির ক্ষেত্রে এদের মতাদর্শ— কবিরা গুনাহগার হবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী। এক্ষেত্রে এরা জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীত, যারা কিনা মনে করে, কবিরা গুনাহগার কখনো জাহান্নামে প্রবেশই করবে না। এজন্য এদেরকে *'ওয়ায়িদিয়্যা'* বলা হয়।

আর দিন ও ইমানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এদের মতাদর্শ— কবিরা গুনাহগার মুমিনও নয়, কাফিরও নয়, বরং দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে তারা জাহমিয়াদের বিপরীত, যেই জাহমিয়ারা মনে করে, কবিরা গুনাহগার পূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন। এজন্য তাদেরকে *'দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের আদর্শধারী'* বলা হয়।

তিন. খারেজি সম্প্রদায় :

মুসলিমদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে এদেরকে *খারেজি* বলা হয়। ইরাকের অন্তর্গত কুফার নিকটবর্তী *'হারুরা'* নামক জায়গার প্রতি সম্পৃক্ত করে তাদেরকে হারুরিয়া বলেও অভিহিত করা হয়। কারণ তৎকালীন খারেজিরা এ জায়গায় আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। বাহ্যিকভাবে তারা মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধার্মিক। এমনকি তাদের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন,

«يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"তোমরা তাদের নামাজের তুলনায় নিজেদের নামাজ ও রোজা নগণ্য বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন এদের গলা অতিক্রম করে না। এরা দিন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তির শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করে ফেলবে। কেননা এদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কেয়ামতের দিনে রয়েছে প্রতিদান।"[321]

শাস্তির হুঁশিয়ারি বিষয়ে এদের মতাদর্শ হচ্ছে— কবিরা গুনাহগার জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, কবিরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফির, যার জান ও মাল হরণ করা হালাল। এর ভিত্তিতেই শাসকরা যখন পাপাচারিতে লিপ্ত হয়, তখন তারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করে।

চার. রাফিদি শিয়া গোষ্ঠী :

এদেরকে বলা হয় *শিয়া* গোষ্ঠী, যারা কিনা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়

[321] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬১০, ৩৬১১, ৬৯৩০; সহিহ মুসলিম, হা. ১০৬৬।

এবং সকল সাহাবির ওপরে আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। এদের কেউ কেউ আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ আবার আলিকে নিজেদের রবও গণ্য করে। নবি পরিবারের অন্যায়-পক্ষাবলম্বন করা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এদেরকে *শিয়া* বলা হয়ে থাকে (سموا شيعة لتشيعهم لآل البيت)। এদেরকে *রাফিদি*-ও বলা হয় (سموا روافض)। কেননা এরা হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পৌত্র যাইদ বিন আলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (رَفَضُوا), যখন তারা তাঁকে আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, আর তিনি তাঁদের দুজনের প্রশংসা করেছিলেন। এবং বলেছিলেন, *‘তাঁরা দুজন আমার (ঊর্ধ্বতন) নানার মন্ত্রী ছিলেন।’* অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্ত্রী। এ শুনে তারা তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।[322]

---

[322] **অনুবাদকের টীকা : আশারিয়া ও মাতুরিদিয়া সম্প্রদায় :** প্রয়োজনীয় বিবেচনায় আমরা বর্তমান বিশ্বের দুটো বড়ো ফের্কা আশারিয়া সম্প্রদায় এবং মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচিতি উল্লেখ করছি।

আশারিয়া সম্প্রদায় মূলত দর্শনচর্চাকারী একটি ফের্কা, যারা নিজেদেরকে ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরির দিকে সম্পৃক্ত করে। যেই ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরি অনেক বড়ো বড়ো মাসআলায় আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শে ফিরে এসেছিলেন, যা তাঁর লেখা কিতাব থেকে জানা যায়।

আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে আশারিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ— স্রেফ সাতটি সিফাতকে আংশিক স্বীকার করা, আর বাকি সিফাতগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া কিংবা গুণাবলির অর্থ অস্বীকার করা। আল্লাহর গুণাবলি স্বীকার না করার কারণে এদেরকে

জাহমিয়া বলেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু এরা পূর্বে উল্লিখিত বড়ো জাহমিয়া সম্প্রদায়ের কাতারভুক্ত নয়। সিফাতের বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা তথা তাবিলের খণ্ডন করা হবে কীভাবে, তা ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনু উসাইমিন বারবার উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে আশারিয়া সম্প্রদায়ের যারা তাবিলের দিকে না যেয়ে তাফবিদ তথা অর্থ-অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদেরকে খণ্ডন করার বিষয়ে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করছি। তাদের এই পন্থাটি আগে বুঝতে হবে। এরা বলে, *‘আমরা স্বীকার করি যে আল্লাহ ইস্তিওয়া (আরোহণ) করেছেন। এও স্বীকার করি যে, এর অর্থ আছে, যা প্রকাশ্য অর্থ নয়। কিন্তু ইস্তিওয়ার প্রকৃত অর্থ যে কী, তা আমরা জানি না। এর মানে কেবল আল্লাহই জানেন।’* এভাবে আল্লাহর অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রেও একই কথা তারা বলে থাকে, যেসব গুণ তারা প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী সাব্যস্ত করে না। আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এদের এই নিন্দনীয় বিদাতি মতাদর্শের খণ্ডন করব। যথা :

১. তাদের মতাদর্শ সরাসরি কুরআনের অসংখ্য আয়াত বিরোধী। কারণ কুরআন সুস্পষ্ট নির্দেশিকা, যা বোঝার জন্য সহজ করা হয়েছে এবং তা বোঝার ও অনুধাবন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুসলিম জাতিকে। **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ১২ (সুরা ইউসুফ) : ১; ১৬ (সুরা নাহল) : ৮৯; ৩ (সুরা আলে ইমরান) : ১৩৮; ৩৮ (সুরা সাদ) : ২৯; ৫৪ (সুরা কামার) : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০; ২৩ (সুরা মুমিনুন) : ৬৮; ৪৭ (সুরা মুহাম্মাদ) : ১৬। আর অর্থহীন কথা বোঝার আদেশ দেওয়া মহান আল্লাহর প্রজ্ঞাবিরোধী।

২. আল্লাহর গুণাবলির অর্থ যে উম্মত জানে, সে বিষয়ে সাহাবিদের ইজমা (মতৈক্য) হয়ে গেছে। এদের মতাদর্শ সরাসরি সাহাবিগণের ইজমা-পরিপন্থি।

৩. এদের মতাদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ কুরআনের ব্যাপারে জাহেল (অজ্ঞ) সাব্যস্ত হয়ে যান। কেননা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বরং অধিকাংশ আয়াতে আল্লাহর গুণাবলি উল্লিখিত হয়েছে। এদের দাবি অনুযায়ী এগুলোর অর্থ নবি ও তাঁর সাহাবিগণ জানেন না! নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক।

ইমানের ক্ষেত্রে এদের আকিদা— মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা। অর্থাৎ আমল ইমানের অন্তর্গত নয়। বরং এদের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মুখে স্বীকৃতি দেওয়াও ইমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। পাশাপাশি ইমান কমেও না, আবার বাড়েও না। এদের আকিদা অনুযায়ী একবার ইমান আনার পরে কারও আমল যত খারাপই হোক না কেন, সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন থাকবে। কারণ আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটে না। এজন্য এদেরকে *মুরজিয়া* বলেও অভিহিত করা হয়।

তাকদিরের ক্ষেত্রে আশারিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা— *জাবরিয়া* সম্প্রদায়ের আকিদা। এরা হলো *ছোটো জাবারিয়া।* কারণ এদের মতে বান্দা বাহ্যিকভাবে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন নিজ কর্মে স্বাধীন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রত্যেক বান্দাই স্বীয় কাজে বাধ্য।

আর মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ও দর্শনচর্চাকারী একটি ফের্কা, যারা নিজেদেরকে আবু মানসুর আল-মাতুরিদির দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে।

আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ— স্রেফ আটটি সিফাতকে আংশিক স্বীকার করা, আর বাকি সিফাতগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া কিংবা গুণাবলির অর্থ অস্বীকার করা। আল্লাহর গুণাবলি স্বীকার না করার কারণে এদেরকে *জাহমিয়া* বলেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু এরা পূর্বে উল্লিখিত *বড়ো জাহমিয়া সম্প্রদায়ের* কাতারভুক্ত নয়। তাবিল তথা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া এবং তাফবিদ তথা অর্থ-অস্বীকৃতি করার খণ্ডন ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমানের ক্ষেত্রে এদের আকিদা *আশারিয়া* সম্প্রদায়ের মতোই। অর্থাৎ *মুরজিয়া* ফের্কার আকিদা লালন করে এরা। উল্লেখ্য যে, সাধারণত অধিকাংশ *মাতুরিদি* ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের অনুসারী হয়ে থাকে। অন্যান্য মাজহাবের অনুসারীদের মাঝে *মাতুরিদি* পাওয়া যায় না বললেই চলে। উপমহাদেশের হানাফিদের বড়ো দুটো ফের্কা *দেওবন্দি* ও *বেরলভি* সম্প্রদায় মূলত *মাতুরিদি* ফের্কার দিকেই নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে। এরা নিজেদেরকে *মাতুরিদি* হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে; তবে নিজেদেরকে *দেওবন্দি* বা *বেরলভি* দাবি করে কেউ কেউ ভিন্ন ধারার আকিদাও পোষণ করতে পারে, কিন্তু সেটা উক্ত ফের্কাদ্বয়ের অফিসিয়াল পজিশন নয়। আল্লাহর কাছে এদের ভ্রষ্টতা থেকে পানা চাই। **বিস্তারিত জানতে এই দুটো কিতাব পড়তে পারেন :** আল্লামা শামসুদ্দিন আল-আফগানি বিরচিত *আল-মাতুরিদিয়্যা ওয়া মাওকিফুহুম মিনাল আসমা ওয়াস সিফাত* এবং শাইখ খালিদ বিন আলি আল-গামিদি বিরচিত *নাকদু আকায়িদিল আশায়িরা ওয়াল মাতুরিদিয়া।* **অনুবাদকের সংযোজিত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত।**

আল্লাহ সবকিছুর ওপরে আছেন এবং তাঁর ওপরে থাকা বান্দাদের সাথে থাকার বিপরীত নয়

(الله علي على كل شيء وعلوه لا ينافي معيته)

মূলপাঠ :

فَصْلٌ: وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ: الإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ - مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ - وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾. وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾: أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الخَلْقَ؛ بَلِ القَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ المُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ العَرْشِ رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ إِلَيْهِمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الرُّبُوبِيَّةِ. وَكُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ - مِنْ

أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا ـ: حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكَاذِبَةِ.

[مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿فِي السَّمَاءِ﴾، أَنَّ السَّمَاءَ تُظِلُّهُ أَوْ تُقِلُّهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَانِ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ؛ إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ.]

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ: الإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ». وَمَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ.

পরিচ্ছেদ : আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত হিসেবে যে বিষয়টি (আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ইমানের বিষয়) আলোচনা করেছি, তার অন্তর্ভুক্ত হবে— আল্লাহ তদীয় কিতাবে যা জানিয়েছেন, তাঁর রসুল থেকে যা মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনায়) সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে এবং উম্মতের পূর্বসূরি বিদ্বানগণ যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন তার প্রতি ইমান আনা। আর সে বিষয়টি হচ্ছে— মহান আল্লাহ তাঁর আকাশরাজির ঊর্ধ্বে স্বীয় আরশের ওপরে রয়েছেন, নিজ সৃষ্টিরাজির ওপরে সমুচ্চ রয়েছেন এবং (ওপরে থেকেই) সৃষ্টিকুল যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেও রয়েছেন। সৃষ্টিকুল যা করে, সে বিষয়ে তিনি জানেন। যেমন তিনি *'ওপরে থাকা'* এবং *'সৃষ্টির সাথে থাকা'* — উভয় বিষয়কে তাঁর এ

বাণীতে একত্রে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তিনি ছয় দিনে আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এরপর আরশে আরোহণ করেছেন। তিনি জানেন যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।"[323]

'তিনি তোমাদের সাথে আছেন' আয়াতাংশটির অর্থ এটা নয় যে, তিনি সৃষ্টিকুলের সাথে মিশে রয়েছেন। আরবি ভাষা (উক্ত আয়াতের) এ অর্থকে আবশ্যক করে না। বরং আল্লাহর একটি অন্যতম নিদর্শন চাঁদ, যা কিনা আল্লাহর সবচেয়ে ছোটো সৃষ্টিগুলোর একটি, তা আকাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মুসাফির ও অমুসাফির ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন চাঁদ তার সাথেই থাকে। মহান আল্লাহ তাঁর আরশের ওপর রয়েছেন, (সেখানে থেকেই) স্বীয় সৃষ্টিরাজির বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সৃষ্টিকুলের ওপর কর্তৃত্ববিস্তারকারী ও তাদের ব্যাপারে সদা অবহিত রয়েছেন প্রভৃতি বিষয়— আল্লাহর প্রভুত্বের যেসব অর্থ রয়েছে, সেসবেরই অন্তর্গত। আল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ তিনি আরশের ওপরে রয়েছেন এবং আমাদের সাথেও আছেন, এগুলোর সবই কথাগুলোর প্রকৃত বা বাস্তবিক অর্থেই সত্য কথা। এ কথার কোনো বিকৃতি করার প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ধারণা থেকে উক্ত কথাকে সংরক্ষণ করতে হবে।

"যেমন এরূপ ধারণা করা যে, *'আকাশে আছেন'* কথাটির প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে— আকাশ তাঁকে বহন করছে কিংবা ছায়া দিচ্ছে। জ্ঞানসম্পন্ন মুমিনদের মতৈক্যের ভিত্তিতে এ কথা বাতিল। কেননা

---

[323] সুরা হাদিদ : ৪।

আল্লাহর কুরসি (দু পা রাখার স্থান) আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি আকাশরাজি ও জমিনকে আটকে রেখেছেন, যেন আকাশ-জমিন হেলে না যায়, আকাশকে আটকে রেখেছেন, যেন তা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে আকাশের ওপর পতিত না হয়। তাঁর নিদর্শনাবলির অন্তর্গত হলো— আকাশ এবং পৃথিবী বহাল ও কায়েম থাকে তাঁরই নির্দেশে।”[324]

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টিকুলের নিকটবর্তী, এ কথার প্রতি ইমান রাখাও উক্ত বিষয়ের অন্তর্গত। যেমন আল্লাহ বলেছেন, “আর যখন আমার ইবাদতকারী বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে, তখনই আমি তার ডাকে সাড়া দিই; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ইমান রাখে, তাহলেই তারা সুপথপ্রাপ্ত হতে পারবে।”[325]

---

[324] উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া অংশটুকু *‘ওয়াসিতিয়্যার’* কিছু কিছু নুসখায় অতিরিক্ত এসেছে, যা অনেক নুসখায় উল্লিখিত হয়নি। **দ্রষ্টব্য :** আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা***, তাহকিক : দাগাশ বিন শাবিব আল-আজমি (কুয়েত : মাকতাবাতু আহলিল আসার, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৯২; আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা***, তাহকিক : আলাবি আব্দুল কাদির সাক্কাফ (সৌদি আরব : মুআসসাসাতুদ দুরারিস সানিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.), পৃ. ১১৪; ইবনু উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, খ. ২, পৃ. ৮৫-৮৮; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পৃ. ১৩৫-১৩৬; সালিহ আস-সিন্ধি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পৃ. ৬৫০; সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা***, খ. ২, পৃ. ১৫০-১৫২; আব্দুল আজিজ আন-নাসির আর-রাশিদ, ***আত-তাম্বিহাতুস সানিয়্যা আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুর রশিদ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০১-২০২। – ***অনুবাদক।***

[325] সুরা বাকারা : ১৮৬।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় তোমরা যাকে ডাকছ, তিনি তোমাদের সওয়ারি উটের গর্দানের চেয়েও অতি নিকটবর্তী।”[326] কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহর যে নিকটবর্তিতা ও সাথে থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা আল্লাহর ঊর্ধ্বতা ও সমুচ্চতার সাথে পরিপন্থি নয়। কেননা মহান আল্লাহর সমুদয় সিফাতের ক্ষেত্রে তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি নিকটবর্তী থেকেই সর্বোচ্চ, আবার সুউচ্চে থেকেই সন্নিকটস্থ। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[327]

---

[326] সহিহুল বুখারি, হা. ২৯৯২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭০৪।

[327] এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা সত্ত্বেও শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় পুনরায় তা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকার ইতোমধ্যে আলোচনা করে ফেলেছেন। এজন্য তিনি এখানে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেননি। – ***অনুবাদক।***

আল্লাহর কথা— কুরআনের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকিদা

(عقيدة أهل السنة في كلام الله القرآن)

মূলপাঠ :

وَمِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ: الإِيمَانُ بِأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مُنَزَّلٌ، غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا القُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً، لَا كَلَامُ غَيْرِهِ. وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ القَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ، أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ؛ بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي المَصَاحِفِ، لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللَّهِ حَقِيقَةً؛ فَإِنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا. [وَهُوَ كَلامُ اللهِ؛ حُرُوفُهُ، ومَعَانِيهِ؛ لَيْسَ كَلامُ اللهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي، وَلاَ الْمَعَانِيَ دُونَ الْحُرُوفِ.]

আল্লাহ ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত হলো— এ বিষয়ের প্রতি ইমান রাখা যে, কুরআন আল্লাহর কথা, নাজিলকৃত অসৃষ্ট বাণী, যা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে (কেয়ামতের প্রাক্কালে)। মহান আল্লাহ বাস্তবিক অর্থেই কুরআন বলেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যেই কুরআন তিনি অবতীর্ণ করেছেন, তা বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহর কথা, অন্যের কথা নয়। *'কুরআন আল্লাহর কথার হুবহু বিবরণ'* কিংবা *'কুরআন আল্লাহর কথার ভাব'*— এ জাতীয় কথা বলা

না-জায়েজ। বরং মানুষ যখন কুরআন পড়ে, কিংবা মুসহাফে কুরআন লিখে, তখন এর দরুন কুরআন *'বাস্তবিক অর্থে আল্লাহর কথা হওয়ার গণ্ডি'* থেকে বের হয়ে যায় না।

কেননা কথাকে বাস্তবিক বা প্রকৃত অর্থে তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়, যিনি কথাটি সর্বপ্রথম বলেছেন। তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হয় না, যিনি কথাটি বার্তাবাহক প্রচারক হিসেবে বলেছেন। "সুতরাং কুরআন আল্লাহর কথা; এর বর্ণ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর কথা। অর্থ ছাড়া স্রেফ বর্ণগুলো আল্লাহর কথা নয়, আবার বর্ণ ছাড়া স্রেফ অর্থগুলোও আল্লাহর কথা নয়।" **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[328]

---

[328] উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া অংশটুকু *'ওয়াসিতিয়্যার'* কিছু কিছু নুসখায় অতিরিক্ত এসেছে, যা অনেক নুসখায় উল্লিখিত হয়নি। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা***, তাহকিক : দাগাশ আল-আজমি, পৃ. ৯৫; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা***, তাহকিক : আলাবি সাক্কাফ, পৃ. ১১৬। আর এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার ইতোমধ্যে আলোচনা করেছেন, বিধায় তিনি এখানে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেননি। – ***অনুবাদক।***

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকিদা

(عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية العباد لربهم)

মূলপাঠ :

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ - مِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ -: الإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ؛ كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ، كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর কিতাবসমগ্র ও রসুলগণের প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত হিসেবে যা আলোচনা করেছি, তারই অন্তর্ভুক্ত হবে— এ বিষয়ের প্রতি ইমান রাখা যে, কেয়ামতের দিন মুমিনগণ নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে দেখবে, যেমন তারা মেঘশূন্য পরিষ্কার আবহাওয়ায় সূর্যকে দেখে থাকে এবং পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখে থাকে। আল্লাহকে দেখতে গিয়ে তারা ভীড় কিংবা জুলুমের সম্মুখীন হবে না। তারা কেয়ামতের প্রান্তরে অবস্থানরত অবস্থায় মহান আল্লাহকে দেখবে। অনন্তর জান্নাতে প্রবেশের পর

তারা আল্লাহকে (পুনরায়) দেখবে। যেমনভাবে আল্লাহ তায়ালা চান, তারা সেভাবেই দেখবে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[329]

---

[329] এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার ইতোমধ্যে আলোচনা করেছেন, বিধায় তিনি এখানে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেননি। – ***অনুবাদক।***

শেষ দিবস এবং কবরের জিজ্ঞাসাবাদ

(اليوم الآخر وفتنة القبر)

মূলপাঠ :

فَصْلٌ: وَمِنَ الإِيمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ: الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ؛ فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ القَبْرِ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيمِهِ. فَأَمَّا الفِتْنَةُ: فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ؛ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: اللَّهُ رَبِّي، وَالإِسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي. وَأَمَّا المُرْتَابُ: فَيَقُولُ: آهْ آهْ، لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَّةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

পরিচ্ছেদ : মৃত্যুর পরে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সংবাদ দিয়েছেন, সেসব সংবাদের প্রতিটির প্রতি ইমান রাখা শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত। আহলুস সুন্নাহ কবরের ফিতনার (জিজ্ঞাসাবাদের) প্রতি এবং কবরের সুখ ও শাস্তির প্রতি ইমান রাখে। কবরের ফিতনার ব্যাপারটি হলো, মানুষকে তাদের কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে। মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে? দুনিয়াবি ও পরকালীন জীবনে আল্লাহ ইমানদার মানুষদের সুদৃঢ় বাক্যের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। ফলে

মুমিন বান্দা বলবে, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবি।

পক্ষান্তরে সংশয়বাদী (কাফির, মুনাফেক) ব্যক্তি বলবে, হায় হায়! আমি কিছু জানি না। আমি লোকদেরকে কিছু কথা বলতে শুনে আমিও তা বলেছিলাম মাত্র (ইমান আমার অন্তরে প্রবেশ করেনি)! তখন তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে। ফলে সে এমন চিৎকার দেবে, যা মানুষ ছাড়া সবাই শুনতে পাবে। মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তাহলে বেহুঁশ হয়ে যেত। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

কেয়ামতের দিন হলো শেষ দিবস। **মৃত্যুর পরে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সংবাদ দিয়েছেন, সেসব সংবাদের প্রতিটির প্রতি ইমান রাখা শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনয়নের অন্তর্গত।** যেমন : কবরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং কবরের শান্তি-শাস্তি প্রভৃতি। শেস দিবসের প্রতি ইমান রাখা ওয়াজিব। দ্বীনের মধ্যে এর মর্যাদাগত অবস্থান— এটি ইমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম।

দুজন ফেরেশতা কর্তৃক মৃতব্যক্তিকে তার রব, দ্বীন ও নবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাই হলো কবরের ফিতনা। উক্ত জিজ্ঞাসাবাদের সময় আল্লাহ ইমানদার মানুষদের সুদৃঢ় বাক্যের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। ফলে মুমিন বান্দা বলবে, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমার নবি। পক্ষান্তরে সংশয়বাদী মুনাফেক কিংবা কাফির ব্যক্তি বলবে, হায় হায়! আমি কিছু জানি না। আমি লোকদেরকে কিছু কথা বলতে শুনে আমিও তা বলেছিলাম মাত্র (ইমান আমার অন্তরে প্রবেশ করেনি)!

এই ফিতনা সকল মৃতব্যক্তির জন্য ব্যাপক হবে। কেবল তারা এই ফিতনার আওতাভুক্ত হবে না, যারা শহিদ হয়েছে, কিংবা মারা গিয়েছে আল্লাহর রাস্তায় সীমান্তরক্ষী থাকা অবস্থায়। অনুরূপভাবে রসুলগণকেও জিজ্ঞেস করা হবে না। কেননা জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়নি—যেমন নাবালক—তাদেরকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিনা সে বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। কারও মতে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেহেতু এ সংক্রান্ত দলিলগুলো ব্যাপক। আবার কেউ কেউ বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। যেহেতু সে শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদকারী ফেরেশতাদ্বয়ের নাম মুনকার ও নাকির।[330] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

330 তিরমিজি, হা. ১০৭১, সনদ : হাসান।

কবরের শান্তি ও শাস্তির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য

(قول أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه)

মূলপাঠ :

ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الفِتْنَةِ: إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الكُبْرَى، فَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَى الأَجْسَادِ.

অনন্তর এই ফিতনার পরে হয় সুখ আসবে, আর নয়তো আজাব। বড়ো কেয়ামত সংঘটিত হওয়া অবধি যা অবিরাম চলতে থাকবে। এরপর (বড়ো কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর) রুহগুলোকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ হচ্ছে— কবরের সুখ ও শাস্তির ব্যাপারটি সুসাব্যস্ত। যেহেতু মহান আল্লাহ ফেরাউনের অনুসারীদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

“সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে প্রবিষ্ট করো কঠিনতম শাস্তিতে।”[331] আর মুমিনদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

“যারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ,’ এরপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাবর্গ। আর (ফেরেশতারা) বলে, ‘তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই জান্নাতের, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।”[332]

কাফির ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে যখন উত্তর দেবে, তখন তার কী পরিস্থিতি হবে, সে ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ».

---

[331] সুরা গাফির : ৪৬।

[332] সুরা ফুসসিলাত : ৩০।

“তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, সে মিথ্যা বলছে। সুতরাং ওর জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। আর ওর জন্য খুলে দাও জাহান্নামের দিকে একটি দরজা।” আর মুমিন ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে যখন উত্তর দেবে, তখন তার কী পরিস্থিতি হবে, সে ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

“তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, আমার বান্দা সত্য ও যথার্থ বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য খুলে দাও জান্নাতের দিকে একটি দরজা।”[333]

শাস্তি কিংবা সুখ যা-ই দেওয়া হোক না কেন, তা কেবল রূহ তথা আত্মাকেই দেওয়া হবে। তবে উক্ত শাস্তি বা সুখ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শরীরও কখনো কখনো যুক্ত হতে পারে। কাফিরদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান থাকবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের শাস্তি হবে তাদের পাপের মাত্রা অনুযায়ী। কবরের সুখশান্তি কেবল মুমিনদের

[333] আবু দাউদ, হা. ৪৭৫৩; সনদ : সহিহ।

জন্যই সুনির্দিষ্ট। দলিলের প্রকাশ্য বক্তব্য অনুযায়ী অনুমেয় হয়, কবরের সুখশান্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান থাকবে।

শরিয়তে সুসাব্যস্ত হয়েছে, মুমিনের কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে, আর কাফিরের কবরকে করা হবে সংকীর্ণ, অথচ কবর উন্মুক্ত করা দেখা যায়, স্বাভাবিক অবস্থাতেই রয়েছে কবর, এ বিষয়ক সংশয়ের জবাব :

দুই দিক থেকে এ বিষয়ের জবাব দেওয়া যায়। যথা :

এক. কিতাব ও সুন্নাহয় যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা সত্যায়ন করা এবং তার প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব। চাই আমাদের বিবেক ও ইন্দ্রীয় তা উপলব্ধি করতে পারুক, চাই না পারুক। কেননা বিবেক দিয়ে কখনোই শরিয়তের বিরোধিতা করা যায় না। বিশেষত ওই সকল বিষয়ে, যেসবের মাঝে বিবেকের কোনো স্থান নেই।

দুই. কবরের পরিস্থিতি পরকালের বিষয়াবলির অন্তর্গত। যেই পরকালের বিষয়াবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি এমনই যে, মানুষদের পরীক্ষা করার জন্য তিনি সেসব বিষয়কে তাদের বিবেক ও ইন্দ্রীয়ের আওতার অন্তরালে রাখবেন। আর ইহকালের পরিস্থিতি দিয়ে পরকালের পরিস্থিতিকে তুলনা করা চলবে না। কারণ ইহকাল ও পরকালের মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

কেয়ামত এবং কেয়ামতের দিন ঘটিতব্য ঘটনাপ্রবাহ

(القيامة وأحوالها)

মূলপাঠ :

وَتَقُومُ القِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ؛ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ العَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، وَيُلْجِمُهُمُ العَرَقُ. وَتُنْصَبُ المَوَازِينُ؛ فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ العِبَادِ، ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾.

وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ - وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ ـ؛ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾. وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الخَلْقَ، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ؛ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَأَمَّا الكُفَّارُ: فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ؛ فَإِنَّهُمْ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدَّدُ أَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَى، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَيُقَرَّرُونَ بِهَا، وَيُجْزَوْنَ بِهَا.

وَفِي عَرْصَةِ القِيَامَةِ: الحَوْضُ المَوْرُودُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.

وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالفَرَسِ الجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، فَإِنَّ الجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ: وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا: أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ. وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الجَنَّةِ: مُحَمَّدٌ ﷺ. وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنَ الأُمَمِ: أُمَّتُهُ ﷺ.

وَلَهُ ﷺ فِي القِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ: أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُولَى: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ المَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ - آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - الشَّفَاعَةَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ. وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ - وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ - يَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا. وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَبْقَى فِي الجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا،

فَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ. وَأَصْنَافُ مَا تَتَضَمَّنُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ - مِنَ الحِسَابِ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالآثَارَةِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورَةِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ؛ وَفِي العِلْمِ المَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ.

আর অবশ্যই কেয়ামত সংঘটিত হবে। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ তদীয় কিতাবে ও তাঁর রসুলের জবানে অবহিত করেছেন এবং মুসলিমগণও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছে। মানুষেরা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায় তাদের কবর থেকে দাঁড়াবে। সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে এবং মানুষের ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

এরপর মিজান (দাঁড়িপাল্লা) স্থাপন করা হবে। মিজান দিয়ে ওজন করা হবে বান্দাদের আমল। আল্লাহ বলেছেন, “সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা হবে জাহান্নামে স্থায়ী।”[334]

সেদিন রেজিস্টার (লিখিত বিবরণের বইপুস্তক) প্রকাশ করা হবে। এগুলো হলো আমলনামা। কেউ তার আমলনামা ডান হাতে নেবে, আবার কেউ তার আমলনামা বাম হাতে কিংবা নিজের পিঠের পেছন থেকে নেবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, “প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার কাঁধের সাথে যুক্ত করেছি এবং কেয়ামত দিবসে আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট।”[335]

---

[334] সুরা মুমিনুন : ১০২-১০৩।

[335] সুরা ইসরা : ১৩-১৪।

আল্লাহ সৃষ্টিকুলের হিসাব নেবেন। স্বীয় মুমিন বান্দার সাথে আল্লাহ একান্তে মিলিত হবেন এবং তার পাপের স্বীকৃতি নেবেন, যেভাবে কিতাব ও সুন্নাহয় বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে তাদের মতো হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে না, যাদের পাপ ও সওয়াব (পুণ্য) ওজন করা হয়। কারণ কাফিরদের কোনো সওয়াব নেই। কিন্তু তাদের আমল গণনা ও হিসাব করা হবে, তাদেরকে এসব পাপের আমল জানানো হবে এবং তাদের থেকে এগুলোর স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে (তাদেরকে স্বীকার করানো হবে)।

কেয়ামতের প্রান্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বরাদ্দ থাকবে সমাগমমুখর পানির হাওজ। যার পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্ট। হাওজের পানপাত্রগুলোর সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির সমান। হাওজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয়ই একমাসের পথ। যে ব্যক্তি একবার হাওজের পানি পান করবে, সে এরপর আর কখনোই পিপাসিত হবে না।

জাহান্নামের পৃষ্ঠের ওপর স্থাপিত থাকবে পুলসিরাত। এটা হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত সাঁকো। মানুষেরা নিজেদের আমল অনুযায়ী এর ওপর দিয়ে গমন করবে। কেউ গমন করবে চোখের পলকে, কেউ অতিক্রম করবে বিজলির গতিতে, কেউ গমন করবে বাতাসের গতিতে, কেউ অতিক্রান্ত হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ গমন করবে উষ্ট্রবাহনের গতিতে, কেউ পার হবে দৌড়ের গতিতে, কেউ অতিক্রম করবে হেঁটে হেঁটে, কেউবা পার হবে হামাগুড়ি দিয়ে। আবার কাউকে ছোঁ মেরে নিয়ে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে। কারণ এই সাঁকোর ওপর (একাধিক মাথাবিশিষ্ট) পেরেক থাকবে। পেরেকগুলো মানুষকে ছোঁ মারবে মানুষের আমল অনুযায়ী।

যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম করবে, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মানুষেরা পুলসিরাত পার হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত (ফুটওভার ব্রিজের পর্যায়ভুক্ত) *কানতারা* তথা উঁচু সেতুতে দাঁড় করানো হবে। এরপর একে অপরের নিকট থেকে কিসাস (অন্যায়ের বদলা) গ্রহণ করা হবে। অনন্তর তাদের পরিষ্কার ও নির্মল করা হলে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতের দরজা খুলতে বলবেন, তিনি হলেন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর সকল উম্মতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর উম্মত।

কেয়ামতের দিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ধার্য হবে তিনটি শাফায়াত।

প্রথম শাফায়াত : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের অধিবাসীদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন, যেন তাদের ফায়সালা সম্পন্ন করা হয়। আর এটা ঘটবে আদম, নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিমুস সালামের মতো নবিগণ উক্ত শাফায়াতের কার্যকে একে অপরের কাছে ফেরত পাঠানোর পরে। যার দরুন একটি পর্যায়ে শাফায়াতের বিষয়টি পৌঁছে যাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে।

দ্বিতীয় শাফায়াত : তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের হকদারদের জন্য শাফায়াত করবেন, যেন তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। এই শাফায়াত দুটো কেবল নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই খাস।

তৃতীয় শাফায়াত : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের (পাপী মুমিন) হকদারদের জন্য শাফায়াত করবেন। এ

শাফায়াতের অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন তিনি, সকল নবি, সিদ্দিক ও অন্যান্য বান্দাগণ। তিনি জাহান্নামের হকদারদের জন্য শাফায়াত করবেন, যেন তারা জাহান্নামে প্রবেশ না করে। আবার জাহান্নামে চলে গেছে এমন (পাপী মুমিন) ব্যক্তিদের জন্য শাফায়াত করবেন, যেন তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে পারে। আর শাফায়াত ছাড়াই স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে একদল লোককে বের করবেন। তথাপি জান্নাতে প্রবেশকারী পৃথিবীবাসী ছাড়াও জান্নাতে অতিরিক্ত একদল জান্নাতবাসী থাকবে। আল্লাহ জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

পরকালীন জীবন যেসব বিষয় ধারণ করে—যেমন হিসাব, সওয়াবপ্রাপ্তি, শাস্তি, জান্নাত, জাহান্নাম এবং এসবের বিশদ বিবরণ—তা উল্লিখিত হয়েছে আসমানী গ্রন্থাবলিতে, নবিদের নিকট থেকে বর্ণিত ইলমের অবশিষ্টাংশে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হিসেবে প্রাপ্ত ইলমে। আলোচ্য বিষয়ে সেসব বিবরণ যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত। যে ব্যক্তি উক্ত ইলম খোঁজ করবে, সে তা পেয়ে যাবে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

কেয়ামতের ছোটোবড়ো রয়েছে। ছোটো কেয়ামত সংঘটিত হয়। যেমন মৃত্যু। যে ব্যক্তিরই মৃত্যু হয়, তার কেয়ামত ঘটে যায়। আবার বড়ো কেয়ামতও রয়েছে। সেটাই এখানকার আলোচ্য বিষয়। কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর হিসাব ও প্রতিদানের জন্য মানুষের দণ্ডায়মান হওয়াই বড়ো কেয়ামত। মানুষরা কেয়ামতে দাঁড়িয়ে থাকবে

এবং সেদিন ন্যায় ও সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হবে বিধায় একে ‘কেয়ামত’ বলে অভিহিত করা হয়।

কেয়ামত যে হবে, তার দলিল— কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা (মতৈক্য)। কিতাবে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

“তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহান দিনে? যেদিন সমগ্র মানবজাতি দাঁড়াবে জগতসমূহের রবের সম্মুখে!”[336]

সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا».

“নিশ্চয় (কেয়ামতের দিন) তোমাদের সমবেত করা হবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন অবস্থায়।”[337]

ইজমা (মতৈক্য) : মুসলিম জাতি-সহ সমগ্র আসমানী ধর্মের অনুসারীরা একমত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন হবে। যে ব্যক্তি এই দিনকে অস্বীকার করবে কিংবা এতে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ

---

[336] সুরা মুতাফফিফিন : ৪-৬।

[337] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৩৪৯, ৩৪৪৭, ৪৬২৫, ৪৭৪০, ৬৫২৪, ৬৫২৫, ৬৫২৬, ৬৫২৭; সহিহ মুসলিম, হা. ২৮৫৯, ২৮৬০।

করবে, সে কাফির। কেয়ামতের বেশকিছু আলামত রয়েছে, এগুলোকে ‘আশরাত (চিহ্ন)’ বলা হয়। যেমন : দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় প্রভৃতি। কেয়ামতের এতসব আলামত ধার্য করা হয়েছে, কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দিন। এজন্য এই দিনের এসব ভূমিকা রাখা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন মানুষদের হাশর (সমবেত) করা হবে জুতোবিহীন নগ্নপদ, বস্ত্রহীন উদোম ও খতনাবিহীন অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾.

“যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে এর পুনরাবৃত্তি (পুনরায় সৃষ্টি) করব।”[338]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا».

“নিশ্চয় (কেয়ামতের দিন) তোমাদের সমবেত করা হবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন অবস্থায়।”[339]

---

[338] সুরা আম্বিয়া : ১০৪।

[339] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৩৪৯, ৩৪৪৭, ৪৬২৫, ৪৭৪০, ৬৫২৪, ৬৫২৫, ৬৫২৬, ৬৫২৭; সহিহ মুসলিম, হা. ২৮৫৯, ২৮৬০।

কেয়ামতের দিন ঘটিতব্য যেসব বিষয় লেখক উল্লেখ করেছেন

(الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة)

এক. সূর্য চলে আসবে মানুষের এক মাইল বা দুই মাইল পরিমাণ কাছে। ফলে মানুষ নিজেদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী ঘামতে থাকবে। কারও ঘাম পৌঁছবে দুই টাখনু পর্যন্ত, কারও ঘাম পৌঁছে যাবে মুখ পর্যন্ত, আবার কারও ঘাম পৌঁছবে মাঝামাঝি পর্যায়ে। মানুষদের মাঝে কেউ কেউ সূর্যতাপ থেকে বিলকুল নিরাপদে থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর (আরশের) ছায়াতলে ছায়া প্রদান করবেন, যেদিন সেই ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। যেমন আল্লাহর আনুগত্যে দিনাতিপাতকারী যুবক, মসজিদের সাথে লটকে থাকা অন্তরের অধিকারী মানুষ প্রমুখ।

দুই. দাঁড়িপাল্লা (المَوازِينُ جمعُ ميزانٍ) : দাঁড়িপাল্লায় বান্দাদের আমল ওজন করার জন্য মহান আল্লাহ তা স্থাপন করবেন। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা হবে জাহান্নামে স্থায়ী। দাঁড়িপাল্লা বাস্তবিক, তার দুটো পাল্লা রয়েছে। এ কথা

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিপরীত, যারা বলে, দাঁড়িপাল্লা মানে ন্যায়পরায়ণতা, এটা সত্যিকারের বাস্তবিক দাঁড়িপাল্লা নয়।

দাঁড়িপাল্লা কুরআনে বহুবচনের শব্দে এসেছে, আর সুন্নাহয় বহুবচন ও একবচনের শব্দরূপে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য কেউ বলেন, এটা মূলত একটিই দাঁড়িপাল্লা, ওজনকৃত বিষয়ের বিবেচনায় বহুবচনের শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কেউ বলেন, উম্মত কিংবা ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা অনেকগুলো হবে, সমষ্টির বিবেচনায় একে একবচনের শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. রেজিস্টার (লিখিত বিবরণের বইপুস্তক) প্রকাশ এবং সেসবের বণ্টন : রেজিস্টারগুলো হলো আমলনামা, যেগুলো ফেরেশতাবর্গ মানুষের কর্ম হিসেবে লিখেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.

“প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার কাঁধের সাথে যুক্ত করেছি এবং কেয়ামত দিবসে আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট।”[340]

---

[340] সুরা ইসরা : ১৩-১৪।

যে ডান হাতে নিজের আমলনামা নেবে, সে হচ্ছে মুমিন। আবার মানুষদের মাঝে কেউ কেউ বাম হাতে কিংবা নিজের পৃষ্ঠদেশের পেছন দিক থেকে আমলনামা নেবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾.

"তারপর যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে। তার হিসাব গৃহীত হবে সহজভাবে এবং সে তার স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে। আর যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার পৃষ্ঠের পেছনে। সে অচিরেই মৃত্যুকে আহ্বান করবে, আর প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।"[341]

অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ﴾.

"আর যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হতো আমার আমলনামা!"[342]

---

[341] সুরা ইনশিকাক : ৭-১২।

[342] সুরা হাক্কাহ : ২৫।

এ আয়াত আর পূর্ববর্তী আয়াতের মাঝে সমন্বয় করা হবে এভাবে যে, হয়তো মানুষদের ভিন্নভিন্নভাবে দেওয়া হবে। অন্যথায় যে বাম হাতে আমলনামা নেবে তার উক্ত হাতকে বিযুক্ত করে তার পৃষ্ঠের পেছনে করে দেওয়া হবে।

চার. হিসাব : এটি হচ্ছে সৃষ্টিকুলের কৃতকর্মের ব্যাপারে সৃষ্টিকুলের হিসাব। মুমিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর স্বরূপ হবে এমন— আল্লাহ মুমিন বান্দার সাথে একান্তে মিলিত হবেন (অর্থাৎ নির্জনতা অবলম্বন করবেন) এবং তার পাপের স্বীকৃতি নেবেন। এরপর বলবেন,

«سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ».

"আমি দুনিয়ায় তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজকে আমি তা মাফ করে দিচ্ছি।"[343]

পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তিকে তার পাপের আমল জানানো হবে এবং তার থেকে সেসবের স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে (তাকে স্বীকার করানো হবে)। এরপর (কাফিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদানকারী) সাক্ষীদের মাথার ওপর থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে, "এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান! জালিমদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অভিসম্পাত।"[344]

---

[343] সহিহুল বুখারি, হা. ২৪৪১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৬৮।

[344] সহিহুল বুখারি, হা. ২৪৪১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৬৮।

আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বান্দার হিসাব নেওয়া হবে নামাজের।[345] আর মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তপাতের।[346]

আবার কিছু মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এরা হবে এমন মানুষ, যারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক চায় না, শরীরে লোহার দাগ লাগিয়ে চায় না (দাগ লাগানো এক ধরনের প্রাচীন তথাকথিত চিকিৎসাপদ্ধতি), অশুভ লক্ষণ মানে না এবং ভরসা করে নিজেদের রবের প্রতি। সাহাবি উক্কাশা বিন মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের অন্যতম (যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবেন)।[347]

পাঁচ. কেয়ামতের প্রান্তরে সমাগমমুখর পানির হাওজ বরাদ্দ থাকবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তাঁর উম্মতের মুমিন ব্যক্তিবর্গ এই হাওজে আসবে। যে ব্যক্তি একবার হাওজের পানি পান করবে, সে এরপর আর কখনোই পিপাসিত হবে না। হাওজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয়ই হবে একমাসের পথ। হাওজের পানপাত্রগুলোর সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির সমান। আর এর পানি হবে দুধের

---

345 আবু দাউদ, হা. ৮৬৪; তিরমিজি, হা. ৪১৩; ইবনু মাজাহ, হা. ১৪২৫; নাসায়ি, হা. ৪৬৫; সনদ : সহিহ।

346 তিরমিজি, হা. ১৩৯৬, সনদ : সহিহ।

347 সহিহুল বুখারি, হা. ৬৫৪১; সহিহ মুসলিম, হা. ২২০।

চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও সুমিষ্ট, আর মিসকের সুরভির চেয়েও সৌরভময়।

প্রত্যেক নবির জন্যই হাওজ বরাদ্দ থাকবে, যেখানে তাদের স্ব স্ব উম্মতের মুমিন ব্যক্তিবর্গ আগমন করবে। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওজ হবে সবচেয়ে বড়ো। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা হাওজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। কেয়ামতের দিন হাওজ থাকবে মর্মে মুতাওয়াতির সূত্রে (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনায়) যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেসবের দরুন তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত সাব্যস্ত হয়।

ছয়. পুলসিরাত : এটি জাহান্নামের পৃষ্ঠের ওপর স্থাপিত সাঁকো। এটা হবে চুলের চেয়েও চিকন এবং তরবারির চেয়েও ধারালো।[348] পুলসিরাতের ওপর (একাধিক মাথাবিশিষ্ট) পেরেক থাকবে। পেরেকগুলো মানুষকে ছোঁ মারবে মানুষের আমল অনুযায়ী। মানুষেরা নিজেদের আমল অনুযায়ী এর ওপর দিয়ে গমন করবে। কেউ গমন করবে চোখের পলকে, কেউ অতিক্রম করবে বিজলির গতিতে, কেউ গমন করবে বাতাসের গতিতে, কেউ অতিক্রান্ত হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ গমন করবে উষ্ট্রবাহনের গতিতে, কেউ পার হবে দৌড়ের গতিতে, কেউ অতিক্রম করবে হেঁটে হেঁটে,

[348] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮৩, ইমান অধ্যায় (১), পরিচ্ছেদ : ৮১।

কেউবা পার হবে হামাগুড়ি দিয়ে। আবার কাউকে ছোঁ মেরে নিয়ে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে, ফলে নিজের কৃতকর্ম অনুযায়ী সে জাহান্নামে শাস্তি পাবে।

মানুষেরা পুলসিরাত পার হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত (ফুটওভার ব্রিজের পর্যায়ভুক্ত) *কানতারা* তথা উঁচু সেতুতে দাঁড় করানো হবে।[349] এরপর একে অপরের নিকট থেকে কিসাস (অন্যায়ের বদলা) গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে দূরীভূত হবে সমুদয় হিংসা ও বিদ্বেষ; যেন তারা জান্নাতে প্রবেশ করে একতাবদ্ধ ভাই ভাই হয়ে।

সাত. শাফায়াত : কারও কল্যাণ আনয়ন কিংবা কারও অকল্যাণ প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর নিকট মধ্যস্থতা করাই (intercession) হলো শাফায়াত। শাফায়াতকারীর প্রতি আল্লাহর অনুমতিপ্রদান এবং যার জন্য শাফায়াত করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তোষ ব্যতিরেকে শাফায়াত কার্যকর হবে না। **শাফায়াত দুভাগে বিভক্ত। যথা : (১)** নবি

---

[349] **অনুবাদকের টীকা :** শাইখ সালিহ আল-উসাইমি বলেছেন, “কানতারা (উঁচু সেতু) হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত উঁচু কাঠামো। এটা ফুটওভার ব্রিজের পর্যায়ভুক্ত, যেসব ব্রিজ লম্বা রাস্তার দু পার্শ্বে স্থাপন করা হয়।” **দ্রষ্টব্য :** সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা (২) / বারনামাজু মুহিম্মাতিল ইলম ১৪৪২ / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি,*** ১২:০০ মিনিট থেকে ১৩:০০ মিনিট পর্যন্ত, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, দারস আপলোডের তারিখ : ২২শে এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, এডুকেশনাল ভিডিয়ো, https://youtu.be/7oQaPD2E_vA?si=H7JbppHR8wXc5LWP। **টীকা সমাপ্ত।**

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সুনির্দিষ্ট **(২)** নবিজি-সহ সকল নবি, সিদ্দিক ও সৎ বান্দাগণের জন্য ব্যাপক।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যেসব শাফায়াত সুনির্দিষ্ট, তারমধ্যে লেখক দুটোর কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

এক. সর্ববৃহৎ শাফায়াত : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের অধিবাসীদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন, যেন তাদের ফায়সালা সম্পন্ন করা হয়। আর এটা ঘটবে আদম, নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিমুস সালামের মতো নবিগণের কাছে শাফায়াত চাওয়ার পর। কিন্তু তারা শাফায়াত করবেন না। যার দরুন একটি পর্যায়ে শাফায়াতের বিষয়টি পৌঁছে যাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। ফলে তিনি শাফায়াত করবেন এবং আল্লাহ তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর করবেন। এটা হবে সেই মাকামে মাহমুদ তথা প্রশংসিত অবস্থানের অন্তর্গত, যেই প্রশংসিত অবস্থান নবিজিকে প্রদানের ওয়াদা করেছেন আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

﴿عَسَىٰٓ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾.

“আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে উন্নীত করবেন প্রশংসিত স্থানে।”[350]

---

[350] সুরা ইসরা : ৭৯।

দুই. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের হকদারদের জন্য শাফায়াত করবেন, যেন তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

আবার ব্যাপক শাফায়াতের মধ্য থেকেও লেখক দুটোর কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

এক. জাহান্নামের হকদার হয়েছে এমন পাপী মুমিনদের জন্য শাফায়াত করা হবে, যেন তারা জাহান্নামে প্রবেশ না করে।[351]

দুই. আবার জাহান্নামে চলে গেছে এমন (পাপী মুমিন) ব্যক্তিদের জন্য শাফায়াত করা হবে, যেন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হয়।

শেষোক্ত দুই প্রকার শাফায়াত মুতাজিলা ও খারেজি সম্প্রদায়ের লোকেরা অস্বীকার করে থাকে। তারা এটা করে তাদের এই মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, কবিরা গুনাহগার জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, শাফায়াত তার কোনো কাজে আসবে না।

---

[351] **অনুবাদকের টীকা :** শাফায়াতের এই প্রকারটির ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। একদল উলামা ব্যাপকভাবে কবিরা গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করার হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেন, জাহান্নামের হকদার হয়েছে এমন লোকজন যেন জাহান্নামে না যায় সেজন্য শাফায়াত করা হবে। পক্ষান্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি এই প্রকারটিকে সুস্পষ্ট-দলিলবিহীন আখ্যা দিয়ে কেবল দ্বিতীয় প্রকার শাফায়াতকে সাব্যস্ত করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***তাহজিবু সুনানি আবি দাউদ ওয়া ইদাহু ইলালিহি ওয়া মুশকিলাতিহি*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হিজরি, *আওনুল-মাবুদ*-সহ), খ. ১৩, পৃ. ৫৫-৫৬। **টীকা সমাপ্ত।**

আর শাফায়াত ছাড়াই স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে একদল লোককে বের করবেন। তথাপি জান্নাতে প্রবেশকারী পৃথিবীবাসী ছাড়াও জান্নাতে অতিরিক্ত একদল জান্নাতবাসী থাকবে। আল্লাহ জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি ইমান

(الإيمان بالقضاء والقدر)

মূলপাঠ :

وَتُؤْمِنُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ - أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ -: بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত তাকদিরের (ভাগ্যের) ভালো ও মন্দের প্রতি ইমান রাখে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি ইমান রাখা ওয়াজিব। দ্বীনের মধ্যে এর মর্যাদাগত অবস্থান— এটি ইমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম। কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

“ইমান তো এটাই যে, তুমি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ, রসুলগণের প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখবে, এবং ইমান রাখবে তুমি তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি।”[352]

আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি ইমান রাখার মানে— তুমি ইমান রাখবে, সৃষ্টিজগতের বিদ্যমান-অবিদ্যমান, নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট যতকিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টিতেই হয়ে থাকে। আর তুমি জেনে রাখবে, মানুষ যা পেয়েছ, তা তোমার জন্য না পাওয়ার ছিল না। আর যা পাওনি, তা কখনো পাওয়ার ছিল না। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

[352] সহিহ মুসলিম, হা. ৮, ইমান অধ্যায় (১), পরিচ্ছেদ : ১।

ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি ইমানের স্তরদ্বয় এবং প্রথম স্তরের আলোচনা

(درجتا الإيمان بالقضاء والقدر وبيان أولهما)

মূলপাঠ :

وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ: عَلَى دَرَجَتَيْنِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ. فَالدَّرَجَةُ الأُولَى: **الإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الخَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ** الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ - مِنَ الطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي، وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ -. **ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ.** فَأَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الأَقْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾، وَقَالَ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾. وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ، يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ - جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا -: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَا شَاءَ. وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الجَنِينِ - قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ -: بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا؛ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ،

وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا الْقَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ.

ভাগ্যের প্রতি ইমানের দুটো স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরে আবার রয়েছে দুটো করে বিষয়।

প্রথম স্তর : এ বিষয়ের প্রতি ইমান রাখা যে, **মহান আল্লাহ আপন সৃষ্টিরাজির কর্মাবলির ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন, তাঁর চিরন্তন জ্ঞানের মাধ্যমে,** যে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সীমাহীন সময়কালে সদা বিশেষিত[353]। তিনি সৃষ্টিকুলের সমুদয় পরিস্থিতি তথা আনুগত্য ও অবাধ্যতামূলক কর্মাবলি, রিজিক ও আয়ুকাল প্রভৃতি সম্পর্কে জানেন।

এরপর আল্লাহ লাওহে মাহফুজে (সুরক্ষিত ফলকে) সৃষ্টিকুলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন। যখন আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন, তখন

---

[353] অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকেই সবকিছু জানেন, যার কোনো শুরু নেই, আবার আগামীতেও তিনি জানার এই গুণে গুণান্বিত থাকবেন, যার কোনো শেষ নেই। – ***অনুবাদক।***

কলমকে বলেন, ‘লিখ।’[354] কলম বলে, ‘কী লিখব?’ আল্লাহ বলেন, ‘কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যা ঘটবে সব লিখ।’[355]

অতএব মানুষ যা পেয়েছে, তা তার জন্য না পাওয়ার ছিল না। আর যা পায়নি, তা কখনো পাওয়ার ছিল না। কলম (লিখে) শুকিয়ে গেছে, আর কাগজও গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, “তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; নিশ্চয় এটা আল্লাহর নিকট সহজ।”[356] তিনি আরও বলেছেন, “পৃথিবীতে অথবা তোমাদের

---

[354] **অনুবাদকের টীকা :** অনেক সম্মাননীয় ব্যক্তি বাক্যটির অনুবাদ করেন, ‘আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন, এরপর কলমকে বলেন, লিখ।’ আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু তাঁদের অনুবাদটি এখানে সঠিক অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ *ওয়াসিতিয়্যা-প্রণেতা* শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার অভিমত অনুযায়ী আলোচ্য আরবি বাক্যকে পড়তে হবে এভাবে— فَأَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ। অর্থাৎ আওয়্যালা (أَوَّلَ) শব্দের লামে জবর দিয়ে পড়তে হবে, পেশ দিয়ে *‘আওয়্যালু’* পড়া যাবে না। জবর দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে, *‘যখন’।* সেক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হবে, *‘যখন আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন, তখন কলমকে বলেন, লিখ।’* **দ্রষ্টব্য :** আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি নাকদি কালামিশ শিয়াতিল কাদারিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৫-১৬।

আল্লাহ আরশ আগে সৃষ্টি করেছেন, না কলম, সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে যে মতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত হোক না কেন, শাইখুল ইসলাম আলোচ্য আরবি বাক্যকে যেভাবে পড়তে বলেছেন, সে অনুযায়ী অর্থ করাটাই বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩১৪-৩১৬।

আকিদার উচ্চতর কিতাবপত্রে এই হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনার সময় *‘তাসালসুলুল হাওয়াদিস’* তথা *‘শ্রেণিগতভাবে ইলাহি কর্মাবলির অনাদিত্ব’* নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু *আকিদা ওয়াসিতিয়্যা* স্তরের পাঠকবর্গের জন্য উক্ত মাসআলার পঠনপাঠন সমীচীন মনে করছি না বলে সে বিষয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকলাম। **টীকা সমাপ্ত।**

[355] আবু দাউদ, হা. ৪৭০০; তিরমিজি, হা. ২১৫৫ ও ৩৩১৯; সনদ : সহিহ।

[356] সুরা হজ : ৭০।

নিজেদের ওপর যে বিপদই আসে, তা সংঘটিত করার পূর্বেই আমি কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রাখি। নিশ্চয় আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।"[357]

মহান আল্লাহর জ্ঞানের অনুগামী এই তাকদির বিভিন্ন জায়গায় সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে লেখা হয়েছে। মহান আল্লাহ লাওহে মাহফুজে তথা সুরক্ষিত ফলকে যা ইচ্ছে লিখেছেন। তিনি যখন মাতৃজঠরে সন্তানের দেহ সৃষ্টি করেন, তখন তার মধ্যে রুহ (আত্মা) ফুঁকে দেওয়ার পূর্বে তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। উক্ত ফেরেশতাকে চারটি কথা লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে বলা হয়, তুমি এই সন্তানের রিজিক, আয়ু, আমল এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা (জান্নাতী না জাহান্নামী) তা লিখে ফেল। এই স্তরের তাকদিরকেই প্রাচীনকালে চরমপন্থি কাদারিয়া (তাকদির অস্বীকারকারী) সম্প্রদায় অস্বীকার করত। বর্তমান সময়ে উক্ত তাকদির অস্বীকারকারীর সংখ্যা সামান্য। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

ভাগ্যের প্রতি ইমানের দুটো স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরে আবার রয়েছে দুটো করে বিষয়। প্রথম স্তরে আছে আল্লাহর জ্ঞান এবং লিখন। এ স্তরের দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

[357] সুরা হাদিদ : ২২।

"তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; নিশ্চয় এটা আল্লাহর নিকট সহজ।"[358]

জ্ঞানের বিষয়টি হচ্ছে, আপনি আল্লাহর জ্ঞানের প্রতি ইমান রাখবেন, যেই জ্ঞান সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে পরিবেষ্টন করে আছে সকল কিছুকে। আর লিখনের ক্ষেত্রে আপনি ইমান রাখবেন, নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছুর ভাগ্য আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন (أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ **بحسب علمه**)।[359] লেখার একাধিক প্রকার আছে। যথা :

প্রথম প্রকার : আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিখে রাখা হয়েছে। এর দলিল— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী,

«لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ : اكْتُبْ. قَالَ : ربِّ مَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ اكْتُب مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَومِ القِيامَة».

---

[358] সুরা হজ : ৭০।

[359] এটা শাইখ ইবন উসাইমিনের কথার হুবহু অনুবাদ এবং এ ধরনের বাক্য আরও আলিম থেকে প্রমাণিত। সুতরাং আলোচ্য বাক্য নিয়ে কেউ ফতোয়াবাজি করতে চাইলে যেন বিষয়টা মাথায় রাখে। – ***অনুবাদক।***

"যখন আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন, তখন কলমকে বলেন, 'লিখ।' কলম বলে, 'কী লিখব, হে প্রভু?' আল্লাহ বলেন, 'কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যা ঘটবে সব লিখ'।"[360]

দ্বিতীয় প্রকার : জৈবনিক লিখন (যা প্রত্যেক নবজীবনের প্রারম্ভে লেখা হয়)। মাতৃজঠরে সন্তানের বয়স যখন চার মাসে উপনীত হয়, তখন মাতৃগর্ভে নিযুক্ত ফেরেশতা এই লেখা লিখে থাকেন। উক্ত ফেরেশতাকে এই সন্তানের রিজিক, আয়ু, আমল এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা (জান্নাতী না জাহান্নামী) তা লিখে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর দলিল হচ্ছে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস, যা সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে সাব্যস্ত হয়েছে।[361]

আলোচ্য স্তরের তাকদিরকে প্রাচীনকালে চরমপন্থি কাদারিয়া (তাকদির অস্বীকারকারী) সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

360 আবু দাউদ, হা. ৪৭০০; তিরমিজি, হা. ২১৫৫ ও ৩৩১৯; আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৩১৭; সনদ : সহিহ।

361 সহিহুল বুখারি, হা. ৩২০৮; সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৪৩।

তাকদিরের প্রতি ইমানের দ্বিতীয় স্তর

(الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر)

মূলপাঠ :

وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ مَشِيئَةُ اللَّهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ: الإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ المَوْجُودَاتِ وَالمَعْدُومَاتِ. **فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ،** لَا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. وَمَعَ ذَلِكَ: فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ بِطَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ المُتَّقِينَ وَالمُحْسِنِينَ وَالمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَلَا يُحِبُّ الكَافِرِينَ، وَلَا يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ، وَلَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ، وَلَا يُحِبُّ الفَسَادَ. وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ - وَالعَبْدُ: هُوَ المُؤْمِنُ وَالكَافِرُ، وَالبَرُّ وَالفَاجِرُ، وَالمُصَلِّي وَالصَّائِمُ - وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، وَاللَّهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ، كَمَا قَالَ: ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ القَدَرِيَّةِ، الَّذِينَ سَمَّاهُمُ السَّلَفُ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَيَغْلُو فِيهَا

قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ، حَتَّى يَسْلُبُوا العَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ، وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا.

দ্বিতীয় স্তর : আল্লাহর সদা কার্যকর ইচ্ছা এবং তাঁর সর্বব্যাপী ক্ষমতা। এক্ষেত্রে ইমান রাখতে হবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সেটাই সম্পন্ন হয়, আর যা ইচ্ছা করেন না, তা কখনোই সম্পন্ন হয় না। ইমান রাখতে হবে, আসমান ও জমিনে যে নড়াচড়া ও স্থিরতা হয়ে থাকে, তা কেবল মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ যা চান না তা তাঁর রাজত্বে কখনোই সংঘটিত হয় না। আরও ইমান রাখতে হবে, মহান আল্লাহ অস্তিত্বশীল-অস্তিত্বহীন যাবতীয় বিষয়ের ওপর মহাক্ষমতাবান (সকল কিছু করার শক্তি তাঁর আছে)।

আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। তিনি ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত কোনো রবেরও অস্তিত্ব নেই। এ সত্ত্বেও তিনি বান্দাদেরকে তাঁর নিজের ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন তাঁর অবাধ্য হতে। মহান আল্লাহ আল্লাহভীরু মুত্তাকি, অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ বান্দাদের ভালোবাসেন এবং ইমান আনয়নকারী ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি কাফিরদের ভালোবাসেন না এবং পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না, তাঁর বান্দাদের কুফরিতে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করেন না এবং বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ভালোবাসেন না।

বান্দারা বাস্তবিক অর্থেই কর্মসম্পাদনকারী। আর আল্লাহ তাদের কর্মের স্রষ্টা। মুমিন, কাফির, পুণ্যবান, পাপাচারী, নামাজী, রোজাদার সবাই বান্দা। নিজেদের কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা বান্দাদের রয়েছে এবং তাদের আরও রয়েছে ইচ্ছা। তাদের স্রষ্টা এবং তাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছারও স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের

মধ্যে যে সরল পথে চলার ইচ্ছা করে, তার জন্য (কুরআন উপদেশস্বরূপ)। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করেন, তবে তোমরা ইচ্ছা করতে পারবে না।”[362]

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই তাকদিরের এই স্তরকে অস্বীকার করে। যাদেরকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘এই উম্মতের অগ্নিপূজক’ বলে অভিহিত করেছেন। এই স্তরের ব্যাপারে তাকদির স্বীকারকারী একদল লোক বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। ফলে তারা বান্দার কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর কর্মাবলি ও বিধানাদি থেকে সেসবের (কর্ম ও বিধানের) প্রজ্ঞা ও কল্যাণকর বিষয়কে বের করে দিয়েছে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

তাকদিরের প্রতি ইমানের দ্বিতীয় স্তরেও রয়েছে দুটো বিষয়– আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর সৃষ্টি। **আল্লাহর ইচ্ছার দলিল—** মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾.

“আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।”[363]

আর তাঁর সৃষ্টির দলিল— মহান আল্লাহর এই বাণী, তিনি বলেছেন,

---

362 সুরা তাকবির : ২৮-২৯।

363 সুরা ইবরাহিম : ২৭।

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা।"[364]

আল্লাহর ইচ্ছার বিষয়টি হচ্ছে, আপনি আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছার প্রতি ইমান রাখবেন। ইমান রাখবেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সেটাই সম্পন্ন হয়, আর যা ইচ্ছা করেন না, তা কখনোই সম্পন্ন হয় না। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের কর্মাবলি এবং সৃষ্টির কর্মাবলি সমান (সবক্ষেত্রেই তাঁর সর্বব্যাপী ইচ্ছা কার্যকর হয়)। যেমন মহান আল্লাহ নিজের কর্মাবলির ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾.

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম।"[365]

আবার তিনি সৃষ্টিরাজির কর্মাবলির ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.

"তোমার রব যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা এমন কাজ করতে পারত না।"[366]

---

[364] সুরা জুমার : ৬২।

[365] সুরা সাজদা : ১৩।

[366] সুরা আনআম : ১১২।

আর আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপনি ইমান রাখবেন, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, চাই তা তাঁর নিজের কাজের অন্তর্ভুক্ত হোক কিংবা তাঁর বান্দাদের কাজ হোক (বান্দাদের কাজেরও স্রষ্টা তিনি)।

আল্লাহর নিজের কাজে তাঁর সৃষ্টির দলিল— আল্লাহর এই বাণী,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾.

"নিশ্চয় তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।"[367]

আর বান্দাদের কর্মাবলিতে আল্লাহর সৃষ্টির দলিল— তাঁর এই বাণী,

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾.

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মাবলিকে সৃষ্টি করেছেন।"[368]

আল্লাহ যে বান্দার কাজের স্রষ্টা, তা এইদিক থেকে যে, ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা ব্যতিরেকে বান্দার কাজ সম্পন্ন হয় না। আর বান্দার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার স্রষ্টা হলেন আল্লাহ।

---

[367] সুরা আরাফ : ৫৪।

[368] সুরা সাফফাত : ৯৬।

বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা (مشيئة العبد وقدرته)

বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾.

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো।"[369]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

"তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্য (ক্ষমতা) অনুযায়ী ভয় করো।"[370]

আল্লাহ উক্ত আয়াতদ্বয়ে বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা সাব্যস্ত করেছেন। তবে বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

"তোমরা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ইচ্ছা করতে পারবে না।"[371]

---

[369] সুরা বাকারা : ২২৩।

[370] সুরা তাগাবুন : ১৬।

[371] সুরা তাকবির : ২৯।

আলোচ্য স্তরে তথা আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে যারা ভ্রষ্ট হয়েছে :

এ বিষয়ে দুটো দল বিভ্রান্ত হয়েছে। যথা :

এক. কাদারিয়া সম্প্রদায়। কারণ এরা বিশ্বাস করে, বান্দা তার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় পরিপূর্ণ স্বাধীন। বান্দার কর্মে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা ও সৃষ্টির অস্তিত্ব নেই।

দুই. জাবারিয়া সম্প্রদায়। কারণ এরা বিশ্বাস করে, বান্দা তার নিজের কাজে বাধ্য। বান্দার কাজে তার নিজের কোনো ইচ্ছা ও ক্ষমতার অস্তিত্ব নেই।

প্রথম সম্প্রদায় তথা কাদারিয়াদের খণ্ডন করা যায় মহান আল্লাহর এই বাণীগুলো দিয়ে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾.

"তোমরা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ইচ্ছা করতে পারবে না।"[372]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.

"তোমার রব যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা এমন কাজ করতে পারত না।"[373]

---

[372] সুরা তাকবির : ২৯।

[373] সুরা আনআম : ১১২।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় জাবারিয়াদের খণ্ডন করা যায় মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীগুলো দিয়ে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾.

"তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলার ইচ্ছা করে, তার জন্য (কুরআন উপদেশস্বরূপ)।"[374]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾.

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো।"[375]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা সাব্যস্ত করেছেন।[376]

---

[374] সুরা তাকবির : ২৮।

[375] সুরা বাকারা : ২২৩।

[376] ব্যাখ্যাকার রাহিমাহুল্লাহ এমনটিই লিখেছেন। কিন্তু মানুষের যে ক্ষমতা রয়েছে তার সুস্পষ্ট দলিল সুরা তাগাবুনের ১৬ নং আয়াতে রয়েছে। আয়াতটি তিনি কিছুপূর্বে উল্লেখ করলেও এখানে করেননি। কারণ তাঁর উল্লিখিত আয়াত-দুটো থেকেও প্রতীয়মান হয়, মানুষের ক্ষমতা আছে। কেননা ক্ষমতা ছাড়া কেউ সরল পথে চলতে পারে না এবং গমনও করতে পারে না। – ***অনুবাদক।***

পূর্বনির্ধারিত ফায়সালার ওপর নির্ভর করা এবং আমল ছেড়ে দেওয়ার বিধান

(حكم الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل)

পূর্বনির্ধারিত ফায়সালার ওপর নির্ভর করা এবং আমল ছেড়ে দেওয়া না-জায়েজ। কেননা সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করেছিলেন,

«يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلى الكِتَابِ الأَوَّلِ وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ : اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ».

“হে আল্লাহর রসুল, আমরা কি আমাদের তাকদিরের লেখার ওপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিব না? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করে যেতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করা তার জন্য সহজ করে দিবেন। আর যারা দুর্ভাগা হবে, তাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। এরপর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরআনের এসব আয়াত) পাঠ করলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, আর সত্য কথাকে (ইসলামি বিশ্বাসকে) সত্যায়ন করেছে, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, আর সত্য কথাকে (ইসলামি বিশ্বাসকে) অস্বীকার করেছে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের (অকল্যাণের) পথ।' (সুরা লাইল : ৫-১০)"[377]

এই উম্মতের অগ্নিপূজক যারা (مجوس هذه الأمة)

কাদারিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের অগ্নিপূজক। কাদারিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, বান্দা তার নিজের কাজে পরিপূর্ণ স্বাধীন (বান্দার কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজে, আল্লাহ সেসবের স্রষ্টা নন, বরং তিনি নিজের সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা মাত্র)। কাদারিয়ারা অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে তাদেরকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ অগ্নিপূজকরা বলে থাকে, মহাবিশ্বের স্রষ্টা দুজন। আলো একটা স্রষ্টা,

---

[377] সহিহুল বুখারি, হা. ১৩২৬; সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৪৭।

যে কল্যাণকর বিষয় সৃষ্টি করে। আর অন্ধকার একটা স্রষ্টা, যে অকল্যাণকর বিষয় সৃষ্টি করে।

তদ্রুপ কাদারিয়া সম্প্রদায় বলে, যাবতীয় কাজের স্রষ্টা দুজন। যেসব কাজ বান্দার কর্মাবলির অন্তর্গত, সেসবের স্রষ্টা বান্দা। আর যেসব কাজ আল্লাহর কর্মাবলির অন্তর্গত, সেসবের স্রষ্টা আল্লাহ।

জাবারিয়া সম্প্রদায় আল্লাহর কর্মাবলি ও বিধানাদি থেকে সেসবের (কর্ম ও বিধানের) প্রজ্ঞা ও কল্যাণকর বিষয়কে বের করে দেয়। এটা কীভাবে?

এর স্বরূপ হচ্ছে, জাবারিয়া সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছাকৃত কাজ এবং বান্দার অনিচ্ছাবশত কাজের মধ্যে পার্থক্য করে না। তাদের মতে উভয় ক্ষেত্রেই বান্দা নিজের কাজে বাধ্য থাকে, যেমনটি ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। বিষয়টি যখন এমনই, তখন ভালো কাজ করার জন্য আল্লাহর সওয়াবপ্রদান এবং নাফরমানির জন্য শাস্তিদানের মাঝে কোনো হিকমা তথা প্রজ্ঞা থাকে না (তাদের মতানুযায়ী অযথা পুরস্কৃত করা ও শাস্তি দেওয়া হয়)। কারণ এদের মতাদর্শ অনুযায়ী বান্দার ইচ্ছা ছাড়াই বান্দার কর্ম সম্পাদিত হয়। বিষয়টি যদি এমন হয়, তাহলে কর্মসম্পাদনকারী তার কর্মের জন্য প্রশংসিত হয়ে উত্তম প্রতিদানের হকদার হবে না। আবার কর্মসম্পাদনকারী তার কর্মের জন্য নিন্দিত হয়ে শাস্তিরও হকদার হবে না। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

ইমানের পরিচয় এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধি

(تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه)

মূলপাঠ :

فَصْلٌ: وَمِنْ أُصُولِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ - قَوْلُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ - وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالمَعْصِيَةِ.

পরিচ্ছেদ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি অন্যতম মূলনীতি— দ্বীন ও ইমান মূলত কথা ও কাজের নাম। অন্তর ও জবানের কথা এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ (এ সবের সমষ্টি হলো ইমান)। আর ইমান আনুগত্যের ফলে বেড়ে যায় এবং অবাধ্যতার দরুন কমে যায়। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

আভিধানিক অর্থে ইমান মানে বিশ্বাস বা সত্যায়ন। পরিভাষায়, অন্তর ও জবানের কথা এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ—এ সবের সমষ্টি হচ্ছে ইমান। অন্তরের কথা হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস ও সত্যায়ন। অন্তরের ইচ্ছা, ভরসা প্রভৃতির মতো গতিময়তা হচ্ছে অন্তরের কাজ। মুখে উচ্চারণ করা হলো জবানের কথা। আর কর্ম সম্পাদন করা এবং পরিত্যাগ করা হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ। উল্লিখিত

সবগুলো বিষয় যে ইমানের অন্তর্গত, তার দলিল— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

"ইমান তো এটাই যে, তুমি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ, রসুলগণের প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখবে, এবং ইমান রাখবে তুমি তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি।"[378] এখানে অন্তরের কথার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

"ইমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই— এ কথা বলা এবং এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ইমানের একটি অন্যতম শাখা।"[379]

---

[378] সহিহ মুসলিম, হা. ৮, ইমান অধ্যায় (১), পরিচ্ছেদ : ১।

[379] সহিহ মুসলিম, হা. ৩৫, ইমান অধ্যায় (১), পরিচ্ছেদ : ১২।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হচ্ছে জবানের কথা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ, আর অন্তরের কাজ হলো লজ্জা।

ইমান বেড়ে যায় এবং কমে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾.

"যাতে করে তারা নিজেদের ইমানের সাথে ইমান বৃদ্ধি করে নেয়।"[380]

নারীদের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ».

"বুদ্ধি ও দ্বীনের (ইমানের) ক্ষেত্রে কমতি থাকা সত্ত্বেও[381] একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধিহরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি।"[382]

---

[380] সুরা ফাতহ : ৪।

[381] **অনুবাদকের টীকা :** এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, ইমান কমে যায়। কারণ এখানে দ্বীনের ক্ষেত্রে নারীদের কমতি থাকার কথা বলা হয়েছে। এ হাদিস দিয়ে ইমান কমে যাওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজি, ইমাম বাগাউয়ি, ইবনু হাজম, নববি, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া-সহ আরও অনেকে। **দ্রষ্টব্য :** সুনানু আবি দাউদ, খ. ৪, পৃ. ২১৯; সুনানুত তিরমিজি, খ. ৫, পৃ. ১০; শারহুস সুন্নাহ, খ. ১, পৃ. ৩৯; আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, খ. ৩, পৃ. ২৩৭; শারহু সহিহি মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৫; মাজমুউ ফাতাওয়া, খ. ১৩, পৃ. ৫১; **গৃহীত :** আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর, ***জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া নুকসানুহু ওয়া হুকমুল ইসতিসনায়ি ফিহ*** (রিয়াদ : দারু কুনুযি ইশবিলিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৯৭-৯৯। **টীকা সমাপ্ত।**

[382] সহিহুল বুখারি, হা. ৩০৪; সহিহ মুসলিম, হা. ৭৯।

ইমান বৃদ্ধির মাধ্যম হচ্ছে আনুগত্য। আর আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং তাঁর নিষেধ বর্জন করাই হচ্ছে আনুগত্য। অপরদিকে ইমান কমে যাওয়ার কারণ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যেয়ে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া।

কবিরা গুনাহগারের বিধান এবং এ বিষয়ে মানুষের শ্রেণিবিভাগ

(حكم فاعل الكبيرة وأصناف الناس فيه)

মূলপাঠ :

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ: لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ القِبْلَةِ بِمُطْلَقِ المَعَاصِي وَالكَبَائِرِ - كَمَا يَفْعَلُهُ الخَوَارِجُ ـ؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ المَعَاصِي، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وَقَالَ: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. وَلَا يَسْلُبُونَ الفَاسِقَ المِلِّيَّ اسْمَ الإِيمَانِ بِالكُلِّيَّةِ وَيُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ - كَمَا تَقُولُهُ المُعْتَزِلَةُ ـ بَلِ الفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ، فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ المُطْلَقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا

وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلَا يُعْطَى الِاسْمَ المُطْلَقَ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الِاسْمِ.

এ সত্ত্বেও তারা (বড়ো কুফর নয় এমন) পাপাচারিতা ও কবিরা গুনাহের দরুন মুসলিমদের কাফির বলে দেয় না। যেমন কাজ খারেজিরা করে থাকে। বরং পাপাচারিতা থাকা সত্ত্বেও বহাল থাকে ইমানি ভ্রাতৃত্ব। যেমন মহান আল্লাহ (হত্যার বদলা নেওয়ার আয়াতে) বলেছেন, "তবে হত্যাকারীকে যদি তার (নিহত) ভাইয়ের (অভিভাবকের) তরফ থেকে কোনো বিষয়ে ক্ষমা করা হয়, তাহলে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্তপণ সাব্যস্ত করা হয়।"[383]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"[384]

তারা পাপাচারী মুসলিমের নিকট থেকে বিলকুল ইমানের পরিচয় ছিনিয়ে নেয় না এবং তাকে 'জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী' বলে দেয় না। যেমন কথা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে। বরং (কাফির নয় এমন) পাপাচারী ফাসিক লোকও ইমানের নিঃশর্ত

---

[383] সুরা বাকারা : ১৭৮।

[384] সুরা হুজুরাত : ৯-১০।

পরিচয়ের আওতাভুক্ত হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণীতে, "(ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে ফেললে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে) একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে।"[385] [386]

আবার কখনো কখনো নিঃশর্ত ইমানের পরিচয়ে পাপাচারী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণীতে, "নিশ্চয় মুমিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ইমান বেড়ে যায়, আর তারা কেবল নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।"[387]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসে, "কোনো ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোনো মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোনো চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোনো লুটতরাজকারী মুমিন অবস্থায় মূল্যবান সামগ্রী এমনভাবে লুটতরাজ করে না, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।"[388]

আহলুস সুন্নাহ বলে, এরূপ ব্যক্তি অসম্পূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন, কিংবা ইমানের কারণে মুমিন আবার কবিরা গুনাহের দরুন

---

[385] সুরা নিসা : ৯২।

[386] **অনুবাদকের টীকা :** সর্বসম্মতিক্রমে মুমিন দাস যদি পাপাচারীও হয়, তবুও তাকে মুক্ত করলে কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) আদায় হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৯৫। **টীকা সমাপ্ত।**

[387] সুরা আনফাল : ২।

[388] সহিহুল বুখারি, হা. ২৪৭৫; সহিহ মুসলিম, হা. ৫৭।

পাপাচারী (ফাসিক)। তাকে পূর্ণ ইমানের পরিচয় দেওয়া যাবে না, আবার ইমানের ন্যূনতম পরিচয় তার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেওয়া যাবে না। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

যেসব পাপের সাথে সুনির্দিষ্ট শাস্তি যুক্ত হয়েছে, সেগুলোই কবিরা গুনাহ। যেমন ব্যভিচার, চুরি, পিতামাতার অবাধ্যতা, ধোঁকা, মুসলিমদের অনিষ্টসাধনের প্রতি ভালোবাসা প্রভৃতি। **ইমানের পরিচয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিরা গুনাহগারের বিধান—** সে অসম্পূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন, কিংবা ইমানের কারণে মুমিন আবার কবিরা গুনাহের দরুন পাপাচারী (ফাসিক)। কবিরা গুনাহগার ইমানের পরিচয়বহির্ভুত (অমুসলিম বা কাফের) নয়। কারণ মহান আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর ব্যাপারে বলেছেন,

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

“তবে হত্যাকারীকে যদি তার (নিহত) ভাইয়ের (অভিভাবকের) তরফ থেকে কোনো বিষয়ে ক্ষমা করা হয়, তাহলে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্তপণ সাব্যস্ত করা হয়।”[389]

[389] সুরা বাকারা : ১৭৮।

এখানে আল্লাহ নিহত ব্যক্তিকে ঘাতকের ভাই সাব্যস্ত করেছেন। হত্যাকারী যদি ইমানবহির্ভুত কাফির হতো, তাহলে নিহত ব্যক্তি তার ভাই হতো না।

মহান আল্লাহ যুদ্ধরত দুই দলের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.

“মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।”[390]

যুদ্ধরত দলদুটো কবিরা গুনাহ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মীমাংসাকারী তৃতীয় পক্ষের ভাই সাব্যস্ত করেছেন।

---

[390] সুরা হুজুরাত : ৯-১০।

আর প্রতিদানপ্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে কবিরা গুনাহগারের বিধান— সে কবিরা গুনাহর জন্য নির্ধারিত প্রতিদান তথা শাস্তির হকদার হবে। তবে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। তার বিষয়টি আল্লাহর কাছেই অর্পিত থাকবে। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন, যতটুকু শাস্তি পাওয়ার হক রাখে সে। আবার আল্লাহ চাইলে তাকে মাফও করতে পারেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যসব (গুনাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"[391]

কবিরা গুনাহগারদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বিরোধী হয়েছে যারা :

এ বিষয়ে তিনটি দল আহলুস সুন্নাহর বিরোধী হয়েছে। যথা :

১. মুরজিয়া সম্প্রদায় : এরা বলে, কবিরা গুনাহগার পরিপূর্ণ ইমানওয়ালা মুমিন। তার কোনো শাস্তি হবে না।

২. খারেজি সম্প্রদায় : এরা বলে, কবিরা গুনাহগার হলো কাফির, সে হবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী।

---

[391] সুরা নিসা : ৪৮।

৩. মুতাজিলা সম্প্রদায় : এরা বলে, কবিরা গুনাহগার মুমিনও নয়, আবার কাফিরও নয়, বরং সে দুটো স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের আওতাভুক্ত। সে হবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী।

ফাসিক ব্যক্তি কি ইমানের পরিচয়ভুক্ত হবে?

(هل الفاسق يدخل في الإيمان)

কাফির নয় এমন পাপাচারী ফাসিক লোক পরিপূর্ণ ইমানের পরিচয়ভুক্ত হবে না। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণীতে,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

"নিশ্চয় মুমিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ইমান বেড়ে যায়, আর তারা কেবল নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।"[392]

বরং ফাসিক ব্যক্তি কেবল ন্যূনতম ইমানের পরিচয়ভুক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণীতে,

---

[392] সুরা আনফাল : ২।

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾.

"(ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে ফেললে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে) একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে।"[393]

আয়াতে উল্লিখিত '*মুমিন*' কথাটি এখানে ফাসিক এবং অন্যদেরও শামিল করে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**[394]

---

[393] সুরা নিসা : ৯২।

[394] ওয়াসিতিয়্যার যেই টেক্সটকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা করা হয়েছে, সেই অংশের ভিন্নরকম ব্যাখ্যাও কেউ কেউ করেছেন; যা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি যেন আমাদের নিয়মিত পাঠকবর্গের মস্তিষ্কে জটিলতা তৈরি না হয়। – ***অনুবাদক।***

সাহাবিগণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান

(موقف أهل السنة من الصحابة)

মূলপাঠ :

فَصْلٌ: وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. وَطَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ». وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ. فَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ - وَهُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ - وَقَاتَلَ، عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ. وَيُقَدِّمُونَ المُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ - وَكَانُوا ثَلَاثَ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ؛ بَلْ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ.

وَيَشْهَدُونَ بِالجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَالعَشَرَةِ، وَكَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ: مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي البَيْعَةِ. مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيٍّ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا، وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا. لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيٍّ. وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ - مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ -: لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. لَكِنَّ المَسْأَلَةَ الَّتِي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ الخِلَافَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ. وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

পরিচ্ছেদ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি অন্যতম মূলনীতি— আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ব্যাপারে নিজেদের অন্তর ও জবানকে নিরাপদ রাখা। যেমন (বিদ্বেষমুক্ত সম্পর্কের কথা) আল্লাহ সাহাবিদের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁর এই বাণীতে, “যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকেও ক্ষমা করুন। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, আপনিই পরম স্নেহশীল, অশেষ দয়ালু।”[395]

[395] সুরা হাশর : ১০।

আর আহলুস সুন্নাহর মূলনীতির অন্তর্গত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা মান্য করা, “তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি এক উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করে, তবুও তা তাদের কারও এক মুদ (মধ্যম মাপের দু হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছবে না।”[396]

কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা (মতৈক্য) অনুযায়ী সাহাবিগণের যে মাহাত্ম্য ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ তা গ্রহণ করে। যেসব সাহাবি বিজয় তথা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে দান-সদকা ও যুদ্ধ করেছেন তাঁদেরকে তারা ওই সাহাবিদের ওপর মর্যাদা (শ্রেষ্ঠত্ব) দিয়ে থাকে, যাঁরা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে দান-সদকা ও যুদ্ধ করেছেন। তারা আনসার সাহাবিদের ওপর মুহাজির সাহাবিদের মর্যাদা দিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তিনশো দশের কিছু বেশি সংখ্যক বদরবাসী সাহাবির উদ্দেশে বলেছেন, “তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।”[397]

তারা বিশ্বাস করে, (হুদাইবিয়ার প্রান্তরে) গাছের নিচে বায়াতকারী সাহাবিদের কেউ জাহান্নামে যাবে না। যেমনটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন।[398] বরং আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি হয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশোর বেশি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[396] সহিহুল বুখারি, হা.৩৬৭৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪০।

[397] সহিহুল বুখারি, হা. ৩০০৭; সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৯৪।

[398] সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৯৬; আবু দাউদ, হা. ৪৬৫২; তিরমিজি, হা. ৩৮৬০।

ওয়াসাল্লাম যেসব সাহাবিকে জান্নাতবাসী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারাও তাঁদের জান্নাতী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। যেমন একই হাদিসে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি, সাবিত বিন কাইস বিন শামমাস প্রমুখ সাহাবি।[399]

তারা সে বিষয়েরও স্বীকৃতি দেয়, যা আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্যদের থেকে মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনায়) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ আবু বকর, তারপর ওমর। তারা তৃতীয় অবস্থানে রাখে উসমানকে এবং চতুর্থ অবস্থানে রাখে আলিকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম (আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন)। যেমনটি হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং সাহাবিগণও বায়াতের (রাষ্ট্রনেতার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার প্রদানের) ক্ষেত্রে উসমানকে আলির আগে রাখতে একমত হয়েছিলেন।

যদিও কতিপয় আহলুস সুন্নাহ আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে অগ্রগামী রাখতে একমত হওয়ার পর উসমান ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, তাঁদের দুজনের মধ্যে সর্বোত্তম কে? ফলে একদল আহলুস সুন্নাহ উসমানকে আগে রাখার পরে নীরব থেকেছে। আরেকদল উসমানকে আগে রাখার পর আলিকে চতুর্থ অবস্থানে রেখেছে। অপর একদল আলিকে অগ্রগামী করেছে (আর উসমানকে চতুর্থ অবস্থানে রেখেছে)। আরেকদল এ

---

[399] আবু দাউদ, হা. ৪৬৪৯ ও ৪৬৫০; তিরমিজি, হা. ৩৭৪৮ ও ৩৭৫৭; ইবনু মাজাহ, হা. ১৩৪; সনদ : সহিহ; সাইয়্যিদুনা সাবিত বিন কাইসের হাদিস : সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬১৩; সহিহ মুসলিম, হা. ১১৯ ও ১৮৭।

ব্যাপারে কোনো অভিমত না দিয়ে ক্ষান্ত থেকেছে (মত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে)।

কিন্তু আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ উসমানকে অগ্রগামী রাখা, আর আলিকে পরের অবস্থানে রাখার ব্যাপারে স্থিতি লাভ করেছে। যদিও অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর মতে এই বিষয়টি—অর্থাৎ উসমান ও আলির এই বিষয়টি—এমন মূলনীতিগুলোর অন্তর্গত নয়, যে ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যায়। কিন্তু যে বিষয়ে পথভ্রষ্ট বলতে হয়, সেটা খেলাফতের বিষয়। কারণ আহলুস সুন্নাহ ইমান রাখে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খলিফা হলেন আবু বকর, ওমর, এরপর উসমান, তারপর আলি। যে ব্যক্তি তাঁদের কারও খেলাফতের নিন্দা করে, সে নিজ পরিবারের গাধার চেয়েও বিপথগামী। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

যিনি মুমিন অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য হলেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছেন কিংবা তাঁকে দেখেছেন এবং মারা গেছেন ইমানের ওপর, তিনিই সাহাবি।

সাহাবিদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান— আহলুস সুন্নাহ তাঁদেরকে ভালোবাসে, তাঁদের যথোচিত প্রশংসা করে, তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখা থেকে নিজেদের অন্তরকে মুক্ত রাখে, সাহাবিদের গালি দেওয়া হয় কিংবা তাঁদের মানহানি করা হয় এমন কথাবার্তা থেকে নিজেদের জবানকে মুক্ত রাখে। যেমন (বিদ্বেষমুক্ত সম্পর্কের

কথা) আল্লাহ সাহাবিদের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁর এই বাণীতে,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকেও ক্ষমা করুন। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, আপনিই পরম স্নেহশীল, অশেষ দয়ালু।"[400]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ».

"তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি এক উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করে, তবুও তা তাদের কারও এক মুদ (মধ্যম মাপের দু হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছবে না।"[401]

---

[400] সুরা হাশর : ১০।

[401] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৭৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪০।

সাহাবিদের মর্যাদাগত স্তরভিন্নতা

(اختلاف مراتب الصحابة)

সাহাবিগণের মর্যাদাগত পর্যায় বা মর্যাদাগত স্তরে ভিন্নতা রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾.

"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের (হুদাইবিয়া সন্ধির) পূর্বে দান-খয়রাত করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে দান করেছে এবং অংশগ্রহণ করেছে যুদ্ধে। তবে আল্লাহ (তাদের) প্রত্যেকেরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[402]

সাহাবিদের মর্যাদাগত স্তর বিভিন্ন হওয়ার কারণ— ইমান, ইলম ও সৎকর্মের জোর এবং ইসলামগ্রহণে অগ্রগামিতা।

শ্রেণিগতভাবে সাহাবিগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন *মুহাজির* সাহাবিবর্গ, এরপর *আনসার* সাহাবিবর্গ।[403] কেননা আল্লাহ মুহাজির

---

[402] সুরা হাদিদ : ১০।

[403] যারা নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে *মুহাজির* বলা হয়। আর মদিনার স্থানীয় মুসলিমদের বলা হয় *আনসার*, যাঁরা হিজরত করে আসা *মুহাজির* সাহাবিদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন সর্বতোভাবে। – ***অনুবাদক।***

সাহাবিদেরকে অগ্রগামী করেছেন আনসার সাহাবিদের পূর্বে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾.

"নিশ্চয় আল্লাহ— নবি, মুহাজিরবর্গ ও আনসারদের তওবা কবুল করেছেন।"[404]

আর যেহেতু মুহাজিরগণ নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ ছেড়ে হিজরতের পাশাপাশি ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন (আনসারদের মধ্যে এ দুটো গুণের সন্নিবেশ ঘটেনি)।

ব্যক্তিভেদে সর্বোত্তম সাহাবি হলেন আবু বকর, এরপর উমার। এ বিষয়টি সর্ববাদিসম্মত। আর আহলুস সুন্নাহর অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত—যে মতটি পরবর্তীতে স্থিতি লাভ করেছে—অনুযায়ী এরপর (উমারের পর) সর্বোত্তম হলেন উসমান, তারপর আলি। যদিও (ইতঃপূর্বে) আলি ও উসমানের মধ্যে কে বেশি উত্তম, সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। একদল আহলুস সুন্নাহ উসমানকে আগে রাখার পরে নীরব থেকেছিল। আরেকদল উসমানকে আগে রাখার পর আলিকে চতুর্থ অবস্থানে রেখেছিল। অপর একদল আলিকে অগ্রগামী করেছিল, আর উসমানকে রেখেছিল

---

[404] সুরা তওবা : ১১৭।

তৎপরবর্তী অবস্থানে। আরেকদল এ ব্যাপারে মত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছিল।

তবে যে ব্যক্তি বলে, উসমানের চেয়ে আলি উত্তম, তাকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে না। কারণ একদল আহলুস সুন্নাহ (সুন্নাহপন্থি বিদ্বানগণ) এ মত ব্যক্ত করেছেন।

চার খলিফা (الخلفاء الأربعة)

খলিফা চতুষ্টয় হলেন আবু বকর, উমার, উসমান ও আলি। খেলাফতে তাঁদের পর্যায়ক্রম—প্রথমে আবু বকর, তারপর উমার, এরপর উসমান, এরপর আলি। তাঁদের কোনো একজনের খলিফা হওয়া নিয়ে কেউ আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করলে কিংবা তাঁদের উল্লিখিত পর্যায়ক্রমের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করলে তাকে পথভ্রষ্ট বলা হবে। কেননা সে সাহাবিদের ইজমাবিরোধী (মতৈক্য-পরিপন্থি) এবং সমগ্র আহলুস সুন্নাহর ইজমাপরিপন্থি।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত সাব্যস্ত হয়। যেহেতু নামাজ পড়ানো এবং হজের প্রধান দায়িত্বভার অর্পণের ক্ষেত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই অগ্রগামী করেছেন। এদিক থেকেও তাঁর খেলাফত সাব্যস্ত হয় যে, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম সাহাবি। সুতরাং সাহাবিদের

মধ্যে খেলাফতপ্রাপ্তির ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে হকদার। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খেলাফতের দায়িত্বভার অর্পণ করার দরুন উমারের খেলাফত সাব্যস্ত হয়। আবার এদিক থেকেও তাঁর খেলাফত সাব্যস্ত হয় যে, তিনিই ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর সর্বোত্তম সাহাবি।

শুরা সদস্যদের (মন্ত্রণাপরিষদের সদস্যবৃন্দের) ঐক্যমতের ভিত্তিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত সাব্যস্ত হয়। আর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ তথা বিজ্ঞ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনুগত্যের বায়াত (অঙ্গীকার) করেন। এর ভিত্তিতে তাঁর খেলাফত সাব্যস্ত হয়। আর যেহেতু তিনিই ছিলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর সর্বোত্তম সাহাবি।

বদরবাসী সাহাবিবৃন্দ (أهل بدر)

বদরবাসী সাহাবি তাঁদেরকে বলা হয়, যাঁরা বদর যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষ থেকে লড়াই করেছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশো দশের কিছু বেশি। তাঁদের অর্জিত মাহাত্ম্য হলো— মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন,

«اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

“তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।”[405] এ হাদিসের মর্মার্থ হলো, তাদের দ্বারা যেসব পাপ সংঘটিত হবে, আল্লাহ সেসব পাপ ক্ষমা করে দেবেন, এই সুবিশাল পুণ্যের বদৌলতে, যা তাঁরা বদর যুদ্ধে অর্জন করেছেন। হাদিসটি এই সুসংবাদও ধারণ করে যে, বদরবাসী সাহাবিদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করে ধর্মত্যাগী হবে না।

বায়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিবৃন্দ

(أهل بيعة الرضوان)

‘বায়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবি’ তাঁদেরকে বলা হয়, যারা হুদাইবিয়ার বছর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে বায়াত (অঙ্গীকার) করেছিলেন যে, তাঁরা কুরাইশদের সাথে লড়াই করবেন এবং মৃত্যু অবধি যুদ্ধ থেকে পলায়ন করবেন না। এই বায়াতের কারণ— রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাপ-আলোচনার জন্য উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুরাইশদের কাছে পাঠালে এরকম গুজব রটেছিল যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করেছে। মহান আল্লাহ উক্ত বায়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের প্রতি

---

[405] সহিহুল বুখারি, হা. ৩০০৭; সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৯৪।

সন্তুষ্ট হয়েছেন, বিধায় এই বায়াতকে *‘বায়াতুর রিদওয়ান’* বলা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় চোদ্দোশো। **তাঁদের অর্জিত মাহাত্ম্য নিম্নরূপ :**

১. তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তোষ : মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

“নিশ্চয় মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়াত করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।”[406]

২. জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, (হুদাইবিয়ার প্রান্তরে) গাছের নিচে বায়াতকারী সাহাবিদের কেউ জাহান্নামে যাবে না।[407]

মানুষের ব্যাপারে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্যদান[408]

(الشهادة بالجنة والنار)

জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়ার দুটো প্রকার রয়েছে। যথা : (১) ব্যাপক সাক্ষ্য **(২)** সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য।

---

[406] সুরা ফাতহ : ১৮।

[407] সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৯৬; আবু দাউদ, হা. ৪৬৫২; তিরমিজি, হা. ৩৮৬০।

[408] ব্যাখ্যাকার রাহিমাহুল্লাহ এই আলোচনাটি সাহাবি বিষয়ক বিবরণের একদম শেষে উল্লেখ করেছেন। মূলগ্রন্থের সাথে মিল রাখার জন্য আমরা আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। – ***অনুবাদক।***

ব্যাপক সাক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে জান্নাতি না বলে ব্যাপকভাবে মুমিনরা জান্নাতে যাবে এমন সাক্ষ্য দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾.

"যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।"[409]

আর সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেওয়া। এ বিষয়টি পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ওপর নির্ভরশীল। যাকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী বলেছেন, আমরা কেবল তাঁকেই জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেব। যেমন যেমন একই হাদিসে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি, সাবিত বিন কাইস বিন শামমাস, উক্কাশা বিন মিহসান প্রমুখ সাহাবি।[410]

অনুরূপভাবে জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়ারও দুটো প্রকার রয়েছে। যথা : (১) ব্যাপক সাক্ষ্য **(২)** সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য।

---

[409] সুরা কাহফ : ১০৭।

[410] আবু দাউদ, হা. ৪৬৪৯ ও ৪৬৫০; তিরমিজি, হা. ৩৭৪৮ ও ৩৭৫৭; ইবনু মাজাহ, হা. ১৩৪; সনদ : সহিহ; **সাইয়্যিদুনা সাবিত বিন কাইসের হাদিস :** সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬১৩; সহিহ মুসলিম, হা. ১১৯ ও ১৮৭; **সাইয়্যিদুনা উক্কাশা বিন মিহসানের হাদিস :** সহিহুল বুখারি, হা. ৬৫৪১; সহিহ মুসলিম, হা. ২২০।

ব্যাপক সাক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র কাফিরদের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে বলা যে, কাফিররা জাহান্নামে যাবে। এর দলিল— মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾.

“যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব।”[411]

আর সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামী ঘোষণা দেওয়া। এ বিষয়টি পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ওপর নির্ভরশীল। যেমন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী, আবু তালিব, আমর বিন লুহাই আল-খুযায়ি প্রমুখ।[412] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[411] সুরা নিসা : ৫৬।

[412] সুরা লাহাব : ১-৫; সহিহুল বুখারি, হা. ৩৮৮৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২০৯; সহিহুল বুখারি, হা. ৪৬২৪; সহিহ মুসলিম, হা. ৯০১।

নবিপরিবার (آل بيت النبي ﷺ)

মূলপাঠ :

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ - وَقَدْ شَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ ـ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي». وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ـ وَيُقِرُّونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ. خُصُوصًا خَدِيجَةَ أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ. وَالصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

আহলুস সুন্নাহ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে ভালোবাসে, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাঁদের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত (বিশেষ উপদেশ) সংরক্ষণ করে। যিনি গাদিরে খুমের দিন (বিদায় হজের বছর

১৮ই জিলহজের দিন) বলেছেন, "আমি আমার আহলে বাইতের (পরিবারের) বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"[413]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস নবিজির কাছে অভিযোগ করেন, কতিপয় কুরাইশ বানু হাশিম গোত্রের লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এ শুনে চাচার উদ্দেশে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার আত্মীয়তার জন্য তোমাদেরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত ওরা ইমানদার হতে পারবে না।"[414]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ বনু ইসমাইলকে চয়ন করেছেন, আর বনু ইসমাঈল থেকে কিনানাকে চয়ন করেছেন, কিনানা থেকে কুরায়শকে বাছাই করেছেন, আর কুরায়শ থেকে বনু হাশিমকে বাছাই করেছেন এবং বনু হাশিম হতে আমাকে চয়ন করেছেন।"[415]

---

[413] নবিজি তিনবার এ কথা বলেছেন; **দ্রষ্টব্য :** সহিহ মুসলিম, হা. ২৪০৮, সাহাবিদের মর্যাদা অধ্যায় (৪৫), পরিচ্ছেদ : ৪।

[414] আহমাদ বিন হাম্বাল, ***ফাদায়িলুস সাহাবা***, হা. ১৭৫৬। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "শাইখ ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস হাফিজাহুল্লাহর তাহকিক অনুযায়ী এ হাদিসের সনদ দুর্বল; তবে শাইখ মুহাম্মাদ ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস জানিয়েছেন, তিনি অন্যত্র হাদিসটি নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত পেয়েছেন। দেখুন : আহমাদ বিন হাম্বাল, ***ফাদায়িলুস সাহাবা*** (তাহকিক : ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস), খ. ২, পৃ. ৯১৭-৯১৮।"

[415] সামান্য শব্দের পরিবর্তনে হাদিসটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হা. ২২৭৬, মর্যাদা অধ্যায় (৪৪), পরিচ্ছেদ : ১।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীবর্গ, যাঁরা হলেন মুমিনদের জননী, আহলুস সুন্নাহ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তারা ইমান রাখে, তাঁরা পরকালেও নবিজির স্ত্রী হবেন। বিশেষত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে, যিনি ছিলেন নবিজির অধিকাংশ সন্তানের জননী, নবিজির প্রতি সর্বপ্রথম ইমান আনয়নকারী ও দ্বীনের কাজে তাঁকে সহয়তাকারী এবং নবিজির নিকটে যাঁর ছিল উঁচু মর্যাদা। আর বিশেষত সিদ্দিক তনয়া সিদ্দিকা (আম্মিজান আয়িশা) রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। যাঁর ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আয়িশার মর্যাদা নারীদের ওপর তেমন, যেমন সারিদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ওপর।”[416]

তারা রাফিদি শিয়াদের মতাদর্শ থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করে, যারা কিনা সাহাবিদের ঘৃণা করে আর তাঁদের গালি দেয়। তদ্রুপ তারা নাসিবিদের মতাদর্শ থেকেও নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করে, যারা কিনা কথা বা কাজের মাধ্যমে নবিপরিবারকে কষ্ট দেয়। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারভুক্ত হলেন তাঁর স্ত্রীবর্গ এবং তাঁর সেসব মুমিন আত্মীয়, যাঁদের জন্য জাকাতের সম্পদ নেওয়া হারাম। যেমন আলি পরিবার, জাফর পরিবার, আব্বাস পরিবার প্রমুখ। তাঁদের ব্যাপারে মুমিনদের কর্তব্য— তাঁরা মুমিন ও

[416] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৭৭০; সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৪৬।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় হওয়ার দরুন তাঁদেরকে ভালোবাসা এবং সম্মান-শ্রদ্ধা করা। তাঁদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং শ্রদ্ধা করতে হবে, যেহেতু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে যে অসিয়ত করেছেন, তা বাস্তবায়ন করা যায়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

"আমি আমার আহলে বাইতের (পরিবারের) বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"[417]

আর যেহেতু তাঁদেরকে ভালোবাসা ও সম্মান করা পরিপূর্ণ ইমানেরই অন্তর্গত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের ব্যাপারে বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ؛ للهِ وَلِقَرَابَتِي».

"শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার আত্মীয়তার জন্য তোমাদেরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত ওরা ইমানদার হতে পারবে না।"[418]

---

[417] নবিজি তিনবার এ কথা বলেছেন; **দ্রষ্টব্য :** সহিহ মুসলিম, হা. ২৪০৮, সাহাবিদের মর্যাদা অধ্যায় (৪৫), পরিচ্ছেদ : ৪।

[418] আহমাদ বিন হাম্বাল, ***ফাদায়িলুস সাহাবা***, হা. ১৭৫৬; সনদ : দুর্বল (তাহকিক : ওয়াসিউল্লাহ আব্বাস); এ হাদিসের তাখরিজ পূর্বে গত হয়েছে।

নবিপরিবারের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা :

দুটো দল নবিপরিবারের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যথা :

এক. রাফিদি শিয়া গোষ্ঠী : কারণ এরা নবিপরিবারের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁদেরকে স্ব স্ব মর্যাদাগত স্তরের চেয়েও ওপরে তুলে দিয়েছে। এমনকি এ কাজ করতে গিয়ে একদল দাবি করে বসেছে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন ইলাহ (ইবাদত পাওয়ার হকদার)।

দুই. নাসিবি গোষ্ঠী : এরা হলো সেসব খারেজি, যারা নবিপরিবারের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ গেঁড়ে রেখেছে এবং তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে কথা বা কাজের মাধ্যমে।

নবিপত্নীগণ (أزواج النبي ﷺ)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী। কারণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ছিল, তাঁরা হলেন মুমিনদের জননী, পরকালেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী এবং অপবিত্রতা থেকে নিষ্কলুষ। এজন্য তাঁদেরকে কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তাকে কাফির ঘোষণা করা হবে। কেননা তাঁদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে অপরিহার্যভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মানহানি করা হয়ে যায় এবং নবিজির শয্যাকে নাপাক ঘোষণা করা হয়।

নবিপত্নীগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন খাদিজা ও আয়িশা। দুজনের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট বিবেচনা অনুযায়ী অপরজনের চেয়ে উত্তম। **খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য—** তিনি নবিজির প্রতি সর্বপ্রথম ইমান আনয়নকারী, রিসালাতপ্রাপ্তির সূচনায় দ্বীনের কাজে তাঁকে সহয়তাকারী, নবিজির অধিকাংশ সন্তানের জননী। বরং নবিপুত্র ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া সকল সন্তানের জননী। আর নবিজির নিকটে তাঁর ছিল অনেক উঁচু মর্যাদা। এজন্য নবিজি তাঁকে সর্বদা স্মরণ করতেন এবং তাঁর মৃত্যু অবধি কোনো নারীকে বিয়ে করেননি।

আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য— তিনি নবিজির শেষজীবনে তাঁর সাথে উত্তমভাবে মেলামেশা করেছেন, অপবাদকদের মিথ্যা রটনা থেকে আল্লাহ নিজের কিতাবে তাঁকে নিষ্কলুষ ঘোষণা করেছেন এবং কিতাবের মধ্যে আয়াত নাজিল করেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে। এছাড়াও তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত সুন্নাহ ও আদর্শ সংরক্ষণ করেছেন, যা আর কোনো রমণী সংরক্ষণ করতে পারেনি। তিনি উম্মতের মাঝে অনেক ইলম প্রচার করেছেন। তিনি ব্যতীত আর

কোনো কুমারী নারীকে নবিজি বিয়ে করেননি, ফলে তাঁর বৈবাহিক জীবনের শিক্ষা হয়েছে সরাসরি নবির হাতে। তাঁর ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

"আয়িশার মর্যাদা নারীদের ওপর তেমন, যেমন সারিদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ওপর।"[419] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[419] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৭৭০; সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৪৬।

সাহাবিগণের অন্তঃকলহে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান

(موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة)

মূলপাঠ :

وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ المَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِّصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَامَّةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ: هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ؛ إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ: لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ؛ بَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الجُمْلَةِ.

وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ، حَتَّى إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُمْ خَيْرُ القُرُونِ، وَأَنَّ المُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ. ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَوْ غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ المُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ بِالأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ؛ إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُمْ؟! ثُمَّ القَدْرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ، مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ القَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ - مِنَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالهِجْرَةِ، وَالنُّصْرَةِ، وَالعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِ ـ وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ القَوْمِ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ، وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ.

সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের বিষয়ে তারা (আলোচনা করা হতে) বিরত থাকে। তারা বলে, সাহাবিদের দোষত্রুটি সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর কিছু মিথ্যা, আর কিছু বর্ণনা এমন যেসবে কমবেশি করা হয়েছে এবং বর্ণনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। এসব বর্ণনার মধ্যে যেগুলো বিশুদ্ধ, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ওজরগ্রস্ত; হয় তাঁরা ইজতিহাদ করে সঠিকতায় উপনীত হয়েছেন, আর নয়তো ইজতিহাদ করে ভুলে পতিত হয়েছেন। এ সত্ত্বেও আহলুস সুন্নাহ এমন বিশ্বাস করে না যে, সকল সাহাবি ছোটোবড়ো সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। বরং সার্বিকভাবে তাঁদের দ্বারা পাপকাজ সংঘটিত হতে পারে।

কিন্তু তাঁদের এমন অগ্রগামিতা ও মর্যাদা আছে, যা থেকে অপরিহার্য হয়ে যায় তাঁদের দ্বারা সংঘটিত পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া, যদি বাস্তবেই পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে তবেই। এমনকি তাদের এমনসব পাপ মাফ করা হয়, যা তাঁদের পরবর্তীদের মাফ করা হয় না। কেননা তাঁদের এমন পূণ্যকাজ আছে, যা পাপকাজকে মিটিয়ে

দেয়, যেসব পূণ্যকাজ অন্যদের নেই। আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, সাহাবিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ।[420] প্রমাণিত হয়েছে, তাঁদের একজনের এক মুদ (মধ্যম মাপের দু হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ) দান পরবর্তীদের এক উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দানের চেয়েও উত্তম।[421]

তথাপি তাঁদের কারও দ্বারা যদি পাপকাজ সংঘটিত হয়েও থাকে, হয়তো তিনি সেই পাপ থেকে তাওবা করে নিয়েছেন, কিংবা কোনো ভালোকাজ সম্পাদন করেছেন, যা ওই পাপকে মিটিয়ে দিয়েছেন, অথবা তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তাঁর অগ্রগামিতার মর্যাদার জন্য, বা ক্ষমা করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের জন্য, যাঁর শাফায়াতপ্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরাই সবচেয়ে হকদার। অথবা পাপ করে ফেলা সাহাবি হয়তো দুনিয়ায় বিপদে পড়েছেন, যার দরুন ওই পাপ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। সুনিশ্চিত সংঘটিত পাপের ক্ষেত্রেই যদি হয় এই কথা, তাহলে সেসব বিষয়ের ব্যাপার কেমন হতে পারে, যেসব ক্ষেত্রে তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন। (ইজতিহাদকারীরা) যদি সঠিকতায় উপনীত হোন, তাহলে তাদের জন্য দুটো নেকি রয়েছে এবং ভুল করলে তাদের জন্য বরাদ্দ হয় একটি নেকি, আর ভুলকে মার্জনা করা হয়।

অধিকন্তু কতিপয় সাহাবির যেসব কাজ প্রত্যাখ্যান করা হয়, এমন কাজের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য, যা সাহাবিদের ভালোকাজ ও মর্যাদার পরিধিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি তাঁদের ইমান, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হিজরত, দ্বীনের সহয়তা,

---

[420] সহিহুল বুখারি, হা. ২৬৫২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৩৩।

[421] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৭৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪১।

ফলপ্রসূ ইলম ও সৎকর্ম। যে ব্যক্তি ইলম ও জাগ্রত জ্ঞান সহকারে সাহাবিদের জীবনচরিত এবং তাঁদের আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা পর্যালোচনা করে, সে সুনিশ্চিত জেনে যায়, নবিগণের পর তাঁরাই সৃষ্টির সেরা। তাঁদের অনুরূপ না কেউ অতীতে ছিল, আর না কেউ ভবিষ্যতে হবে। তাঁরাই এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ, যেই উম্মত সকল উম্মতের মাঝে সেরা এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাভাজন। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

সাহাবিদের অন্তঃকলহে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান হচ্ছে—সাহাবিদের মাঝে যা সংঘটিত হয়েছে, তা কোনো মন্দ অভিপ্রায়ের দরুন নয়, বরং তাঁদেরই দুপক্ষের ইজতিহাদ তথা শরয়ি গবেষণার ভিত্তিতে হয়েছে। এটি সুবিদিত যে, ইজতিহাদকারী (শরিয়তের বিধান জানার জন্য যোগ্য অনুসন্ধানকারী) সঠিকতায় উপনীত হলে তাঁর জন্য দুটো নেকি বরাদ্দ হয়, আর ভুল করলে বরাদ্দ হয় একটি নেকি। সাহাবিদের মাঝে যা ঘটেছে, তা জমিনে বিশৃঙ্খলা ও আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়নি। কেননা সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের পরিস্থিতি উক্ত উদ্দেশ্যকে নাকচ করে দেয়। যেহেতু তাঁরা ছিলেন মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক আকলসম্পন্ন, সবচেয়ে শক্তিশালী ইমানের অধিকারী এবং সবচেয়ে বেশি হকপ্রত্যাশী। যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ».

"আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবিগণ)।"[422]

এরই ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়, সাহাবিদের মাঝে সংঘটিত কলহ বিষয়ে কথা না বলে চুপ থাকা এবং তাঁদের বিষয়কে আল্লাহর কাছে প্রত্যার্পণ করা হলো নিরাপদ পথ। কেননা তাঁদের কারও প্রতি হিংসা বা শত্রুতায় নিপাতিত হওয়া থেকে সবচেয়ে নিরাপদ পথ এটিই।

সাহাবিদের ব্যাপারে বর্ণিত খবরগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান :

কতিপয় সাহাবির দোষত্রুটি সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলো দুই ধরনের। যথা :

এক. বিশুদ্ধ বর্ণনা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাঁরা ওজরগ্রস্ত সাব্যস্ত হবেন। কেননা তাঁদের মাঝে যা ঘটেছে, তা ইজতিহাদের ভিত্তিতেই সংঘটিত হয়েছে। এটি সুবিদিত যে, ইজতিহাদকারী ভুল করলে তার জন্য একটি নেকি বরাদ্দ হয়, আর সঠিকতায় উপনীত হলে বরাদ্দ হয় দুটো নেকি।

[422] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৫১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৩৩।

দুই. অশুদ্ধ বর্ণনা। হয় সেসব বর্ণনা মূলগতভাবেই মিথ্যা, আর নয়তো সেসব বর্ণনা এমন, যেসবে কমবেশি করা হয়েছে এবং বর্ণনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। এই প্রকারের বর্ণনায় তাঁদের কোনোরূপ মানহানি হয় না। কেননা এগুলো বিলকুল প্রত্যাখ্যাত।

সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম কি নিষ্পাপ?

(هل الصحابة معصومون)

সাহাবিগণ সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ নন। বরং সার্বিকভাবে তাঁদের দ্বারা পাপকাজ সংঘটিত হতে পারে, যেমন অন্যদের দ্বারাও পাপকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে মানুষদের মাঝে তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্তির সবচেয়ে নিকটবর্তী। যথা :

১. তাঁরা ইমান ও সৎকর্ম বাস্তবায়ন করেছেন।

২. ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগামিতা ও মর্যাদা আছে। আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, সাহাবিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ।[423]

৩. তাঁদের এমন বড়ো বড়ো পূণ্যকাজ আছে, যা অন্যদের নেই। যেমন বদর যুদ্ধ, বায়াতুর রিদওয়ান প্রভৃতি।

---

[423] সহিহুল বুখারি, হা. ২৬৫২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৩৩।

৪. পাপ থেকে তাঁরা তওবা করেছেন। আর তওবা পূর্বের সব পাপ মাফ করে দেয়।

৫. তাঁদের অনেক পূণ্যকাজ আছে, যা পাপকাজকে মিটিয়ে দেয়।

৬. বালা-মুসিবত, অর্থাৎ মানুষ যেসব বিপদআপদে পতিত হয় (সাহাবিগণও সেসবে নিপাতিত হয়েছেন)। বালা-মুসিবত পাপ মোচন করে দেয়।

৭. মুমিনগণ তাঁদের জন্য দোয়া করেন।

৮. নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত, যাঁর শাফায়াতপ্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরাই সবচেয়ে হকদার।

অধিকন্তু কতিপয় সাহাবির যেসব কাজ প্রত্যাখ্যান করা হয়, সেসব কাজের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য, যা সাহাবিদের ভালোকাজ ও মর্যাদার পরিধিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বস্তুত নবিগণের পর তাঁরাই সৃষ্টির সেরা। তাঁরাই এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ, যেই উম্মত সকল উম্মতের মাঝে সেরা। সাহাবিগণের অনুরূপ না কেউ অতীতে ছিল, আর না কেউ ভবিষ্যতে হবে। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

অলিদের কারামাত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ

(قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء)

মূলপাঠ :

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ، وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ العَادَاتِ، فِي أَنْوَاعِ العُلُومِ وَالمُكَاشَفَاتِ، وَأَنْوَاعِ القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ - كَالمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الأُمَّةِ ـ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে—(আল্লাহর) অলিদের কারামাতকে সত্যায়ন করা। মহান আল্লাহ তাঁদের (অলিদের) কতিপয়ের হাতে যে অলৌকিক বিষয় ঘটান, সেটাই কারামাত; আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞান, কাশফ (আড়ালে সংঘটিত ঘটনা দেখতে পাওয়া), ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে সংঘটিত কারামাত সুরা কাহফ ও অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এই উম্মাতের প্রথম যুগে সাহাবি, তাবিয়ি এবং পরবর্তীতে আগমনকারী উম্মতের সকল যুগের মধ্যে কারামাত প্রকাশিত হয়েছে (যা বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ সূত্রে)। কেয়ামত পর্যন্ত এই উম্মাতের মধ্যে উক্ত কারামাত অবশিষ্ট থাকবে। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা :

অলিদের কারামাত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শ হচ্ছে— আল্লাহর অলিদের কারামাত সুসাব্যস্ত ও বাস্তব। আল্লাহ কুরআনে গুহাবাসী ও অন্যান্যদের যেসব (অলৌকিক) ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং সর্বযুগে সর্বত্র মানুষ যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলোই এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর দলিল। মুতাজিলা সম্প্রদায় এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর বিরোধী হয়েছে এই যুক্তিতে যে, অলিদের কারামত সাব্যস্ত করলে নবির সাথে অলি, আর অলির সাথে জাদুকর মিলে যেয়ে একটি গোলমেলে পরিস্থিতি তৈরি হবে (কে নবি, আর কে অলি, আর কে জাদুকর, সেটা চেনা যাবে না)। দুই দিক থেকে তাদের মতাদর্শকে খণ্ডন করা যায়। যথা :

১. শরিয়ত ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে কারামত একটি সুপ্রমাণিত বিষয়। তাই কারামত অস্বীকার করা অহংকারের শামিল।

২. তারা নবির সাথে অলির মিলে যাওয়ার যে দাবি করেছে, তা সঠিক নয়। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবি আসবে না। আর নবি নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে মুজিযা দিয়ে বলদৃপ্ত করেন। পক্ষান্তরে একজন অলি দাবি করে না, সে একজন নবি।

তদ্রুপ তারা অলির সাথে জাদুকরের মিলে যাওয়ার যে দাবি করেছে, তাও সঠিক নয়। কেননা অলি হলেন পরহেজগার মুমিন ব্যক্তি, কারামতের জন্য কোনো কার্যসম্পাদন ব্যতিরেকেই আল্লাহর তরফ থেকে তার কাছে কারামত আসে, যেই কারামতকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে জাদুকর হলো পথবিভ্রান্ত কাফির, সে জাদুর জন্য যেসব মাধ্যম গ্রহণ করে সেসবের দরুন তৈরি হয় তার জাদুর প্রভাব, আরেকটি জাদু দিয়ে সেই জাদুকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অলি ও কারামতের পরিচয় (الولي ومعنى الكرامة)

প্রত্যেক পরহেজগার মুমিন ব্যক্তিই ***অলি।*** অর্থাৎ যিনি শরিয়তকাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবায়ন করেন।

মহান আল্লাহ স্বীয় দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং তাঁর কোনো অলিকে সম্মাননাপ্রদানের জন্য উক্ত অলির হাতে যে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করেন, সেটাই ***কারামাত।***

কারামতে যেসব ফলপ্রসূ বিষয় রয়েছে

(فوائد الكرامة)

১. আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

২. আল্লাহর দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় এবং সম্মাননা প্রদান করা হয় অলিকে।

৩. অলির ইমান বেড়ে যায় এবং দ্বীনের ওপর তার অটলতা বৃদ্ধি পায়, যেই অলি কিংবা অন্য কারও হাতে কারামত প্রকাশিত হয়েছে।

৪. সংশ্লিষ্ট অলির জন্য কারামত একটি সুসংবাদ।

৫. কারামত সেই রসুলের মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শন) হিসেবে সাব্যস্ত হয়, যেই রসুলের দ্বীন কারামতপ্রাপ্ত অলি আঁকড়ে ধরেছে। কেননা কারামত অলির জন্য এরূপ প্রত্যায়নের মতো যে, এই অলি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কারামত আর মুজিযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— কারামতের প্রকাশ ঘটে অলির জন্য, আর নবির জন্য প্রকাশিত হয় মুজিযা।

কারামত দু প্রকার। যথা :

এক. জ্ঞান ও কাশফের (আড়ালে সংঘটিত ঘটনা দেখতে পাওয়া) মাধ্যমে প্রকাশিত কারামত : অর্থাৎ অলি এমন ইলম প্রাপ্ত

হবেন, যা অন্যরা প্রাপ্ত হয় না। কিংবা তার কাছে অদৃশ্যের এমনসব জিনিস উন্মেচিত হয়ে যাবে, যা অন্য কারও কাছে উন্মোচিত হয় না। যেমন উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তিনি মদিনায় খুতবা দিচ্ছিলেন ইরাকে অবরুদ্ধ একটি সেনাদল প্রসঙ্গে। তিনি মদিনা থেকেই ইরাকের সেই সেনাদলের প্রধান সারিয়া বিন জুনাইমের উদ্দেশে বলেন, 'হে সারিয়া, পাহাড়কে আঁকড়ে ধর (পাহাড়ের পাদদেশে থাক)।' সেনাপ্রধান সারিয়া কথাটি শুনতে পান এবং পাহাড়ে আশ্রয় নেন।[424]

দুই. ক্ষমতা ও প্রভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত কারামত : অর্থাৎ অলি এমন ক্ষমতা ও প্রভাব প্রাপ্ত হবেন, যা অন্য কেউ প্রাপ্ত হয় না। যেমন আলা ইবনুল হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যখন তিনি সাগর অতিক্রমের সময় পানির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন।[425] **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

---

[424] লালাকায়ি, কারামাতুল আউলিয়া, আসার নং : ৬৭, পৃ. ১২০-১২২; লালাকায়ি, শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (*'কারামাতুল আউলিয়া'* বইটি মূলত এই বৃহদাকার গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ), খ. ৭, পৃ. ১৩৩০; সনদ : বিশুদ্ধ (তাহকিক : ইবনু হাজার, সাখাউয়ি, ইবনু কাসির, আলবানি)।

[425] আবু নুয়াইম, ***হিলয়াতুল আউলিয়া***, খ. ১, পৃ. ৭; ইবনু কাসির, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, খ. ৬, পৃষ্ঠা : ১৭২। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "শাইখ উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থের দারসে বলেছেন, 'এ হাদিসের দুর্বলতা আছে; তথাপি ঘটনাটি অবাস্তব নয়, এর বাস্তবতা রয়েছে'।"

আচার-ব্যবহার ও কর্মসম্পাদনে আহলুস সুন্নাহর কর্মপন্থা

(طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم)

মূলপাঠ :

فَصْلٌ: ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ فَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ؛ وَلِهَذَا سُمُّوا: أَهْلَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَسُمُّوا أَهْلَ الجَمَاعَةِ: لِأَنَّ الجَمَاعَةَ هِيَ الِاجْتِمَاعُ، وَضِدُّهَا الفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ «الجَمَاعَةِ» قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ القَوْمِ المُجْتَمِعِينَ. وَالإِجْمَاعُ: هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ فِي العِلْمِ وَالدِّينِ. فَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ - مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ، بَاطِنَةٍ وَظَاهِرَةٍ - مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ. وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الِاخْتِلَافُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ.

فَصْلٌ: ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الأُصُولِ: يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ؛ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ. وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ، وَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ، مَعَ الأُمَرَاءِ - أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا -، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ. وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -»، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى».

وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى البَلَاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ القَضَاءِ. وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا». وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الجِوَارِ، وَالإِحْسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ بِالمَمْلُوكِ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الفَخْرِ، وَالخُيَلَاءِ، وَالبَغْيِ، وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى الخَلْقِ؛ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلَاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا. وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ أَوْ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ.

وَطَرِيقُهُمْ: هِيَ دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ. لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً - وَهِيَ الجَمَاعَةُ -، وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ، هُمْ «أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ». وَفِيهِمْ: الصِّدِّيقُونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ. وَفِيهِمْ: أَعْلَامُ

الهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو المَنَاقِبِ المَأْثُورَةِ، وَالفَضَائِلِ المَذْكُورَةِ. وَفِيهِمُ: الأَبْدَالُ. وَفِيهِمْ: أَئِمَّةُ الدِّينِ، الَّذِينَ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ، وَدِرَايَتِهِمْ - وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، الَّتِي قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». فَنَسْأَلُ اللَّهَ العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ. وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَامُهُ.

পরিচ্ছেদ : এরপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অন্তর্গত হচ্ছে— প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করা, প্রথম সারির অগ্রণী মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের পথ অবলম্বন করা এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উপদেশ মান্য করা। যিনি বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার আদর্শ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের আদর্শ অনুসরণ করবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আঁকড়ে থাকবে। (দ্বীনের মধ্যে) যাবতীয় নবআবিষ্কৃত বিষয় থেকে সাবধান! কারণ প্রত্যেক নবআবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদাত, আর প্রত্যেক বিদাত হলো ভ্রষ্টতা।”[426]

তারা জেনে রাখে, সর্বাধিক সত্য কথা আল্লাহর কথা, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

---

[426] আবু দাউদ, হা. ৪৬০৭, সনদ : সহিহ।

তারা আল্লাহর কথাকে সকল শ্রেণির মানুষের কথার ওপর প্রাধান্য দেয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে অন্য সকল মানুষের আদর্শের ওপর অগ্রগামী রাখে। এজন্য তাদেরকে 'আহলুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী)' এবং 'আহলুল জামাআহ (হকের ওপর ঐক্যবদ্ধ দল)' বলা হয়। কেননা জামাআহ হলো একতা, এর বিপরীত বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। যদিও জামাআহ শব্দটি সরাসরি ঐক্যবদ্ধ দলেরই নাম হয়ে গেছে।

আর ইজমা (উলামাদের মতৈক্য) হলো তৃতীয় মূলনীতি, ইলম ও দ্বীনের ক্ষেত্রে যার ওপর নির্ভর করা যায়। আহলুস সুন্নাহ এই তিনটি মূলনীতির (কুরআন, সুন্নাহ ও মতৈক্য) মাধ্যমে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের এমন যাবতীয় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে ওজন করে থাকে। (আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা সাধারণত) সুশৃঙ্খল ইজমা সেটাই, যার ওপর ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ তাঁদের পরে মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উম্মত বিস্তার লাভ করেছে।[427]

পরিচ্ছেদ : এরপর আলোচ্য মূলনীতিগুলোর পাশাপাশি আহলুস সুন্নাহ শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে থাকে। আর শাসকবর্গ পুণ্যবান হোক, চাই পাপাচারী, তাদের সাথে তারা হজ, জিহাদ, জুমা ও ইদ সম্পাদন করা সিদ্ধ মনে করে। তারা জামাতে নামাজ সম্পাদনে যত্নবান থাকে এবং উম্মতের প্রতি কল্যাণকামী থাকাকে দ্বীন হিসেবে পালন করে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগত কথার মর্মার্থকে বিশ্বাস করে। নবিজি

---

[427] **অনুবাদকের টীকা :** সালাফদের যুগের পরেও ইজমা সংঘটিত হতে পারে, এমনকি বর্তমান যুগেও সংঘটিত হতে পারে বিশুদ্ধ ইজমা। যেমন : ঘড়ি পরা বৈধ, বিমানে করে হজে যাওয়া জায়েজ, হালাল কাজে মোবাইল ব্যবহার করা বৈধ প্রভৃতি বিষয়ে উলামাদের তো বটেই মুসলিম জনসাধারণেরই ইজমা (মতৈক্য) হয়ে গেছে। **টীকা সমাপ্ত।**

বলেছেন, “মুমিন মুমিনের জন্য অট্টালিকা সদৃশ, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এরপর তিনি হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকালেন।”[428]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, “মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানবদেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে জ্বর ও অনিদ্রা।”[429]

আহলুস সুন্নাহ বিপদে ধৈর্য ধরার, সচ্ছলতায় শুকরিয়া করার এবং তিক্ত (মন্দ) ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দেয়। তারা উত্তম চরিত্রমাধুর্য ও ভালো আমলের দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়। তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগত কথার মর্মার্থকে বিশ্বাস করে। নবিজি বলেছেন, “সেই মুমিন ইমানে সর্বাধিক পরিপূর্ণ থাকে, যার চরিত্র হয় সর্বোত্তম।”[430]

তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে (তার হক) প্রদান করতে, যে তোমার প্রতি জুলুম করেছে তাকে মাফ করতে আহ্বান জানায় ও উৎসাহ দেয় আহলুস সুন্নাহ। তারা পিতামাতার সাথে সদাচরণ, আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা, প্রতিবেশির সাথে উত্তম আচরণ, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন এবং ক্রীতদাসের প্রতি কোমল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। তারা কথা ও

---

[428] সহিহুল বুখারি, হা. ৬০২৬।

[429] সহিহুল বুখারি, হা. ৬০১১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৮৬।

[430] আবু দাউদ, হা. ৪৬৮২; তিরমিজি, হা. ১১৬২; সনদ : হাসান সহিহ।

কাজে অহংকার করা, সীমালঙ্ঘন করা, নিজের অধিকারের দাবিতে হোক কিংবা অন্যায়ভাবে হোক মানুষদের চেয়ে নিজেকে উঁচু মনে করার মতো বিষয়াদি থেকে নিষেধ করে থাকে।

আর তারা সর্বোত্তম চরিত্রবৈশিষ্ট্যের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ চরিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে নিষেধ করে। উল্লিখিত বিষয়-সহ অন্যান্য যা কিছুই তারা বলে ও করে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে তারা কিতাব ও সুন্নাহরই অনুসরণ করে। তাদের আদর্শ মূলত দ্বীনে ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানালেন, তাঁর উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। একটি বাদে সবগুলো জাহান্নামে যাবে। সেই (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলটি হলো— আল-জামাআত (সাহাবিদের আদর্শের ওপর ঐক্যবদ্ধ দল)।[431] অন্য হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি ও আমার সাহাবিগণ আজকের দিনে যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত (তার ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা)।"[432]

যখন এসব বিষয় জানালেন, তখন নির্ভেজাল খাঁটি ইসলামের ধারক ও বাহকরাই হয়ে গেল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। যাদের মধ্যে আছে সিদ্দিক, শহিদ ও সৎব্যক্তিবর্গ। হেদায়েতের উলামা, অন্ধকারের আলোকবর্তিতা, হাদিসে বর্ণিত মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মাঝে রয়েছেন আবদাল (ইলম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বান্দাবর্গ) এবং দ্বীনের ইমামগণ, যাঁদের হেদায়েতপ্রাপ্তি ও জ্ঞানগরিমার ব্যাপারে

---

431 আবু দাউদ, হা. ৪৫৯৭; তিরমিজি, হা. ২৬৪০; ইবনু মাজাহ, হা. ১৩২২; সনদ : সহিহ।

432 তিরমিজি, হা. ২৬৪১, সনদ : হাসান।

মুসলিমরা একমত পোষণ করেছে। তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত দল, যাঁদের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ওপর সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কেয়ামত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়া অবধি তারা ওইভাবেই থাকবে।"[433]

আমরা আল্লাহর কাছে চাইছি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে যেন বক্র না করেন এবং তাঁর নিকট আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করেন। নিশ্চয় তিনি পরম ও মহান দাতা। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। হে আল্লাহ, নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবৃন্দ ও সাহাবিবর্গের জন্য ধার্য করুন অজস্র সালাত ও সালাম। **মূলপাঠ সমাপ্ত।**[434]

ব্যাখ্যা :

আচার-ব্যবহার ও কর্মসম্পাদনে আহলুস সুন্নাহর কর্মপন্থা হচ্ছে—

প্রথমত, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করা, প্রথম সারির অগ্রণী মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের পথ অবলম্বন করা; রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা মান্য করে, যিনি বলেছেন,

---

[433] সহিহ মুসলিম, হা. ১৯২০, *'প্রশাসন ও নেতৃত্ব'* অধ্যায় (৩৪), পরিচ্ছেদ : ৫৩।

[434] মূল কিতাব তথা আকিদা ওয়াসিতিয়্যা এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। – ***অনুবাদক।***

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ».

"তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার আদর্শ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের আদর্শ অনুসরণ করবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আঁকড়ে থাকবে। (দ্বীনের মধ্যে) যাবতীয় নবআবিষ্কৃত বিষয় থেকে সাবধান! কারণ প্রত্যেক নবআবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদাত, আর প্রত্যেক বিদাত হলো ভ্রষ্টতা।"[435]

সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণ তাঁরা, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্য থেকে যাঁরা ইলম, ইমান ও হকের দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এই বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত হলেন খলিফা চতুষ্টয়– আবু বকর, উমার, উসমান ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

দ্বিতীয়ত, শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় ভালো বিষয়ের আদেশ করা এবং খারাপ বিষয় থেকে নিষেধ করা। শরিয়তে যে বিষয়ের সৌন্দর্য বিদিত হয়েছে, সেটাই ভালো বিষয়। আর শরিয়তে যে বিষয়ের

---

[435] আবু দাউদ, হা. ৪৬০৭, সনদ : সহিহ।

কদর্যতা বিদিত হয়েছে, সেটাই খারাপ বিষয়। সুতরাং শরিয়তপ্রণেতা যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাই ভালো, আর যে বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, সেটাই মন্দ।

তবে ভালোকাজের আদেশ দেওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যথা :

১. কোন বিষয়টি ভালো, আর কোন বিষয়টি মন্দ, এ কাজের দায়িত্বগ্রহণকারীকে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

২. এ কাজের দরুন নিজের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকা যাবে না।

৩. এ কাজের ফলে সৃষ্টি হওয়া চলবে না কোনো বড়ো ধরনের অনিষ্ট।

তৃতীয়ত, (মুসলিম) শাসকবর্গের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া। আর শাসকরা পুণ্যবান হোক, চাই পাপাচারী, তাদের সাথে হজ, জিহাদ, জুমা ও ইদ সম্পাদন করাকে সিদ্ধ মনে করা। শাসকরা যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানির নির্দেশ না দিচ্ছে, ততক্ষণ তাদেরকে মেনে নেওয়া এবং তাদের আনুগত্য করা (আর অন্যায় কাজের নির্দেশ দিলেও বাকিক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের আনুগত্য করতে হবে)।

চতুর্থত, উম্মতের প্রতি কল্যাণকামী থাকা এবং মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যের প্রসার ঘটানো। নবি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বাস্তবায়ন করে তারা এ কাজ করে থাকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».

"মুমিন মুমিনের জন্য অট্টালিকা সদৃশ, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এরপর তিনি হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকালেন।"[436]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

"মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানবদেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে জ্বর ও অনিদ্রা।"[437]

পঞ্চমত, উত্তম চরিত্রমাধুর্য ও ভালো আমলের দিকে মানুষদের আহ্বান করা। যেমন সত্যপরায়ণতা, সদাচরণ, সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ, নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া করা, বিপদে ধৈর্য ধরা, প্রতিবেশি ও বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা-সহ অন্যান্য প্রশংসনীয়

---

[436] সহিহুল বুখারি, হা. ৬০২৬।

[437] সহিহুল বুখারি, হা. ৬০১১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৮৬।

চরিত্রবৈশিষ্ট্য, যেগুলো শরিয়তে ও প্রথাগতভাবে ভালো চরিত্র হিসেবে সুসাব্যস্ত।

ষষ্ঠত, মন্দ চরিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে নিষেধ করা। যেমন মিথ্যাপরায়ণতা, পিতামাতার অবাধ্যতা, সৃষ্টিকুলের সাথে দুর্ব্যবহার করা, আল্লাহর ফায়সালার প্রতি নারাজ হওয়া, নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা, প্রতিবেশি ও বন্ধুবান্ধবের সাথে দুর্ব্যবহার করা-সহ অন্যান্য নিন্দনীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য, যেগুলো শরিয়তে ও প্রথাগতভাবে মন্দ চরিত্র হিসেবে সুসাব্যস্ত।

মানুষের আকিদা, আমল ও চরিত্রকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত যেসব বিষয়ের মাধ্যমে ওজন করে

(الأمور التي يزن بها أهل السنة ما كان عليه الناس)

মানুষের আকিদা, আমল ও চরিত্রকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত যেসব বিষয়ের মাধ্যমে ওজন করে, সেগুলো হলো— কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা (উলামাদের মতৈক্য)। কিতাব হচ্ছে কুরআন। সুন্নাহ হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদন। আর ইজমা হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

পরে কোনো শরয়ি বিধানের ব্যাপারে এই উম্মতের মুজতাহিদ উলামাগণের একমত হওয়া। (আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা সাধারণত) সুশৃঙ্খল ইজমা সেটাই, যার ওপর ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ তাঁদের পরে মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উম্মত বিস্তার লাভ করেছে।

লেখক (ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ) কিয়াসের কথা বলেননি। কেননা কিয়াসের বিষয়টি উল্লিখিত তিনটি মৌলিক দলিলের কাছেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

সিদ্দিক, শহিদ, সৎব্যক্তি ও আবদাল যারা

(الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال)

যিনি স্বীয় বিশ্বাস, কথা ও কাজে সত্যপরায়ণ এবং সত্যকে সত্যায়নকারী তিনি হলেন **সিদ্দিক।**

যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন, তিনি হলেন শহিদ। কারও মতে, একেকজন আলিম হলেন **শহিদ।**

সৎকর্ম সম্পাদনের দরুন যার অন্তর পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৎকর্মশীল হয়েছে, তিনি হলেন **সৎব্যক্তি।**

যারা দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা আর দ্বীনের প্রতিরক্ষা নিমিত্তে একজন অপরজনের পর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আসতে থাকেন, তাঁরা হলেন **আবদাল।** তাঁদের একজন যখন বিদায় হন, তখন আরেকজন তাঁর বদলে তদস্থলে স্থলাভিষিক্ত হন। উল্লিখিত চার শ্রেণির লোকই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি সাহায্যপ্রাপ্ত দল এবং কেয়ামত প্রতিষ্ঠার প্রকৃত মর্মার্থ

(الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة والمراد بقيامها)

সাহায্যপ্রাপ্ত দল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, যাঁদের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لاَ يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى يَأْتِيَ أَمرُ اللهِ».

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ওপর সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর নির্দেশ আসা অবধি তারা ওইভাবেই থাকবে।"[438]

[438] সামান্য শব্দের পরিবর্তনে : সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩১১; সহিহ মুসলিম, হা. ১৯২০-১৯২১, *'প্রশাসন ও নেতৃত্ব'* অধ্যায় (৩৪), পরিচ্ছেদ : ৫৩।

অন্য বর্ণনায় আছে,

«حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

“এমনকি কেয়ামত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়া অবধি তারা ওইভাবেই থাকবে।”[439]

হাদিসে কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া বলতে উদ্দেশ্য— কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়কাল। আমরা এই শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যা করছি এজন্য, যাতে করে উল্লিখিত হাদিসটির সাথে নিম্নোক্ত হাদিসের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكْهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ».

“যাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘটিত হবে, তারা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।”[440]

নবিদের পরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লোকেরাই সৃষ্টির সর্বসেরা। সুতরাং তাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে চাইছি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে

---

[439] সহিহ মুসলিম, হা. ১৯২২।

[440] সহিহুল বুখারি, হা. ৭০৬৭; সহিহ মুসলিম, হা. ২৯৪৯।

যেন বক্র না করেন এবং তাঁর নিকট আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করেন। নিশ্চয় তিনি পরম ও মহান দাতা। হে আল্লাহ, আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবৃন্দ ও সমগ্র সাহাবিবর্গের জন্য ধার্য করুন সালাত ও সালাম। **ব্যাখ্যা সমাপ্ত।**

সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদক ও টীকাকারের উল্লেখযোগ্য প্রমাণপঞ্জি

(من أبرز مراجع الترجمة والتحشية)

আরবি গ্রন্থপঞ্জি ও উৎসবিবরণী (المصادر والمراجع العربية) :

১. আল-কুরআনুল কারিম

২. আবু আব্দুর রহমান আল-খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি (মৃ. ১৭০ হি.)। ***আল-আইন।*** তাহকিক : মাহদি আল-মাখজুমি ও ইবরাহিম সামুর্রায়ি। দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি(মৃ. ২৪১ হি.)। ***আল-মুসনাদ।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***আস-সহিহ।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

৫. আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-নাইসাবুরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.)। ***আস-সহিহ।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু মাজাহ আল-কাজবিনি (মৃ. ২৭৩ হি.)। ***আস-সুনান।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

৭. আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি (মৃ. ২৭৫ হি.)। ***আস-সুনান।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

৮. আবু ইসা আত-তিরমিজি (মৃ. ২৭৯ হি.)। ***আল-জামি।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

৯. আহমাদ বিন শুয়াইব আন-নাসায়ি (মৃ. ৩০৩ হি.)। ***আল-মুজতাবা।*** অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

১০. আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনু জারির আত-তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.)। ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

১১. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি (মৃ. ৩৭০ হি.)। ***তাহজিবুল লুগাহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইওয়াদ মুরয়িব। বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।

১২. আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু ফারিস আর-রাজি (মৃ. ৩৯৫ হি.)। ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ।*** তাহকিক : আব্দুস সালাম হারুন। দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

১৩. আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু ফারিস আর-রাজি (মৃ. ৩৯৫ হি.)। ***আস-সাহিবি ফি ফিকহিল লুগাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়া মাসায়িলিহা।*** বৈরুত : মাকাতাবাতুল মায়ারিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

১৪. হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আল-লালাকায়ি (মৃ. ৪১৮ হি.), ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।*** তাখরিজ : আবু ইয়াকুব নাশআত বিন কামাল আল-মিসরি। আলেকজেন্দ্রিয়া : মাকতাবাতু দারিল বাসিরা, তাবি।

১৫. মুওয়াফফাকুদ্দিন ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি (মৃ. ৬২০ হি.)। ***জাম্মুত তাউয়িল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন হামিদ। আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল বাসিরা।

১৬. মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আর-রাজি (মৃ. ৬৬০ হি.)। ***মুখতারুস সিহাহ।*** বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান।

১৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আর-রাদি আল-ইস্তিরবাজি (মৃ. ৬৮৩ হিজরির পরে)। ***শারহু কাফিয়াতি ইবনিল হাজিব।*** রিয়াদ : কিং ফাহাদ ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

১৮. মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররাম ইবনু মানজুর আল-আনসারি (মৃ. ৭১১ হি.)। ***লিসানুল আরব।*** কায়রো : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ : ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.।

১৯. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***মাজমুউ ফাতাওয়া।*** সংকলন : আব্দুর রাহমান ইবনু কাসিম। মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

২০. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা।***

তাহকিক : দাগাশ বিন শাবিব আল-আজমি। কুয়েত : মাকতাবাতু আহলিল আসার, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

২১. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা।*** তাহকিক : ড. আলাবি আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ। সৌদি আরব : মুআসসাসাতুদ দুরারিস সানিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হিজরি।

২২. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.), ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা।*** তাহকিক : আবু মুহাম্মাদ আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ। রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

২৩. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি। ***আল-ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যাহ আল-কুবরা।*** তাহকিক : হামাদ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুওয়াইজিরি। রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

২৪. আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ।*** বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি।

২৫. আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.), ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

২৬. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ফায়্যুমি (মৃ. ৭৭০ হি.), ***আল-মিসবাহুল মুনির ফি গারিবিশ শারহিল কাবির।*** তাহকিক : ড. আব্দুল আজিম। কায়রো : দারুল মায়ারিফ, ২য় প্রকাশ, তাবি।

২৭. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ (মৃ. ১৩৮৯ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** সংকলন ও বিন্যাস : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম। ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হিজরি।

২৮. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.)। ***সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়ায়িদিহা।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মায়ারিফ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

২৯. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুমাদাল উলা, ১৪২১ হিজরি।

৩০. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন। ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল।*** রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১৪১৩ হিজরি।

৩১. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন। ***আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।*** ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হিজরি।

৩২. মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি (মৃ. ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.)। ***তুহফাতুল মুজিব আলা আসইলাতিল হাদিরি ওয়াল গারিব।*** ইয়েমেন : দারুল আসার, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৩৩. জাইদ বিন আব্দুল আজিজ আল-ফাইয়্যাদ (মৃ. ১৪১৬ হি.)। ***আর-রাওদাতুন নাদিয়্যা শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুল আলুকা, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি.।

৩৪. আব্দুল আজিজ বিন নাসির আর-রাশিদ (মৃ. ১৪০৮ হি.)। ***আত-তাম্বিহাতুস সানিয়্যা আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুর রাশিদ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৩৫. আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক (জ. ১৩৫২ হি.)। ***তাওদিহু মাকাসিদিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** প্রকাশনার নাম ও তারিখবিহীন সফটকপি।

৩৬. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বাদর (জ. ১৩৫৩ হি.)। ***শারহু সুনানি আবি দাউদ।*** শারহের দারসগুলোর ট্রান্সক্রিপ্ট তথা প্রতিলিপি, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট কম।

৩৬. সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান (জ. ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.)। ***আত-তালিকুল মুখতাসার আলাল কাসিদাতিন নুনিয়্যাহ।*** প্রকাশনার নাম ও তারিখবিহীন সফটকপি।

৩৭. আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি (জ. ১৩৬০ হি.)। ***আন-নাফাহাতুল মিসকিয়্যা ফিত তালিকি আলাল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুত তাওহিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.।

৩৮. শামসুদ্দিন আল-আফগানি (জন্ম-মৃত্যু : ১৩৭২-১৪২০ হি.)। ***আল-মাতুরিদিয়্যা ওয়া মাওকিফুহুম মিন তাওহিদিল আসমা ওয়াস সিফাত।*** তায়েফ : মাকতাবাতুস সিদ্দিক, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

৩৯. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ (জ. ১৩৭৮ হি.)। ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা ফি শারহিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** তাহকিক : আদিল বিন মুহাম্মাদ মুরসি রিফায়ি। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.।

৪০. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৭৮ হি.)। ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা।*** তাহকিক : আদিল বিন মুহাম্মাদ মুরসি রিফায়ি। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হিজরি।

৪১. আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর (জ. ১৩৮২ হি./১৯৬৩ খ্রি.)। ***ফিকহুল আসমা ওয়াস সিফাত।*** রিয়াদ : দারুত তাওহিদি ওয়ান নাশর, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.।

৪২. আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর (জ. ১৩৮২ হি./১৯৬৩ খ্রি.)। ***জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া নুকসানুহু ওয়া হুকমুল ইসতিসনায়ি ফিহ।*** রিয়াদ : দারু কুনুজি ইশবিলিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.।

৪৩. আব্দুল মুহসিন আল-কাসিম (জ. ১৩৮৮ হি.)। ***মুতুনু তালিবিল ইলম (মুস্তাওয়া সালিস/তৃতীয় ভাগ)।*** ৩য় প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৪৪. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি (জ. ১৩৯১ হি.)। ***তাকরিরাতুশ শাইখ সালিহ আল-উসাইমি আলা মুজাক্কিরাতিল ওয়াসিতিয়্যা লিল আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনি উসাইমিন (আল-মাজলিসুস সানি)।*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : মারকাজুদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ বিদ দাওয়াদিমি, দারস

আপলোডের তারিখ : ২২শে এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, এডুকেশনাল ভিডিয়ো।

৪৫. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা / বারনামাজু মুহিম্মাতিল ইলম ১৪৪২ / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি।*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, দারস আপলোডের তারিখ : ২২শে এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, এডুকেশনাল ভিডিয়ো।

৪৬. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি। ***মুকার্রারাতু বারনামাজি মুহিম্মাতিল ইলম ফিল মাসজিদিন নাবাবিয়্যিশ শারিফ (মারহালা উলা/প্রথম স্তর)।*** ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

৪৭. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আস-সিন্ধি (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** মসজিদে নববিতে কৃত ভাষ্যের প্রথম প্রতিলিপি (প্রকাশনার নামবিহীন সফটকপি)।

৪৮. আব্দুল আজিজ আর-রাইস (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***আল-ইনতিসার ফি হুজ্জিয়্যাতি কওলিস সাহাবাতিল আখয়ার।*** মদিনা : দারুল ইমাম মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হিজরি।

৪৯. খালিদ বিন আলি আল-গামিদি (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***নাকদু আকায়িদিল আশায়িরা ওয়াল মাতুরিদিয়া।*** রিয়াদ : দারু আতলাসিল খাদরা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।

৫০. ইসাম বিন আব্দুল মুনয়িম। ***আদ-দুররুস সামিন ফি তারজামাতি ফাকিহিল উম্মাতিল আল্লামা ইবনি উসাইমিন।*** আলেকজান্দ্রিয়া, দারুল বাসিরা, তাবি।

৫১. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা পর্ষদ। ***আল-মুজামুল ওয়াসিত।*** কায়রো : মাকতাবাতুশ শুরুক আদ-দুওয়ালিয়্যা, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি (المراجع البنغالية) :

১. বাংলা একাডেমী, ***ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।*** ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

পরিশিষ্ট[441]

আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন, ওঠেছেন, স্থায়ী অবস্থান নিয়েছেন এবং সমাসীন হয়েছেন

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যাঁর করুণা ও দয়া অশেষ অপার। যাবতীয় প্রশংসা নিবেদন করছি জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যিনি বলেছেন, "হক এসেছে, আর বাতিল অপসৃত হয়েছে; বাতিল তো অপসৃত হওয়ারই ছিল।"[442]

শতসহস্র সালাত ও সালাম ধার্য হোক প্রাণাধিক প্রিয় নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর প্রতি। যিনি বলেছেন, "তুমি হক (সত্য) বল, যদিও তা তিক্ত হয়।"[443] অন্যত্র বলেছেন, "তুমি হক বল, যদিও তা তোমার নিজের বিরুদ্ধে যায়।"[444]

---

[441] এখান থেকে অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত প্রবন্ধ শুরু হয়েছে।

[442] আল-কুরআনুল কারিম, ১৭ (সুরা বানি ইসরাইল) : ৮১।

[443] সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, হা. ২২৩৩, সনদ : সহিহ লি গাইরিহি।

[444] সিলসিলা সহিহা, হা. ১৯১১, সনদ : সহিহ।

পূর্বাভাস

আমি একটি *‘ওজরনামা’* নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। হাজির হয়েছি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। ঘটনাটির সূত্রপাত আমার একটি বই নিয়ে। বইটিতে আল্লাহর কর্মগত গুণ *‘ইস্তিওয়া আলাল আরশ (আরশের ওপর আরোহণ)’* নিয়ে আলোচনা রয়েছে। *‘ইস্তিওয়া’* শব্দের চারটি অর্থ উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে *‘ইস্তিওয়া’* শব্দের অনুবাদ নিয়ে আপত্তি আর অভিযোগ-সমালোচনা শুরু হয়। জনৈক সম্মাননীয় দায়ির সাথে এ বিষয়ে আমার কথা হলে তিনি আমাকে আমার কৃত অনুবাদ পরিবর্তন করতে বলেন। আমি তাঁর সম্মান-মর্যাদা এবং আমার সামান্য দাওয়াতি পরিমণ্ডলের কথা চিন্তা করে জনমানুষের মাঝে জানিয়ে দিই, আমার অনুবাদ ভুল। সঠিক অনুবাদ কেবল— *‘ওপরে ওঠেছেন।’*

ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। আমার একাধিক সম্মাননীয় শিক্ষাগুরু উস্তাজ আমাকে বলেন, তুমি এভাবে ভুল সংশোধন করে ঠিক করোনি। কারণ তোমার এ অনুবাদ আরও অনেক বাঙালি আহলেহাদিস দায়ি করে থাকেন। বিষয়টি আমার অজানা ছিল না, তবুও আমি নিজেকে নির্দ্বিধায় ছোটো করেছিলাম। আর আমি ছোটোই, কেউকেটা জাতীয় কেউ নই। নইলে আমাকে এ জাতীয় লেখা আজ লিখতে হতো না। আমি আমার ছোটো ভাইদের নিয়ে

আকিদার বইপুস্তক পড়ি। তারা আমাকে ভুল সংশোধনের ঘোষণাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। সেসময় আমার পরিস্থিতিটা মোটেও সুখকর ছিল না।

পরে আমি যখন আকিদা বিষয়ে শাইখ ইবনু উসাইমিন বিরচিত *‘আকিদা ওয়াসিতিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা’* শিরোনামের বইটি অনুবাদ করি, তখন সেই একই বিষয়ে গিয়ে আটকে যাই। *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ।[445] সেখানে লেখা আছে, সালাফগণ আরবিতে চারটি অর্থ করেছেন। বাংলাতে সেসব শব্দের অর্থ করার মতো অনেকগুলো উপযুক্ত শব্দ আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্রেফ একটি শব্দ *‘ওঠেছেন’* ব্যবহার করতে হবে! বিষয়টিকে অদ্ভুত বোধ হয়। আমি চারটি আরবি অর্থের জন্য চারটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করি। চিন্তা হয়, আবার না ঝামেলায় পড়ি। সেজন্য দাওয়াতের পথকে নির্বিঘ্ন করার নিমিত্তে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ লিখতে সচেষ্ট হই। ওয়াল্লাহি, কারও পেছনে লাগার কুবাসনা অন্তরে রাখিনি। আমরা যে দাওয়াতের পথে হেঁটেছি, সে পথে যেন বিঘ্ন না ঘটে, কেবল এরই জন্য আমার মূল্যবান সময় ব্যয় করলাম এই নিবন্ধ প্রণয়ন করতে। দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের কাজকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করেন এবং মঞ্জুর করে নেন তাঁর শাহী দরবারে। আর

---

445 *‘ইস্তাওয়া’* ক্রিয়ার মাসদার তথা ক্রিয়ামূল হলো *‘ইস্তিওয়া’।* আমাদের লেখায় বিভিন্ন সময় ক্রিয়া ও ক্রিয়ামূল দুটোই ব্যবহৃত হয়েছে। আশা করি, পাঠক মহোদয় বিষয়টি বুঝে নিয়ে পড়বেন। – ***প্রাবন্ধিক।***

এখানে আমি আলোচ্য শব্দের যেই অর্থগুলো সাব্যস্ত করছি, কেবল সেগুলোই আমার বক্তব্য হিসেবে আমার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে; এই প্রবন্ধের বিপরীতে যেসব শব্দ বা কথা ইতঃপূর্বে আমি বলেছি সবগুলো থেকে আমি ফিরে এসেছি। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

আলোচ্য নিবন্ধে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা একনজরে দেখে নিই। **প্রথমত,** সালাফদের ব্যাখ্যায়— *'ইস্তিওয়া আলাল আরশ (আরশের ওপর আরোহণ)'* গুণের অর্থ কী, তা বলা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** যথাক্রমে আরোহণ করেছেন, ওঠেছেন, চড়েছেন, স্থায়ী হয়েছেন এবং বসেছেন – এই পাঁচটি অর্থ রেফারেন্স-সহ সালাফদের থেকে বিবৃত করা হয়েছে। **তৃতীয়ত,** আরোহণ করেছেন এবং চড়েছেন বললে মাখলুকের সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য দেওয়া হয় কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **চতুর্থত,** *'ইস্তাওয়া'* শব্দের অনুবাদ হিসেবে *'আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন'* – বলার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে।

পঞ্চমত, *'ইস্তাওয়া'* শব্দের অনুবাদ হিসেবে *'আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন'* – বলা যাবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **ষষ্ঠত,** যেসব সালাফি বিদ্বানের বক্তব্যে এসেছে *'আল্লাহ বসেছেন'*, তা প্রমাণ-সহ পেশ করা হয়েছে। এটা এই নিবন্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। **সপ্তমত,** বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের ফলাফল আলোচনা করা

হয়েছে। **অষ্টমত,** নিবন্ধের প্রমাণপঞ্জি উল্লিখিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটেছে এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের। আল্লাহ আমাদের এ কাজকে কবুল করুন। আমিন।

সালাফদের ব্যাখ্যায়— *'ইস্তিওয়া আলাল আরশ (আরশের ওপর আরোহণ)'*

মহান আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ— আল-ইস্তিওয়া আলাল আরশ তথা আরশের ওপর আরোহণ। এটি আল্লাহর কর্মগত গুণ, যা তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ইচ্ছা করেছেন বিধায় আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে।[446]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾.

[446] **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআনুল কারিম, ২০ (সুরা তহা) : ৫; ৭ (সুরা আরাফ) : ৫৪; ১০ (সুরা ইউনুস) : ৩; ১৩ (সুরা রাদ) : ২; ২৫ (সুরা ফুরকান) : ৫৯; ৩২ (সুরা সাজদা) : ৪; ৫৭ (সুরা হাদিদ) : ৪; মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যা আলা হারবিল মুয়াত্তিলাতি ওয়াল জাহমিয়্যা,*** তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি (রিয়াদ ও বৈরুত : দারু আতাআতিল ইলম ও দারু ইবনি হাজম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১২৭; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***মুখতাসারুল উলু লিল আলিয়্যিল আজিম*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৭১।

“দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া (আরোহণ) করেছেন।”[447]

এ আয়াত-সহ অপরাপর আয়াতগুলোতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ কী? আমাদের সালাফি উলামাগণের বিবরণ অনুযায়ী সালাফদের থেকে *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। অর্থগুলো হলো— عَلَا وَارْتَفَعَ وَصَعِدَ وَاسْتَقَرَّ وجَلَسَ। প্রতিটি অর্থের রেফারেন্স আমরা সামনে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ। প্রদত্ত শব্দ পাঁচটিকে আমরা বাংলায় অনুবাদ করতে পারি এভাবে— আরোহণ করেছেন, ওঠেছেন, চড়েছেন, স্থায়ী হয়েছেন এবং বসেছেন। উল্লিখিত শব্দগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থ, অর্থাৎ *আলা*, *ইরতাফাআ* ও *সয়িদা* – এর মর্মার্থ একই।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لكن علا وارتفع وصعد : معناها واحد، وأما استقر؛ فهو يختلف عنها.

“*আলা*, *ইরাতাফাআ* ও *সয়িদা*-র অর্থ একই। আর *ইসতাকার্রা* – শব্দের অর্থ আলাদা।”[448]

---

[447] আল-কুরআনুল কারিম, ২০ (সুরা তহা) : ৫।

[448] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হিজরি), খ. ১, পৃ. ৩৭৫।

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

فأما علا وارتفع وصعد فمعناها متقارب، وأما الاستقرار فشيء زائد على العلو.

“*আলা, ইরাতাফাআ* ও *সয়িদা* – শব্দগুলো কাছাকাছি অর্থবোধক। আর *ইসতাকার্রা*– শব্দটি আরোহণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ জ্ঞাপন করে।”[449]

আমরা ইস্তাওয়া শব্দের যে পাঁচটি অর্থ উল্লেখ করেছি, একটি একটি করে সবগুলোর প্রমাণ সালাফদের থেকে এবং সেসবের সঠিক বাংলা অর্থ প্রাজ্ঞ ভাষাবিদদের থেকে পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

❑ প্রথম অর্থ– আরোহণ করেছেন (عَلَا) :

ইস্তাওয়া শব্দের এই অর্থ করেছেন তাবেয়ি ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৩ হি.), ইমাম আবুল আব্বাস সালাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯১ হি.), ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.)।[450]

---

[449] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া*** (মুআসসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিজরি), খ. ২, পৃ. ১৫৬।

[450] সহিহুল বুখারি, *তাওহিদ* অধ্যায় (৯৭), পরিচ্ছেদ : ২২, হা. ৭৪১৮ – এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ***, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯-৪০০; তাফসিরুত তাবারি, খ. ১, পৃ. ৪২৯-৪৩০।

❑ **দ্বিতীয় অর্থ– ওঠেছেন (اِرْتَفَعَ) :**

ইস্তাওয়া শব্দের এই অর্থ করেছেন তাবেয়ি ইমাম আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৩ হি.), তাবেয়ি হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১০ হি.), রাবি বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪০ হি.) প্রমুখ।[451]

❑ **তৃতীয় অর্থ– চড়েছেন (صَعِدَ) :**

ইস্তাওয়া শব্দের এই অর্থ করেছেন সাইয়্যিদুনা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (মৃ. ৮৪ হি), ইমাম আবু উবাইদা মামার ইবনুল মুসান্না রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৯ হি.) প্রমুখ।[452]

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমার সদ্য অনূদিত এক গ্রন্থে প্রদত্ত একটি নাতিদীর্ঘ টীকা এখানে উল্লেখ করছি।

সালাফদের থেকে *'ইস্তাওয়া'* শব্দের যেই চারটি অর্থ প্রমাণিত হয়েছে, ক্রিয়ামূল হিসেবে সেই চারটি অর্থের শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ। আর ক্রিয়া হিসেবে শব্দগুলো হবে এমন— عَلَا وَارْتَفَعَ وَصَعِدَ وَاسْتَقَرَّ। জনৈক সম্মাননীয় দায়ি আমাকে বলেছেন, *'সয়িদা'* শব্দটিকে *'সাআদা'* পড়তে হবে। তাঁর

---

451 সহিহুল বুখারি, *তাওহিদ* অধ্যায় (৯৭), পরিচ্ছেদ : ২২, হা. ৭৪১৮ – এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; তাফসির ইবনি আবি হাতিম, বর্ণনা নং : ৩০৮, খ. ১, পৃ. ৭৫; তাফসিরুত তাবারি, খ. ১, পৃ. ৪২৯-৪৩০; জাহাবি, ***কিতাবুল আরশ,*** খ. ২, পৃ. ৯-১০।

452 বাইহাকি, ***আসমা ওয়াস সিফাত,*** বর্ণনা : ৮৭১, খ. ২, পৃ. ৩১০; তাফসিরুল বাগাউয়ি, খ. ২, পৃ. ১৯৭; জাহাবি, ***কিতাবুল আরশ***, খ. ২, পৃ. ১০-১১।

ভাষ্য অনুযায়ী, *'সয়িদা'* শব্দের আইন বর্ণে জের দিয়ে 'সয়িদা' পড়া ভুল। এজন্য তিনি নিজেও তাঁর বক্তব্যে আইন বর্ণে জবর দিয়ে শব্দটিকে 'সাআদা' পড়ে থাকেন। যদিও আমি আমার উস্তাজগণের কাছে 'সয়িদা' পড়তে শিখেছি এবং আরবের বড়ো বড়ো শাইখের দারসেও আমি তাঁদেরকে এমনটিই বলতে শুনেছি। তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য সঠিক পড়া কোনটি, তা আমি কয়েকটি বিশ্বনন্দিত আরবি অভিধান থেকে তুলে ধরছি। প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আর-রাযি তাঁর সংকলিত বিখ্যাত অভিধান 'মুখতারুস সিহাহ' গ্রন্থে বলেছেন,

صَعِدَ في السلّم بالكَسْر.

"সয়িদা ফিস সুল্লামি (সে সিঁড়িতে চড়ল), আইন বর্ণে জের দিয়ে পড়তে হয়।"[453]

প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ফায়্যুমি রাহিমাহুল্লাহ তদীয় *'মিসবাহুল মুনির'* গ্রন্থে বলেছেন,

صعِد في السلّم والدرجة (يصعَد) من باب تَعِبَ.

[453] মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আর-রাজি, ***মুখতারুস সিহাহ*** (বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, তাবি), পৃ. ১৫২।

“সয়িদা ফিস সুল্লামি ওয়াদ দারাজাহ (সে সিঁড়িতে ও ধাপে চড়ল), *সয়িদা* শব্দটি *‘তায়িবা’* শব্দের শ্রেণিভুক্ত (অর্থাৎ আইন বর্ণে জের দিয়ে পড়তে হবে)।”[454]

এতদ্‌ব্যতীত আমার হাতের কাছে সুবৃহৎ আরবি অভিধান ইবনু মানযুর বিরচিত লিসানুল আরবের এবং আধুনিক আরবি অভিধান মুজামুল ওয়াসিতের যে কপি আছে, সেসবেও *‘সয়িদা’* শব্দটিকে আইন বর্ণে জের দিয়ে *‘সয়িদা’* লেখা হয়েছে।[455] এমনকি আমার জানামতে বাংলাদেশে যেসব আরবি-বাংলা অভিধান পাওয়া যায়, সেসবেও *‘সাআদা’* না লিখে *‘সয়িদা’* লেখা হয়ে থাকে। সুতরাং আমার ব্যক্তীকৃত *‘সয়িদা’* উচ্চারণ নিঃসন্দেহে সঠিক। আর আল্লাহই সম্যক অবগত। **টীকা সমাপ্ত।**

---

[454] আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ফায়্যুমি, ***আল-মিসবাহুল মুনির***, তাহকিক : আব্দুল আজিম (কায়রো : দারুল মায়ারিফ, ২য় প্রকাশ, তাবি), পৃ. ৩৪০।

[455] **দ্রষ্টব্য :** লিসানুল আরব, খ. ২, পৃ. ১৯৩; মুজামুল ওয়াসিত, পৃ. ৫১৫।

❑ **চতুর্থ অর্থ– স্থায়ী অবস্থান নিয়েছেন (اسْتَقَرَّ) :**

আলোচ্য শব্দের এই অর্থ করেছেন সাইয়্যিদুনা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর, ইমাম কালবি, ইমাম মুকাতিল বিন হাইয়্যান, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক প্রমুখ।[456]

উপরিউক্ত তিনটি আরবি অর্থের বাংলা অনুবাদ কী হবে এবং এ বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় নিয়ে আমরা সামনে কথা বলব, ইনশা্আল্লাহ। তবে চতুর্থ আরবি অর্থের বাংলা অনুবাদ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করে নিচ্ছি। কারণ আমরা যেই অর্থটি সাব্যস্ত করেছি, তা এই শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার এবং শব্দটির ব্যাপারে আমাদের উলামাদের বক্তব্য পর্যবেক্ষণ করেই সাব্যস্ত করেছি।

‘মুজামুল গনি’ নামক আরবি অভিধানে বলা হয়েছে,

وَأَخِيراً اِسْتَقِرَّ، سُكَّانُ الصَّحْراءِ : ثَبَتُوا فِي مَكانِهِمْ بَعْدَ تَرْحالٍ.

“অবশেষে মরুবাসীরা *‘ইস্তাকার্রা’* করল : সফর শেষে নিজেদের জায়গায় স্থায়ী (থিতু) হলো।”[457]

---

456 বাইহাকি, ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত***, বর্ণনা নং : ৮৭৩; মুখতাসারুস সাওয়ায়িক, খ. ২, পৃ. ১৪৩; তাফসিরুল বাগাউয়ি, পৃ. ৩৮৪; মাজমুউ ফাতাওয়া, খ. ৫, পৃ. ৫৯১।

457 *‘আল-মাআনি’* নামক আরবি অভিধানের ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।

বিখ্যাত আরবি-বাংলা অভিধান *আল-মু'জামুল ওয়াফী* প্রণেতা বলেছেন, قرار] (استقرار) استقر] "অবস্থান করা, স্থির হওয়া, স্থায়ী হওয়া, শান্ত হওয়া।"[458]

সুপ্রসিদ্ধ আরবি-ইংরেজি অভিধান *আল-মাওরিদ* প্রণেতা বলেছেন,

(في مكان) استقر "to settle (down) at, established oneself at, be or become settled at, to reside at, to remain at, stay at. অর্থ : থিতু হওয়া, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, স্থায়ী হওয়া, অবস্থান করা, থাকা, থাকা।"[459]

আকিদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ *'ইস্তাওয়া'* শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

استقر؛ يعني : لم يزل مستويا.

---

[458] মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, ***আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*** (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৮৯।

[459] রুহি বাআলবাকি, ***আল-মাওরিদ : অ্যা মডার্ন অ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি*** (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৯৭।

“*ইস্তাকার্রা* মানে : তিনি সর্বদা *‘ইস্তিওয়া করে’* রয়েছেন।”[460] শাইখের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, *‘ইস্তাকার্রা’* শব্দের মধ্যে স্থায়িত্বের অর্থ রয়েছে।

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকিদার পণ্ডিত, আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক হাফিজাহুল্লাহ *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

والاستقرار فيه معنى الثبات، وهو خلاف الاضطراب.

“*ইস্তাকার্রা* শব্দের মাঝে স্থায়িত্ব বা অটলতার অর্থ রয়েছে। এটা অস্থিরতা বা অস্থিতিশীলতার বিপরীত।”[461]

ইংরেজি ভাষায় এই শব্দের কী অর্থ করা হয়, আমরা সেটাও দেখে নিই। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজদি রাহিমাহুল্লাহ *‘সালাসাতুল উসুল’* গ্রন্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন,

فلما استقر بالمدينة؛ أمر ببقية شرائع الإسلام.[462]

---

460 সালিহ আলুশ শাইখের *আকিদা ওয়াসিতিয়্যার* লেকচার সিরিজের প্রশ্নোত্তর (ক্লিপ নং আমার মনে নেই, আমার বইয়ে নোট করা আছে), লেকচার সিরিজ গৃহীত হয়েছে *ইসলামওয়েব ডট কম* থেকে।

461 আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক, ***শারহুল আকিদাতিত তাদমুরিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুত তাদমুরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৮৫।

462 **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজদি, ***আল-উসুলুস সালাসাতু ওয়া আদিল্লাতুহা***; **গৃহীত :** আব্দুল মুহসিন আল-কাসিম, ***মুতুনু তালিবিল ইলম মুস্তাওয়া***

উস্তাজ দাউদ বারব্যাঙ্ক রাহিমাহুল্লাহ কথাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন :

“So when he settled in al-Madeenah he ordered the rest of the prescribed duties of Islaam. অর্থাৎ যখন তিনি মদিনায় সেটলড (স্থায়ী) হলেন, তখন শরিয়তের অবশিষ্ট বিধান পালনের নির্দেশনা দিলেন।”[463]

দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত ইমাম ইবনু উসাইমিন বিরচিত *শারহুল ওয়াসিতিয়্যা* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদেও *‘ইস্তাকার্রা’* শব্দের অনুরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা চারটি আরবি অর্থের মর্মার্থ বিষয়ে এই গ্রন্থ থেকে শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর একটি বক্তব্য পেশ করেছি। *দারুস সালাম* সেটার ইংরেজি অনুবাদ করেছে এভাবে :

“But ‘elevated,’ ‘raised,’ and ‘ascended’ have the same meaning; as for ‘settled’, it has a different meaning. অর্থ : কিন্তু *‘আরোহণ করেছেন’*, *‘ওঠেছেন’* এবং

আওয়্যাল (প্রথম ভাগ) (প্রকাশনীর নামবিহীন, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৬৯।

[463] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য থ্রি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস অফ ইসলাম*** (ইংরেজি অনুবাদের সফটকপি, তাবি), পৃ. ১০৭।

‘চড়েছেন’ শব্দের অর্থ একই। পক্ষান্তরে *‘স্থায়ী হয়েছেন’* শব্দের আলাদা অর্থ রয়েছে।”[464]

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, *‘ইস্তাকার্রা’* শব্দের অর্থ হিসেবে *‘স্থায়ী অবস্থান নিয়েছেন’* কিংবা *‘থিতু হয়েছেন’* বলা ভুল না। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

❑ পঞ্চম অর্থ– বসেছেন (جَلَسَ) :

‘ইস্তাওয়া’ শব্দের এই অর্থ সাব্যস্ত করেছেন তাবেয়ি ইমাম হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১০ হি.) এবং ইমাম ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৬ হি.)।[465]

আমাদের বড়ো বড়ো সালাফি উলামাদের মধ্য থেকে যারা ব্যক্ত করেছেন, *‘আল্লাহ বসেছেন’* – তাঁদের কতিপয়ের বক্তব্য সামনে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। যাতে করে এটা বলার কারণে কিংবা

---

[464] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***কমেন্টারি অন আল-আকিদা আল-ওয়াসিতিয়্যা*** (দারুস সালাম, প্রকাশনার ক্রমধারাবিহীন, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ), খ. ১, পৃ. ৪৯৯-৫০০।

[465] মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বি আন্নাহু কয়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ***, তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান (২য় প্রকাশ, ১৪৩৬ হিজরি), বর্ণনা নং : ৪৮, পৃ. ২৩৪; মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বি আন্নাহু কয়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ***, তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি (*কিতাব-অনলাইন ডট কমে* প্রকাশিত সফটকপি), পৃ. ৬৭, **বর্ণনার মান :** হাসান (তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি)।

‘সমাসীন হয়েছেন’ বলার কারণে সালাফিদের অপনোদন করা এবং *‘এসব অর্থ বাতিল বা বিদাতি অর্থ’* এমন বলা যে ঠিক নয়, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

‘আরোহণ করেছেন’ এবং *‘চড়েছেন’* বললে কি মাখলুকের সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য দেওয়া হয়?

জনৈক শ্রদ্ধাভাজন দায়ি আমাকে বলেছেন, “*ইস্তাওয়া* শব্দের অর্থ হিসেবে *‘আরোহণ করেছেন’* বলা যাবে না। কারণ এটা মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। বরং *ইস্তাওয়া* শব্দের বাংলা অর্থ শুধু—*ওঠেছেন।*” অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য মোতাবেক *‘আল্লাহ আরোহণ করেছেন’*– বললে মাখলুকের সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য দেওয়া হয়। আল্লাহ তাঁর সদিচ্ছার জন্য উত্তম পারিতোষিক দিন এবং তাঁকে মার্জনা করুন। তাঁর উল্লিখিত বক্তব্য খুবই বিভ্রান্তিকর এবং তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বক্তব্যটি বিদাতি কালামি গোষ্ঠীর বক্তব্যের সাথে মিলে যায়।

আমরা কয়েকটি দিক থেকে তাঁর বক্তব্যকে খণ্ডন করছি। যথা :

প্রথমত, তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কেবল *‘আল্লাহ আরশের ওপর ওঠেছেন’* বলতে হবে। আমি বলছি, সরাসরি *‘ওঠেছেন’* শব্দেরই বাংলা অর্থ— আরোহণ করেছেন এবং চড়েছেন। *‘ওঠা’* শব্দটি একটি

ক্রিয়া। বাংলা ভাষায় এই ক্রিয়ার প্রায় ২৩ রকমের অর্থ রয়েছে। যেমন : ভোরে ওঠা, দাঁত ওঠা, মাটি ফুঁড়ে জল ওঠা, জিনিসপত্রের দাম ওঠা, ক্লাসে ওঠা, কাপড়ের রঙ ওঠা, গাড়িতে বা ঘোড়ায় ওঠা। উল্লিখিত সবগুলোর অর্থ কিন্তু আলাদা। এর মধ্যে *'গাড়িতে বা ঘোড়ায় ওঠা'* বলতে যে অর্থ বোঝানো হচ্ছে, সেটাই মূলত আরবি *ইস্তাওয়া* শব্দের অর্থ। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে এই প্রকারের *'ওঠা'* শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'আরোহণ করা, চড়া।'[466]

সংসদ বাংলা অভিধানেও বলা হয়েছে, "উঠা, ওঠা [utha, otha] ক্রি. 6 চড়া, আরোহণ করা (গাছে ওঠা, কাঁধে ওঠা)।"[467]

সংসদ সমার্থশব্দকোষ অভিধানে 'ওঠা' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, "চড়া, আরোহণ, অধিরোহণ, ঊর্ধ্বারোহণ।"[468]

বাংলা ভাষায় *'ওঠা'* শব্দের ব্যবহারিক অর্থ থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, *'আল্লাহ ওঠেছেন'* বলার মাঝে আর *'আল্লাহ আরোহণ করেছেন বা চড়েছেন'* বলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ

---

466 বাংলা একাডেমি, ***বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*** (১ম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২৪৫।

467 সংসদ বাংলা অভিধান (অন্তর্জালিক সংস্করণ), পৃ. ১১৯।

468 অশোক মুখোপাধ্যায়, ***সংসদ সমার্থশব্দকোষ*** (সপ্তদশ মুদ্রণ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ১০১।

ওঠেছেন, আরোহণ করেছেন, চড়েছেন – শব্দগুলোর অর্থ এক ও অভিন্ন।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি বলেন, আরোহণ করা বা চড়া – মাখলুকের বৈশিষ্ট্য, এজন্য আল্লাহর ক্ষেত্রে এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করা যাবে না; তাহলে একইকথা *'ওঠার'* ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। কেননা ওঠাও মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। বাঙালিরা কথাবার্তায় বলে থাকে, "আমি গাড়িতে ওঠলাম, ঠেলায় পড়লে বিড়ালও গাছে ওঠে, সে বাড়ির ছাদে ওঠেছে, বারান্দায় বন্যার পানি ওঠেছে।" সুতরাং *'আল্লাহ আরোহণ করেছেন বা চড়েছেন'* বললে যদি মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়, তাহলে *'আল্লাহ ওঠেছেন'* বললেও মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়। হুবহু একই জিনিস, কোনো পার্থক্য নেই।

তৃতীয়ত, *'আল্লাহ আরোহণ করেছেন বা চড়েছেন'* বললে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়— এমনকথা প্রাচীন জাহমিয়া সম্প্রদায় থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগে উদ্ভূত ছোটো জাহমিয়া সম্প্রদায় আশারি-মাতুরিদি গোষ্ঠীর লোকেরা এমনকি হালের নব্য আশারি-মাতুরিদি ফের্কার লোকজনও বলে থাকে। এসব দর্শনচর্চাকারী বিদাতি সম্প্রদায়ের আলোচ্য বক্তব্যকে কঠিনভাবে খণ্ডন করেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম দারিমি, ইবনু

আব্দিল বার্র, ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু আবিল ইজ প্রমুখের মতো আহলুস সুন্নাহর শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ *'আল-আকিদাতুত তাদমুরিয়্যা'* গ্রন্থে একটি মূলনীতি সাব্যস্ত করেছেন,

اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات.

"নামের মিল এমনটি আবশ্যক করে না যে, সংশ্লিষ্ট নামের প্রতিটি জিনিস একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।"[469]

যেমন মানুষ শোনে এবং দেখে। আবার আল্লাহও শোনেন এবং দেখেন। অথচ উভয় শোনা ও দেখার মাঝে কত পার্থক্য রয়েছে! এমনকি মাখলুকের মাঝেই এ বিষয়টিতে মিল থাকে না। শোনা ও দেখার বৈশিষ্ট্য হাতি, মুরগি, চিল, বিড়াল সবার থাকলেও সবার শোনা ও দেখা একরকম নয়। আল্লাহর জীবন আছে, আবার মাখলুকেরও জীবন আছে। অথচ আল্লাহর জীবনের সাথে মাখলুকের জীবনের কোনো সাদৃশ্য নেই। আল্লাহর জ্ঞান আছে, আবার মানুষেরও জ্ঞান আছে। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের সাথে মানুষের জ্ঞানের সাদৃশ্য দেওয়া চলে না। কারণ আল্লাহর সকল গুণই সবদিক থেকে পরিপূর্ণ, পক্ষান্তরে মাখলুকের গুণ সবদিক থেকে পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যে

---

[469] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***আত-তাদমুরিয়্যা***, তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আওদা (১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২০।

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়। একটি জিনিস চিন্তা করুন, আরশের অস্তিত্ব আছে, আবার মশারও অস্তিত্ব আছে। অথচ উভয়ের অস্তিত্বের মাঝে কত পার্থক্য!

এই মূলনীতি দিয়ে সিফাত অস্বীকারকারী সমুদয় বিদাতি সম্প্রদায়ের খণ্ডন করা হয়। অনুরূপভাবে আমরাও সেই সম্মাননীয় দায়িকে বলতে চাই, আল্লাহর অস্তিত্ব আর মাখলুকের অস্তিত্ব যেমন এক নয়, তেমনি আল্লাহর আরোহণ আর বান্দার আরোহণ এক নয়, আল্লাহর চড়া আর বান্দার চড়া এক নয়।

শাইখুল ইসলাম *'আত-তাদমুরিয়্যা'* গ্রন্থে আরও বলেছেন,

القول في بعض الصفات كالقول في بعض.

"একটি সিফাতের ব্যাপারে যে কথা বলা হয়, বাকি সিফাতের ক্ষেত্রেও একইকথা প্রযোজ্য হয়।"[470]

এই সুসাব্যস্ত মূলনীতির মাধ্যমে আশারি-মাতুরিদিদের খণ্ডন করা হয়ে থাকে। আশারি-মাতুরিদি গোষ্ঠী-সহ পুরো জাহমিয়া সম্প্রদায় বলে, আল্লাহর জন্য রহমত সাব্যস্ত করা যাবে না, কারণ এতে করে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়ে যায়! আল্লাহর রাগ সাব্যস্ত করা যাবে না, কারণ এতে এতে করে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়ে যায়! এভাবে যত সিফাত তারা অস্বীকার করে, সবগুলোর ক্ষেত্রে

---

[470] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৩১।

এরকম কথা বলে তারা সাদৃশ্য দেওয়ার ভয়ে সিফাত অস্বীকার করে, আর নয়তো সিফাতের অপব্যাখ্যা কিংবা অর্থ-অস্বীকার করে। আমরা আশারি-মাতুরিদিদের বলব, "তোমরা আল্লাহর জ্ঞান সাব্যস্ত করে থাক। আল্লাহ নিজেকে জ্ঞানী বলেছেন, আবার মাখলুক নবি ইসহাক আলাইহিস সালামকেও কুরআনের মধ্যে জ্ঞানী বলেছেন[471]। তাহলে তোমরাই বল, আল্লাহর জ্ঞান কি নবি ইসহাকের জ্ঞানের মতো?" আশারিরা জবাব দেবে, 'না না। আল্লাহর জ্ঞান তাঁরই জ্ঞানের মতো। মাখলুকের জ্ঞান মাখলুকের মতো।' আমরা বলব, 'ঠিক একইভাবে আল্লাহর রহমত আল্লাহর রহমতের মতো, আর মাখলুকের রহমত মাখলুকের মতো। উভয় রহমত এক নয়।'

হুবহু একইকথা আমাদের আলোচ্য সম্মাননীয় দায়ির বক্তব্যের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি, "আপনি আল্লাহর *'ওঠা'* সাব্যস্ত করে থাকেন। আল্লাহ আরশের ওপর ওঠেছেন, আবার মাখলুকেরও *'ওঠা'* বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মাখলুক ঘোড়ায় ওঠে, গাড়িতে ওঠে, গাছে ওঠে, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে, নৌকায় ওঠে। এমনকি আল্লাহ স্বয়ং জানিয়েছেন, মাখলুকও *'ইস্তিওয়া'* করে থাকে। মানুষ *'ইস্তিওয়া'* করে, আবার নুহের নৌকাও *'ইস্তিওয়া'* করে[472]। তাহলে বলুন, মানুষের ওঠা

---

[471] সুরা জারিয়াত : ২৮।

[472] সুরা যুখরুফ : ১৩; সুরা হুদ : ৪৪।

কি আল্লাহর ওঠার মতো?” তিনি জবাব দেবেন, “না না। মানুষের ওঠা মানুষের মতো। আর আল্লাহর ওঠা আল্লাহরই ওঠার মতো। উভয়ের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই।” তখন আমরা বলব, “ঠিক একইভাবে আল্লাহর আরোহণ বা চড়া আল্লাহরই আরোহণ বা চড়ার মতো, তা মাখলুকের ‘আরোহণ করা’ কিংবা মানুষের চড়ার মতো নয়।”

চতুর্থত, সালাফগণ একই অর্থ বোঝানোর জন্য কয়েকটি সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় যদি সেরকম সমার্থবোধক শব্দ থাকে, যেগুলোর অর্থ একই, তাহলে আমাদের তা ব্যবহার করতে সমস্যা কোথায়? বরং একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ বিদ্যমান থাকতে সালাফদের ব্যবহৃত তিনটি আরবি শব্দের কেবল একটি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়। আরও অদ্ভুত মনে হয়, যখন বাকিগুলোকে ভুল বলে উম্মতের প্রতি কঠিনতা আরোপ করা হয়। অথচ নবিজি নির্দেশ দিয়েছেন, “তোমরা সহজ করো, কঠিন কোরো না।”[473]

ইংরেজি অনুবাদেও সালাফদের ব্যবহৃত তিনটি সমার্থবোধক শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ইংরেজি তিনটি প্রতিশব্দ নিয়ে আসা হয়েছে, যেমনটি আমরা দেখেছি। আমি আবার সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি।

[473] সহিহুল বুখারি, হা. ৬১২৫।

দারুস সালাম ‘ইস্তাওয়া’ শব্দের অনুবাদ নিয়ে শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর আলোচনার ইংরেজি অনুবাদ করেছে এভাবে :

“But ‘elevated,’ ‘raised,’ and ‘ascended’ have the same meaning; as for ‘settled’, it has a different meaning. অর্থ : কিন্তু *‘আরোহণ করেছেন’*, *‘ওঠেছেন’* এবং *‘চড়েছেন’* শব্দের অর্থ একই। পক্ষান্তরে *‘স্থায়ী হয়েছেন’* শব্দের অর্থ আলাদা।”[474]

এ থেকে আমাদের কাছে সুসাব্যস্ত হয়ে গেল, আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন কিংবা আরশের ওপর চড়েছেন– বলায় কোনো সমস্যা নেই। যারা মনে করছেন, এতে মাখলুকের সাথে তাশবিহ তথা সাদৃশ্য দেওয়া হয়ে গেল, তারা ভুলের মধ্যে রয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিন।

আরেকটি বিষয় এখানে সংযুক্ত করে দিচ্ছি, যেন বাঙালি সালাফি ভাইদের অন্তর প্রশান্ত হয়। উস্তায আব্দুল হামীদ ফাইযী এবং উস্তায মুহাম্মাদ হাশেম মাদানী-সহ আরও অনেক সালাফি দায়ি

---

[474] ইবনু উসাইমিন, ***কমেন্টারি অন আল-আকিদা আল-ওয়াসিতিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৪৯৯-৫০০।

আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ করেছেন— ‘অতঃপর তিনি আরশে আরোহণ করেন।’[475]

আর উস্তাজ মতিউর রহমান মাদানী হাফিজাহুল্লাহ আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন— ‘ওপরে চড়েছেন।’[476] তদ্রূপ উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী হাফিজাহুল্লাহও *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অনুবাদে *‘চড়েছেন’* বলা যাবে বলে জানিয়েছেন।[477]

তথাপি, আমরা *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের সবচেয়ে ভালো অনুবাদ হিসেবে *‘আরোহণ করেছেন’* ও *‘ওঠেছেন’* শব্দদ্বয়কেই প্রাধান্য দিই এবং সাধারণত আমাদের লেখায় এই শব্দদ্বয়ই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যেহেতু *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত আরবি তিনটি সমার্থবোধক শব্দের অর্থ করা দরকার এবং বাংলায় একই অর্থবোধক তিনটি প্রতিশব্দ আছে, সেহেতু আমরা *‘চড়েছেন’* শব্দটি প্রয়োজনে

---

[475] **দ্রষ্টব্য :** সালাহুদ্দিন ইউসুফ, ***তাফসীর আহসানুল বায়ান (অনু :)*** (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ), খ. ২, পৃ. ৫০৭, সুরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতের অনুবাদ; আব্দুল হামীদ ফাইযী, ***মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী*** (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২২০।

[476] **দ্রষ্টব্য :** https://youtu.be/4BeLFwgL-TU?si=_yim56_mTKbwbwnR (২৯ মিনিট থেকে ৩১ মিনিট পর্যন্ত)।

[477] **দ্রষ্টব্য :** https://www.facebook.com/share/v/w7D3NHN9bywD9qBf/?mibextid=w8EBqM।

ব্যবহার করলাম। অন্যথায় *‘চড়েছেন’* শব্দের চেয়ে পূর্বোক্ত শব্দদ্বয়ই আমাদের কাছে পছন্দনীয়।

‘ইস্তাওয়া’ শব্দের অনুবাদ হিসেবে *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন’* – বলার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

‘ইস্তাওয়া আলাল আরশের’ অনুবাদ হিসেবে *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন’* – বলা থেকে আমরা বিরত থাকছি। যদিও অনেক বাঙালি সালাফি দায়ি *‘ইস্তাওয়া আলাল আরশের’* অনুবাদ হিসেবে *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন’* – বলে থাকেন। আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, কোনো কোনো বাংলা অভিধান অনুযায়ী *‘সমুন্নত হওয়ার’* একটি দূরবর্তী অর্থ হয় *‘ওঠা’।* সত্তাগতভাবে সুউন্নত হওয়ার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার হয় এবং বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিকদের লেখাতেও আমরা শব্দটির এমন ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তারপরেও *‘আরোহণ’* ও *‘ওঠা’* শব্দদ্বয়ের মধ্যে যেমন স্পষ্ট ক্রিয়ার অর্থ পাওয়া যায় এবং বাংলা ভাষায় এই অর্থে শব্দদুটোর বহুলব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তা *‘সমুন্নত হওয়া’* শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখিনি। কোনো সালাফি দায়ি বা গবেষকের যদি শব্দটির এমন ব্যবহার জানা থাকে, এবং সে অনুযায়ী তিনি *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের

অর্থ হিসেবে উক্ত শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে আমরা তাঁকে বিভ্রান্ত বা *‘গোমরাহি-আকিদার লোক’* বলি না। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

‘ইস্তাওয়া’ শব্দের অনুবাদ হিসেবে *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন’*– বলা কি ভুল?

অনেক সম্মাননীয় দায়ি বলে থাকেন, *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন’* – বলা যাবে না। কারণ *‘সমাসীন হওয়া’* মানে *‘উপবেশন করা বা বসা’।* এটি ভুল আকিদা। আমি নিজেও এমনটি মনে করতাম। পরে আমার ভুল ভেঙেছে এবং আমি আমার পূর্ববর্তী অবস্থান পরিবর্তন করেছি। *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অনুবাদ হিসেবে *‘সমাসীন হয়েছেন’* বলা ভুল নয়। কারণ *‘সমাসীন হওয়া’* মানে শুধু *‘উপবেশন করা বা বসাই’* হয় না, বরং *‘সমাসীন হওয়ার’* একটি মানে *‘আরোহণ করেছেন এমন হওয়া’।* তথাপি সালাফদের থেকে *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ হিসেবে *‘জালাসা (বসেছেন)’* শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যে বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। সামনে আমাদের বড়ো বড়ো সালাফি উলামাদের বক্তব্যও পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত, আমরা জেনে নিই, *‘সমাসীন হয়েছেন’* কথাটির মানে স্রেফ *‘বসেছেন’* – এমনটি নয়। বরং এর আরও একটি মানে *‘আরূঢ় হয়েছেন’।* আরূঢ় শব্দের অর্থ— ‘আরোহণ করেছেন এমন।’ সোজা কথায়, সমাসীন হওয়ার একটি ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ আরশে আরোহণ করেছেন। আমার কথার পক্ষে আমি বাংলা ভাষাবিদদের রচনা থেকে প্রমাণ পেশ করছি। *‘বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে’* বলা হয়েছে, “সমাসীন /শমাশিন্/ [স. সম্+√আস্+ঈন (শানচ্)] বিণ. উপবিষ্ট, আরূঢ় (সিংহাসনে সমাসীন)।”[478] আর *আরূঢ়* শব্দের অর্থ হিসেবে *‘বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে’* বলা হয়েছে, “আরূঢ় /আরুঢ়ো/ [স. আ+√রুহ্+ত] বিণ. আরোহণ করেছে এমন, সওয়ার।”[479] উল্লেখ্য, একটি শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে যদি কোনো অর্থ আল্লাহর শানে ব্যবহার-উপযোগী না হয়, তাহলে পুরো শব্দই বাদ দিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়। কারণ এতে করে বহু শব্দ বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং জনসাধারণকে নিপাতন করা হবে অত্যাধিক কাঠিন্যে। আল্লাহুল মুস্তাআন।

তাই আমরা বলি, একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ হতে পারে, উপযুক্ততার বিবেচনায় আমরা সেসব শব্দ ব্যবহার করে থাকি। একটি

---

[478] বাংলা একাডেমি, ***আধুনিক বাংলা অভিধান,*** পৃ. ১২৯৭।

[479] বাংলা একাডেমি, ***আধুনিক বাংলা অভিধান,*** পৃ. ১৬৬।

শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে কোনো একটি অর্থ আল্লাহর শানে ব্যবহারের অনুপযোগী হলে বিলকুল সেই শব্দই যদি বর্জন করা হয়, তাহলে পৃথিবীর বহু ভাষা আর ব্যবহার-উপযোগী থাকবে না। এমনকি সালাফদের বক্তব্যও বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'ওঠা' শব্দ দিয়েই শুরু করি। আমরা বলি, আল্লাহ আরশের ওপর ওঠেছেন। বাংলা ভাষায় ওঠা শব্দের প্রায় ২৩ টি ব্যবহারিক অর্থ রয়েছে। *'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'* বলা হয়েছে, "উঠা, ওটা [উঠা, ওঠা] (ক্রিয়া) ১ উত্থিত হওয়া বা করা; গাত্রোত্থান করা। ২ আসন ছেড়ে দাঁড়ানো। ৩ শয্যাত্যাগ করা; জাগা (ভোরে ওঠা)। ৪ অঙ্কুরিত হওয়া; গজানো (দাঁত ওঠা)। ৫ উদিত হওয়া; প্রকাশ পাওয়া (সূর্য ওঠা) ৬ আরোহণ করা; চড়া (ঘোড়ায় ওঠা) ৭ স্খলিত হওয়া; ঝরে যাওয়া (চুল ওঠা)। ৮ উদ্গীর্ণ হওয়া (মাটি ফুঁড়ে জল ওঠা)। ৯ বাড়া; বৃদ্ধি হওয়া (দাম ওঠা) ১০ প্রমোশন পাওয়া (ক্লাসে ওঠা) ১১ সংগৃহীত হওয়া (চাঁদা ওঠা)। ১২ প্রবেশ করা (কানে ওঠা)। ১৩ আমদানি হওয়া (বাজারে ওঠা)। ১৪ প্রচলিত হওয়া (নতুন ফ্যাশন ওঠা)। ১৫ উন্নীত হওয়া (জাতে ওঠা)। ১৬ লুপ্ত হওয়া (পাট ওঠা)। ১৭ নষ্ট হওয়া; জ্বলে যাওয়া (রং ওঠা)। ১৮ উল্লিখিত হওয়া (খাতায় নাম ওঠা)। ১৯ আবাদ হওয়া (জমি ওঠা)। ২০ বন্ধ হওয়া

(খাওয়া ওঠা)। ২১ হঠাৎ বা আকস্মিকতা বোঝানো (ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে)। ২২ বিনা প্রস্তুতিতে কাজ করা (ওঠ বললেই কি ওঠা যায়? সব কিছুরই সময় আছে)। ২৩ আলস্য ত্যাগ করা (ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল-কাজী নজরুল ইসলাম)।"[480]

আপনিই বিবেচনা করুন, উল্লিখিত তেইশটি অর্থের মধ্যে কোনটি সালাফদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী *'ইস্তাওয়া'* শব্দের অর্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? উপরোল্লিখিত ৬ নং অর্থটি সালাফদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী *'ইস্তাওয়া'* শব্দের অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ *'আল্লাহ আরশের ওপর ওঠেছেন'* কথাটির মানে— 'আরশের ওপর আরোহণ করেছেন, চড়েছেন।' এখন আসুন, *'ওঠা'* শব্দের প্রথম অর্থটি নিয়ে চিন্তা করি। ওঠা মানে গাত্রোত্থান করা; অর্থাৎ দেহ তোলা, শয্যা থেকে উঠে বসা ইত্যাদি। আল্লাহর জন্য আমরা এই অর্থ সাব্যস্ত করি? কক্ষনো না। এটা একদম বাতিল অর্থ। আবার *'ওঠা'* শব্দের মানে ঘুম থেকে জাগা, নষ্ট হওয়া, অঙ্কুরিত হওয়া, লুপ্ত হওয়া – প্রভৃতিও হয়ে থাকে। এগুলো কি আমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করি?! কক্ষনো না।

বাংলা ভাষায় এমন আরও বহু শব্দ আছে, যেগুলো একাধিক অর্থবিশিষ্ট, আর সেসবের প্রতিটি অর্থ আল্লাহর জন্য উপযোগী ও

---

[480] বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ১৫১।

মানানসই নয়। আমি কলেবর সংক্ষেপ করার জন্য সেসব শব্দ উল্লেখ করছি না।

অনুরূপভাবে বলা যায়, মহান আল্লাহ নিজের জন্য ‘আল-আজাব’ তথা ‘আশ্চর্য হওয়া’ সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। বিশিষ্ট আকিদাবিশারদ আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, আশ্চর্য হওয়ার দুটো অর্থ রয়েছে। এক. কোনো বিষয়ে না জানা থাকার কারণে নতুনভাবে জেনে অদ্ভুত লাগা, দুই. কোনো বিষয়ে জানা থাকা সত্ত্বেও সেটা স্বাভাবিক বিষয় থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্য লাগা। এই শব্দের প্রথম অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা না-জায়েজ, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সিফাতটি সাব্যস্ত করা ওয়াজিব।[481]

সেজন্য কোনো বহুঅর্থবিশিষ্ট শব্দের কিছু অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ হলেই যে শব্দটি আকিদাশাস্ত্রের পরিভাষায় *‘লাফজে মুজমাল (ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ যা স্বাভাবিক পরিস্থিতে আল্লাহর শানে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ)’* হিসেবে বিবেচিত হবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং দর্শনচর্চাকারী বিদাতিরা যেসব শব্দের আড়ালে আল্লাহর সিফাত স্বীকার না করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়, যেসব শব্দ কিতাব-সুন্নাহয় না সাব্যস্ত করা হয়েছে, আর না নাকচ করা হয়েছে,

---

[481] সালিহ আলুশ শাইখ, ***আল-লাআলি আল-বাহিয়্যা***, খ. ২, পৃ. ৫৩-৫৪।

এবং উলামাগণ সেসব শব্দকে লাফজে মুজমাল বলেছেন, আমরা কেবল সেগুলোকেই লাফজে মুজমাল আখ্যা দিব। অন্যথায় নিজে নিজে একটা বুঝ বুঝে নিয়ে যেকোনো শব্দকে লাফজে মুজমাল তকমা দিয়ে দিলে অনেক সিফাতকেই অস্বীকার করে বসতে হবে। ওয়াল ইয়াজু বিল্লাহ।

তবে আরবি ভাষা থেকে এরকম আরেকটি উদাহরণ দিই। একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ, কিন্তু সবগুলো আল্লাহর শানে প্রযোজ্য হবে না, অথচ সালাফগণ সেই বহুঅর্থবিশিষ্ট শব্দ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, এতে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করেননি। যেমন *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের একটি অন্যতম অর্থ— আলা (عَلَا)। সালাফগণ এই অর্থ করেছেন, যা আমরা বারবার বলেছি। আরবী-বাংলা অভিধান আল-মু‘জামুল ওয়াফী প্রণেতা এই শব্দের অর্থ করেছেন, “(عُلُوّ) عَلَا) : উঁচু হওয়া, ওপরে ওঠা, ঊর্ধ্বে অবস্থান করা, অবাধ্য হওয়া, অহঙ্কার করা।”[482]

এখন বলুন, ‘আলা’ ক্রিয়াপদের ‘অবাধ্য হওয়া’ অর্থটি কি আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে? কখনোই না। কারণ আল্লাহ তো বাধ্য হওয়ার প্রয়োজনমুক্ত, তিনি হলেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মহান স্রষ্টা। ‘বাধ্যতা-অবাধ্যতা’র বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না।

---

[482] আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু‘জামুল ওয়াফী), পৃ. ৭০৫।

তাছাড়া আয়াতে বর্ণিত ‘ইস্তাওয়া’ শব্দের অর্থ হিসেবে যে কোনোভাবেই ‘অবাধ্য হওয়া’ অর্থটি সাব্যস্ত হবে না, সে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন, আমিন।

দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নিই, *‘সমাসীন হওয়া’* মানে কেবল *‘উপবেশন করা বা বসা’*, তবুও *‘সমাসীন হয়েছেন’* বলার কারণে কাউকে গোমরাহ বলা যাবে না এবং এই অর্থকেও *‘বিদাতি অর্থ’* বা *‘বিভ্রান্ত অর্থ’* বলা চলবে না। কারণ সালাফদের থেকে *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের ব্যাখ্যায় *‘জালাসা’* শব্দ প্রমাণিত হয়েছে এবং আহলুস সুন্নাহর একদল বিদ্বানের কাছে সেসব বর্ণনা বিশুদ্ধ। এ বিষয়টি আমরা সংক্ষেপে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। আর এ বিষয়ে সালাফি বিদ্বানদের বক্তব্য কিছুদূর এগিয়েই পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয়ত, আমাদের বাঙালি সালাফি দায়িদের মধ্যে অনেকেই *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ করেছেন— *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন।’* আমি তথ্যসূত্র-সহ কয়েকজন সম্মাননীয় বাঙালি সালাফি দায়ির নাম উল্লেখ করছি।

১. বিশিষ্ট রিজালবিদ মুহাদ্দিস, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের আমৃত্যু সহ-সভাপতি, শাইখ আলীমুদ্দিন নদিয়াভী রাহিমাহুল্লাহ।[483]

২. উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী হাফিজাহুল্লাহ।[484]

২. উস্তাজ মুহাম্মাদ হাশেম মাদানী হাফিজাহুল্লাহ।[485]

৩. উস্তাজ মতিউর রহমান মাদানী হাফিজাহুল্লাহ।[486]

৪. উস্তাজ ড. রেজাউল করিম মাদানী হাফিজাহুল্লাহ।[487]

৫. উস্তাজ ড. আব্দুল্লাহিল কাফি মাদানী হাফিজাহুল্লাহ।[488]

৬. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ।[489]

---

[483] আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, ***রাসূলুল্লাহর (সা.) সালাত এবং 'আকীদাহ্ ও জরুরী মাসআলা*** (ঢাকা : আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২৩।

[484] সালাহুদ্দিন ইউসুফ, ***তাফসীর আহসানুল বায়ান (অনু :),*** খ. ১, পৃ. ৫০৬-৫০৭, সুরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতের অনুবাদ; ফাইযী, ***মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী,*** পৃ. ২২২।

[485] সালাহুদ্দিন ইউসুফ, ***তাফসীর আহসানুল বায়ান (অনু :),*** খ. ১, পৃ. ৫০৬-৫০৭।

[486] **দ্রষ্টব্য** : https://youtu.be/4BeLFwgL-TU?si=_yim56_mTKbwbwnR (৩২:৩০ মিনিট থেকে ৩৪ মিনিট পর্যন্ত)।

[487] রেজাউল করিম মাদানী, ***বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা*** (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৩০।

[488] আব্দুল্লাহিল কাফি মাদানী, ***মুসলিম জীবনে জানা-অজানা কিন্তু...*** (রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ১ম প্রকাশ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৪৮।

[489] আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***আল-ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*** (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২৬২।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন’* – বলা ভুল নয়। *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অনুবাদ হিসেবেও এ বক্তব্য সঠিক। আর আল্লাহই সম্যক অবগত।

যেসব সালাফি বিদ্বান ও দায়ির বক্তব্যে এসেছে *‘আল্লাহ বসেছেন’*

১. ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব বিন আব্দুল হাকাম আল-ওয়াররাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫০ হি.) *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ করেছেন, *‘বসেছেন।’* তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে,

وقيل للإمام أحمد بن حنبل : من نسأل بعدك؟ فقال : سل عبد الوهاب.

“ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘আপনার পরে আমরা কাকে প্রশ্ন করব?’ তিনি বলেছিলেন, ‘আব্দুল ওয়াহহাবকে জিজ্ঞেস করবে’।”[490]

উক্ত ইমাম অর্থাৎ আব্দুল ওয়াহহাব আল-ওয়াররাক রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে এই সূত্রে,

قال الخلال : أخبرنا أبو بكر المروذي قال : سمعت عبدالوهاب يقول : **{الرحمن على العرش استوى} قال : قعد.**

“খাল্লাল বলেন, আমাদেরকে আবু বাকর আল-মাররুজি অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আব্দুল ওয়াহহাবকে বলতে শুনেছি,

---

490 আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ,*** তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান, বর্ণনা নং : ৫১, পৃ. ১৮০; আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ,*** তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি, পৃ. ৭১।

‘দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন; অর্থাৎ তিনি (আরশের ওপর) বসেছেন’।”[491]

২. ইমাম আলি বিন উমার আদ-দারাকুতনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

لا تنكروا أنه **قاعد** ~ ولا تنكروا أنه يقعده.

“তোমরা অস্বীকার করো না যে, **তিনি বসে আছেন।** এও অস্বীকার কোরো না যে, তিনি তাঁকেও (নবি মুহাম্মাদকে) বসাবেন।”[492]

---

491 খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, তাহকিক : আদিল আলু হামদান, বর্ণনা নং : ২২৫৯; খ. ৩, পৃ. ২৯৯; আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ,*** তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান, বর্ণনা নং : ৫০, পৃ. ১৮০; আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ,*** তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি, পৃ. ৭০, **বর্ণনার মান :** *ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ* কিতাবটির মুহাক্কিক মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান বলেছেন, ‘ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা গ্রন্থে (১/৪৩৫) উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বর্ণনাটির কোনোরূপ সমালোচনা করেননি।’ আমার অনুজপ্রতিম তিলমিজ *আবুল কাসেমকে* দিয়ে মুহাক্কিক শাইখ উসামা আল-উতাইবি হাফিজাহুল্লাহর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম এই বর্ণনার মান সম্পর্কে, তিনি প্রশ্নের জবাবে বর্ণনাটিকে *সহিহ* বলেছেন। তাঁর দেওয়া জবাবের অডিয়ো রেকর্ড আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে; **রেকর্ডটি শুনতে এখানে দেখুন :** https://archive.org/details/20240529_20240529_1329।

492 আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ***, পৃ. ২৬১-২৬২, বর্ণনা নং : ৫৬; কাদি আবু ইয়ালা, ***ইবতালুত তাউয়িলাত***, খ. ২, পৃ. ৪৯২; জাহাবি, ***আল-আরশ***, খ. ২, পৃ. ৩২৩-৩২৪, বর্ণনা নং : ২৫৮; ইবনুল কাইয়্যিম, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ***, খ. ৪, পৃ. ১৩৮০; ইবনু উসাইমিন, ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া***, খ. ২, পৃ. ২৬৯-২৭০; ইবনু সিহমান, ***আদ-দিয়াউশ শারিক***, পৃ. ১৭৬-১৮০; **বর্ণনার মান :** ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ *‘বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ’* গ্রন্থে আরশের ওপর নবিজিকে বসানোর পক্ষে ইমাম দারাকুতনিরও যে মত ছিল, তার প্রমাণে এই কবিতাটি উল্লেখ করেছেন এবং *‘ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ’* কিতাবটির মুহাক্কিকগণ এই কবিতার সমালোচনা করেননি, সম্ভবত এর পক্ষে ইমাম মুজাহিদের বর্ণনা থাকার কারণে যা তাঁদের কাছে বিশুদ্ধ; পক্ষান্তরে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত কবিতার সূত্র অশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন

ইমাম দারাকুতনি যে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসানোর কথা বলেছেন, তা তাবেয়ি ইমাম মুজাহিদের বক্তব্য থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ নবিজিকে আল্লাহ আরশের ওপর বসাবেন। বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد : ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ قال : **يجلسه معه على العرش.**

"আল্লাহ বলেছেন, 'অবশ্যই আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)।' (সুরা ইসরা : ৭৯) এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেছেন, ***'আল্লাহ নবিজিকে তাঁর আরশের ওপর নিজের সাথে বসাবেন'।"***[493]

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এই বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে বর্ণনার পরম্পরা অনেক হওয়ার কারণে কতিপয় বিদ্বান বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।"[494]

ইমাম মুজাহিদের উক্ত বর্ণনাকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ইমাম আজুর্রি, ইমাম

আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা*** (রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৫৬।

[493] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, তাহকিক : আদিল আলু হামদান, বর্ণনা নং : ২৪০-২৪১, খ. ১, পৃ. ১৬২-১৬৩, সনদ : সহিহ।

[494] ইবনু উসাইমিন, ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া***, খ. ২, পৃ. ২৭০।

ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, হাফিজ জাহাবি, প্রথম গ্র্যান্ড মুফতি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম-সহ একদল সালাফি উলামা বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন।[495]

পূর্ববর্তী হাদিসবেত্তা বিদ্বানদের কেউ এই বর্ণনাকে অশুদ্ধ বলেছেন বলে জানা যায় না, বিশেষত শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর পূর্ববর্তী উলামাদের বক্তব্যে এমনটি পাওয়া যায় না। বরং তাঁরা এই বর্ণনাটিকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, এমনকি বর্ণনাটিকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর উলামাদের ইজমা তথা মতৈক্যও সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আলবানি রাহিমাহুল্লাহকে দেখা যায়, তিনি ইমাম মুজাহিদের বর্ণনাকে অশুদ্ধ বলেছেন এবং বর্ণনাটিকে শুদ্ধ বলার জন্য হাফিজ যাহাবির সমালোচনা করেছেন।[496]

ইমাম আলবানির বক্তব্যকে সঠিক ধরে নেওয়া হলেও আমরা যে বিষয়টি প্রমাণ করতে চাইছি, সেটার ক্ষেত্রে তা কোনো বিরূপ প্রভাব

---

[495] ***দ্রষ্টব্য :*** তাফসিরুত তাবারি, খ. ১৫, পৃ. ১৪৫; খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, খ. ১, পৃ. ২০৯; জাহাবি, ***আল-আরশ***, খ. ২, পৃ. ১৫৩; বর্ণনা নং : ১২৯; *আল-আরশ* কিতাবে আরও দেখুন : ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ২৪৪ নং বর্ণনা; আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া***, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকল ওয়ান-নাকল***, খ. ৫, পৃ. ২৩৭; ইবনুল কাইয়্যিম, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ***, খ. ৩, পৃ. ১৩৮০; প্রথম গ্র্যান্ড মুফতির মাজমুউ ফাতাওয়া, খ. ২, পৃ. ১৩৬।

[496] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***মুখতাসারুল উলু লিল আলিয়্যিল আজিম*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৪-১৭।

ফেলবে না। কারণ আমরা বলতে চাইছি, আহলুস সুন্নাহর অসংখ্য ইমাম আল্লাহর জন্য বসা বা উপবেশন সাব্যস্ত করেছেন; বিধায় কেউ তা সাব্যস্ত করলে তাকে *বিদাতি* বা *পথভ্রষ্ট* বা *আকিদাবিভ্রান্ত* বলা যাবে না এবং এই আকিদাকে *'বিদাতি ও ভ্রান্ত আকিদা'* আখ্যা দেওয়া যাবে না।

যদিও ইমাম মুজাহিদের বর্ণনা সুন্নাহপন্থি উলামাদের কাছে সাদরে গৃহীত হওয়ায় এবং এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হওয়ায় বর্ণনাটিকে সহজেই বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোনো দুর্বল হাদিসও যদি হাদিসের হাফিজ ইমামগণের কাছে সাদরে গৃহীত হয় এবং হাদিসটি এমন সনদ-সংবলিত হয়, যা অন্যের সাহায্যে বলদৃপ্ত হতে পারে, তাহলে উক্ত হাদিস বিশুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে। অসংখ্য ইমাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন এবং এ অনুযায়ী আমল করেছেন। যেমন ইমাম শাফিয়ি,[497] ইমাম আহমাদ

---

[497] মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফিয়ি, ***আর-রিসালা***, তাহকিক : আহমাদ শাকির (মিশর : মুস্তাফা আল-বাবি প্রমুখ কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৭ হি./১৯৩৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৯-১৪২।

বিন হাম্বাল,[498] ইমাম তিরমিজি,[499] ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র,[500] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম,[501] হাফিজ ইবনু হাজার,[502] বিখ্যাত উসুলবিদ

---

[498] কাদি আবু ইয়ালা ইবনুল ফার্রা, ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ***, তাহকিক : আহমাদ আল-মুবারাকি (২য় প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৯৩৮; খালিদ আর-রিবাত ও তাঁর সঙ্গীবর্গ, ***আল-জামি লি উলুমিল ইমাম আহমাদ*** (মিশর, দারুল ফালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৯৬।

[499] আবু ইসা আত-তিরমিজি, ***সুনানুত তিরমিজি***, তাহকিক : আহমাদ শাকির প্রমুখ (মিশর : মুস্তাফা আল-বাবি প্রমুখ কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), হা. ১৮৮ ও ২১২২ – এর আলোচনা, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫।

[500] আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ***, তাহকিক : মুস্তাফা বিন আহমাদ ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির (মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্র. ১৩৮৭ হিজরি), খ. ১৬, পৃ. ২১৮-২১৯।

[501] মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন***, তাহকিক : মাশহুর হাসান আলু সালমান (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হিজরি), খ. ২, পৃ. ৩৪৪-৩৫৪।

[502] আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি বি শারহি সহিহিল বুখারি*** (বৈরুত : দারুল মারিফা, শাইখ ইবনু বাজের টীকা-সংবলিত, প্র. ১৩৭৯ হিজরি), খ. ৫, পৃ. ৩৭৭।

মুহাদ্দিস জারকাশি,[503] হাফিজ সাখাউয়ি,[504] হাফিজ সুয়ুতি,[505] শাইখ আলবানি[506] রাহিমাহুমুল্লাহ।

ইমাম মুজাহিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন,

وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة، كحديث قعود الرسول ﷺ على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه، ويتلقونه بالقبول.

"এক্ষেত্রে সালাফদের থেকে কতিপয় বর্ণনা পাওয়া যায়, যা কতিপয় বর্ণনাকারী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমন আরশের ওপর

---

503 বাদরুদ্দিন আজ-জারকাশি, ***আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ***, তাহকিক : জাইনুল আবিদিন বিন মুহাম্মাদ (রিয়াদ : আদওয়াউস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯০।

504 শামসুদ্দিন আস-সাখাউয়ি, ***ফাতহুল মুগিস বি শারহি আলফিয়্যাতিল হাদিস***, তাহকিক : আলি হুসাইন আলি (মিশর : মাকতাবাতুস সুন্নাহ ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫০।

505 জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, ***আল-বাহরুল্লাজি জাখার ফি শারহি আলফিয়্যাতিল আসার***, তাহকিক : আবু আনাস আল-উন্দুনুসি (সৌদি আরব : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা), খ. ৩, পৃ. ১২৭৪-১২৮২।

506 মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা*** (রিয়াদ : দারুল মাআরিফ ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৮৬; মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন আল-কাসিমি, ***আল-মাসহু আলাল জাওরাবাইনি ওয়ান নালাইন***, তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি), পৃ. ৪২।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপবেশন সংক্রান্ত হাদিস। কিছু বর্ণনাকারী উক্ত হাদিস অনেকগুলো মারফু সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর সবই বানোয়াট হাদিস। এক্ষেত্রে প্রমাণিত বিষয় কেবল সেটাই, যা মুজাহিদ ও অপরাপর সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সালাফগণ ও ইমামগণ আলোচ্য বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা এর প্রতিবাদ করেননি, বরং বর্ণনাটিকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন।”[507]

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ২৪১ হি.) অনুরূপ কথা বলেছিলেন। বর্ণিত হয়েছে,

وقال ابن عمير : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث مجاهد «يقعد محمدًا على العرش» فقال : قد تَلَقَّته العلماء بالقَبُول، نُسَلِّم الخبر كما جاء.

“ইবনু উমাইর বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বালকে বলতে শুনেছি, তাঁকে মুজাহিদের এই হাদিস প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে, *‘তিনি মুহাম্মাদকে আরশের ওপর বসাবেন।’* তখন তিনি (আহমাদ বিন হাম্বাল) বলেন, ‘উলামাগণ এই হাদিসকে

---

[507] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকল***, তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৭।

সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন; বর্ণনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, আমরা ঠিক সেভাবেই তা মেনে নিব'।"[508]

ইমাম শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) আলোচ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

ورفعه بعضهم من حديث ابن عمر وإسناده واه لا يثبت، وأما عن مجاهد فلا شك في ثبوته.

"কতিপয় বর্ণনাকারী বর্ণনাটিকে ইবনু উমারের মারফতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই বর্ণনার সনদ দুর্বল, সনদটি প্রমাণিত নয়। পক্ষান্তরে মুজাহিদ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।"[509]

উপরন্তু এ বিষয়টি সর্ববাদিসম্মত। অসংখ্য ইমাম আলোচ্য বর্ণনাটির পক্ষে ইজমা তথা মতৈক্য বর্ণনা করেছেন। যেমন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করে বলেছেন,

---

[508] কাদি আবু ইয়ালা, ***ইবতালুত তাবিলাত লি আখবারিস সিফাত,*** তাহকিক : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আন-নাজদি (কুয়েত : দারু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), বর্ণনা নং : ৪৪৮, পৃ. ৫২০।

[509] শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি, ***আল-আরশ***, তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি (মদিনা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমি গবেষণা পর্ষদ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৭৭-২৭৮।

فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون : أن محمدا رسول الله ﷺ يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد؛ في تفسير : ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا - وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر -.

"সন্তোষভাজন উলামা ও গ্রহণযোগ্য অলিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রব আরশের ওপর নিজের সাথে বসাবেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ফুদাইল, লাইস থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ থেকে— *'অবশ্যই আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)'* – আয়াতটির তাফসিরে। এই ব্যাখ্যা অন্যান্য সনদেও মারফু ও গাইরে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জারির উল্লেখ করেছেন, উক্ত ব্যাখ্যা বিপুলসংখ্যক হাদিসে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মাকামে মাহমুদ মানে শাফায়াত; যা ইসলামের প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ইসলামের দাবি করেন, এমন সকল ব্যক্তিবর্গের ইমামগণের ঐক্যমত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। তাঁদের কেউই বলেননি, 'নবিজিকে আরশের ওপর বসানো খারাপ বিষয়।' কেবল কতিপয়

জাহমিই এ বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁরা এও বলেননি যে, উক্ত আয়াতের তাফসিরে এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করা মন্দ বিষয়।”[510]

আর গ্রহণযোগ্য ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিষয় মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সুসাব্যস্ত ইজমা শরিয়তের একটি বিশুদ্ধ দলিল।[511]

অধিকন্তু যারা ইমাম মুজাহিদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী অনেক ইমাম অত্যন্ত কঠোর বক্তব্য দিয়েছেন এবং তাদেরকে *বিদাতি* বলে রায় দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা আমরা আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহর বক্তব্য উদ্ধৃত করার সময় পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

৩. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন,

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو قعود البدن ، **فما جائت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود و الجلوس في حق الله تعالى**

---

510 আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম***, সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম (মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৭৪।

511 **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আব্দুল আজিজ আর-রইস, ***আল-ইকনা ফি হুজ্জিয়্যাতিল ইজমা*** (মদিনা : দারুল ইমাম মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হিজরি), পৃ. ১৩-১৮।

-كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما- أولى ألا يماثل صفات أجسام العباد.

"যেহেতু কবরের মধ্যে মৃতব্যক্তির বসার ব্যাপারটি দৈহিক উপবেশন নয়, **সেহেতু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মহান আল্লাহর ব্যাপারে *'বসা'* ও *'উপবেশন'* প্রভৃতি শব্দ সাব্যস্ত করে যেসব বর্ণনা এসেছে,** যেমন জাফার বিন আবু তালিব ও উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখের হাদিস, সেসব বর্ণনাকে বান্দাদের দৈহিক গুণাবলির সাথে সাদৃশ্য না দেওয়ার বিষয়টি আরও বেশি উপযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ।"[512]

এ জাতীয় বর্ণনা দিয়ে সমকালীন আকিদা-গবেষকদের অনেকেই প্রমাণ করেছেন, ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর জন্য *'জুলুস'* তথা *'উপবেশন'* সাব্যস্ত করতেন। যদিও ইবনু তাইমিয়ার প্রকৃত মত কী, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট আকিদাবিশারদ শাইখ ফারিস আল-আজমি হাফিজাহুল্লাহর ফতোয়ায় এ বিষয়টি আলোচিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) তাঁর বিখ্যাত *'নুনিয়্যাহ'* কাব্যে বলেছেন,

---

[512] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***শারহু হাদিসিন নুজুল***, তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-খুমায়্যিস (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪০০।

ولقد أتى **ذكر الجلوس به** وفي * أثر رواه جعفر الرباني

أعني ابن عم نبينا وبغيره * أيضاً أتى والحق ذو تبيان

والدارقطني الإمام يثبت الـ * آثار في ذا الباب غير جبان

“আল্লাহর সাথে তাঁর বসার কথা বর্ণিত হয়েছে; উল্লিখিত হয়েছে আল্লাহওয়ালা জাফার বর্ণিত হাদিসে। জাফার বলতে আমি বোঝাচ্ছি, আমাদের নবিজির ভাইপোকে। তিনি ছাড়াও অন্যদের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, বিষয়টি যে একেবারে ধ্রুবসত্য। **এ বিষয়ে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে সাহিসকতার সাথে সাব্যস্ত করেছেন ইমাম দারাকুতনি।**”[513]

৫. নাজদি দাওয়াতের প্রথিতযশা বিদ্বান ইমাম সুলাইমান বিন সিহমান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৪৯ হি.) নাজদি দাওয়াতের শত্রু জামিল জাহাউয়ি আল-ইরাকির খণ্ডন করে গ্রন্থ রচনা করেন। ইরাকি বলেছিল, “এই লোকের (ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের) ব্যাপারটি বড়োই অদ্ভুত। সে আল্লাহর তাওহিদের এবং আল্লাহকে শির্ক থেকে পবিত্রকরণের দাবি করে মানুষদের ধোঁকা দেয় আর বলে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে তাওয়াসসুল (সাহায্যপ্রার্থনা) করা শির্ক। অথচ সে নিজেই *‘আরশের ওপর আল্লাহর ইস্তিওয়া’* – এর ব্যাপারে

---

[513] ইবনু উসাইমিন, ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়াহ***, খ. ২, পৃ. ২৬৯-২৭০; **এছাড়াও দেখুন :** ইবনুল কাইয়্যিম, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক***, খ. ৩, পৃ. ১০৯৫-১০৯৬।

ব্যক্ত করে, এটি আরশের ওপর বসার অনুরূপ। এছাড়াও সে আল্লাহর হাত, চেহারা এবং দিক সাব্যস্ত করে।”

ইমাম ইবনু সিহমান বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর এর প্রামাণ্য খণ্ডন করেন। বসার ব্যাপারে তিনি বলেন,

وأما قوله : (**يفصح عن استواء الله تعالى على العرش بمثل الجلوس عليه).** فالجواب أن نقول : قد جاء الخبر بذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.... **فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام، فلا عبرة بمن خالفهم من الطغام أشباه الأنعام.**

“আর সে বলেছে, ***‘অথচ সে নিজেই “আরশের ওপর আল্লাহর ইস্তিওয়া” – এর ব্যাপারে ব্যক্ত করে, এটি আরশের ওপর বসার অনুরূপ।’*** এর জবাবে আমরা বলব, এ বিষয়ে সংবাদ বর্ণিত হয়েছে আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।... (ইমামদের বক্তব্য এনে দীর্ঘ জবাব দেওয়ার পর ইবনু সিহমান বলেন :) **মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইমামদের থেকে যখন বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন চতুষ্পদ জন্তুর মতো ইতর লোকজন ওই ইমামদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে তাতে কোনো যায় আসে না।”**[514]

---

[514] সুলাইমান ইবনু সিহমান, ***আদ-দিয়াউশ শারিক ফি রদ্দি শুবুহাতিল মাজিকিল মারিক***, তাহকিক : আব্দুস সালাম বিন বারজিস (রিয়াদ : রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৭৬-১৮০।

৬. নাজদি দাওয়াতের অন্যতম বিদ্বান, ইমাম ইবনু উসাইমিন-সহ আরও অসংখ্য বিদ্বানের মহান উস্তাজ, ইমাম আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৭৬ হি.) বলেছেন,

فكذلك نثبت أنّه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سواء فُسِّر ذلك بالإرتفاع أو بعلوّه على عرشه ، **أو بالإستقرار أو بالجلوس. فهذه التّفاسير واردة عن السلف،** فنُثْبِتْ لله على وجه لايماثله ولايشابهه فيها أحد ، **ولامحذور في ذلك إذا قرنّا بهذا الإثبات نفي مماثلة المخلوقات.**

"অনুরূপভাবে আমরা সাব্যস্ত করি, আল্লাহ আরশের ওপর *'ইস্তিওয়া'* করেছেন সেভাবে, যেভাবে তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই হয়। **চাই এই ইস্তিওয়াকে *'আরশের ওপর ওঠা ও আরোহণ করা'* বলে ব্যাখ্যা করা হোক, আর চাই একে *'আরশের ওপর স্থায়ী হওয়া ও বসা'* বলে ব্যাখ্যা করা হোক। এই ব্যাখ্যাগুলো সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।** সুতরাং আমরা এগুলোকে আল্লাহর জন্য সেভাবেই সাব্যস্ত করি, যেক্ষেত্রে কেউ আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। **এসব ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করায় কোনো বাধা নেই, যদি আমরা এগুলো সাব্যস্ত করার**

সাথে এ বিষয়টিকেও যুক্ত করে দিই যে, আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মতো নন।”[515]

৭. সৌদি আরবের প্রথম গ্র্যান্ড মুফতি, যুগশ্রেষ্ঠ ফাকিহ, পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ইমাম ইবনু বাজ ও ইমাম ইবনু হুমাইদ প্রমুখের মহান উস্তাজ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৮৯ হি.) *মাকামে মাহমুদের* ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,

قيل الشفاعة العظمى، **وقيل إِنه إِجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أَهل السنة.** والظاهر أَن لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما بأَن كلاهما من ذلك. والإِقعاد على العرش أَبلغ.

“কেউ বলেন, এর মানে বড়ো শাফায়াত। **আবার কেউ কেউ বলেন, *মাকামে মাহমুদ* মানে আরশের ওপর নবি মুহাম্মাদকে নিজের সাথে বসানো। যেমনটি আহলুস সুন্নাহর একটি সুপ্রসিদ্ধ অভিমত।** এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য কথা হলো— উভয় মতের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। দুটো মতের মাঝেই এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, দুটো বিষয়ই

---

515 আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি, ***আল-আজউয়িবাতুস সাদিয়্যা আনিল মাসায়িলিল কুওয়াইতিয়্যা***, তাহকিক : ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ, তাহকিক-সম্পাদনা : গ্রন্থটির তাহকিক সম্পাদনা করেছেন *‘শাইখুল হানাবিলা’* খ্যাত ইমাম আব্দুল্লাহ আল-আকিল রাহিমাহুল্লাহ (কুয়েত : মারকাজুল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাতিল কুওয়াইতিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৪৭।

মাকামে মাহমুদের অন্তর্গত। আর আরশের ওপর বসানোর বিষয়টি অধিকতর পরিপূর্ণ।”[516]

৮. সৌদি আরবের বিশিষ্ট কিবার উলামাদের অন্যতম, আকিদার শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান, আল্লামা আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৬০ হি.) *ইবাদিয়্যা* ফের্কার জনৈক খারেজিকে খণ্ডন করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি পড়ে তাতে ভূমিকা লিখেছেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ। শাইখ রাজিহি হাফিজাহুল্লাহ বইটিতে লিখেছেন,

قال خارجة : وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. وهذا كلام صحيح لا غبار عليه نعم وهل يكون الاستواء إلا بجلوس وهذا من معاني الاستواء فإن الاستواء في اللغة له عدة معان ويعرف كل معنى بحسب اللفظ والسياق **ومن سياق الآية عرفنا أن المقصود بقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) أي على العرش علا وجلس،** ولكن على ما يليق بجلاله جل وعلا. ولا نكيف ذلك ولا نؤوله ولا نعطله ولا نمثله، وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله : **(الاستواء معلوم) أي نعرفه من لغتنا وهو العلو والارتفاع والجلوس والاستقرار.**

“খারিজা বিন মুসআব বলেছেন, ‘উপবেশন (বসা) ছাড়া কি ইস্তিওয়া হয়?!’ এটা সঠিক কথা, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। হ্যাঁ,

---

[516] মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ***ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল***, সংকলন ও বিন্যাস : মুহাম্মাদ আল-কাসিম (মক্কা : মাতাবায়াতুল হুকুমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.), খ. ২, পৃ. ১৩৬।

উপবেশন (বসা) ছাড়া কি ইস্তিওয়া হয়?! এটা ইস্তিওয়ার একটি অন্যতম অর্থ। কেননা আরবি ভাষায় 'ইস্তিওয়া' শব্দের বেশকিছু অর্থ রয়েছে। শব্দের প্রয়োগ, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি ও কথার প্রসঙ্গ অনুযায়ী সেসব অর্থ প্রযোজ্য হয়ে থাকে। **আয়াতের প্রসঙ্গ থেকে আমরা জানি, *'দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন*[517]'– এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে— তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন এবং বসেছেন।** কিন্তু এটা সেভাবেই, যেভাবে তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই হয়। আমরা এর ধরন বর্ণনা করি না, অপব্যাখ্যা করি না, বিলকুল অস্বীকার বা অর্থ-অস্বীকার করি না এবং কারও সাথে সাদৃশ্যও দিই না। এটাই ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর এই কথার অর্থ যে, **'আরশে আরোহণের বিষয়টি বিদিত (জ্ঞাত)।' অর্থাৎ আমরা আমাদের ভাষা থেকে জানি, এর মানে— আরোহণ করা, ওঠা, বসা এবং স্থায়ী হওয়া বা স্থিতিগ্রহণ করা।"**[518]

৯. আকিদার বিশিষ্ট পণ্ডিত, বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাকিহ ও উসুলবিদ, আল্লামা সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৭৮ হি.) বলেছেন,

---

[517] সুরা তহা : ৫।

[518] আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি, ***কুদুমু কাতায়িবিল জিহাদ লি গাজউয়ি আহলিজ জানদাকাতি ওয়াল ইলহাদ***, বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১০১।

وهناك بعض الآثار يثبتها أهل السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواء، منها أثر مجاهد في قوله عز وجل : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا [الإسراء : 79] وأن يجلسه تعالى على عرشه، لكن ما جاءت به أحاديث مرفوعة، وهذا الأثر كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن، ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال : لا أقول به، **ومن كان من أهل السنة أثبته؛ لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه ما فيه من التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس، فأوضح أن الاستواء بمعنى الجلوس؛ إجلاس النبي ﷺ مع الرب عز وجل على العرش.**

“ইস্তিওয়া সিফাত সাব্যস্ত করার জন্য সার্বিকভাবে আহলুস সুন্নাহ কতিপয় বর্ণনা সাব্যস্ত করে থাকে। তারমধ্যে তাবেয়ি মুজাহিদের বক্তব্য অন্যতম। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘অবশ্যই আপনার রব আমাকে উন্নীত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)।’[519] আয়াতে বর্ণিত *মাকামে মাহমুদের* ব্যাখ্যায় তাবেয়ি ইমাম মুজাহিদ বলেছেন, *‘আল্লাহ নবিজিকে তাঁর আরশের ওপর বসাবেন।’* কিন্তু এ ব্যাপারে নবিজির বক্তব্য বর্ণিত হয়নি। যখন কুরআনকে সৃষ্টবস্তু বলার ফিতনা সংঘটিত হয়, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতকে ফিতনার জামানায় উল্লিখিত বক্তব্য দিয়ে মানুষদের পরীক্ষা করা হতো। যারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা এ বক্তব্য অস্বীকার করে বলত,

---

[519] সুরা ইসরা : ৭৯।

‘আমি এ ধরনের কথা বলি না।’ **আর আহলুস সুন্নাহর লোকেরা বক্তব্যটি সাব্যস্ত করত। কেননা এক্ষেত্রে নবিজিকে বসানোর বিষয়টি উদ্দিষ্ট ছিল না। বরং এতে উদ্দিষ্ট বিষয় ছিল— ইস্তিওয়ার সুস্পষ্ট বিবৃতি, যার অর্থ উপবেশন করা তথা বসা। আরশের ওপর মহান রবের সাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসানোর বিবৃতি স্পষ্ট করে দিয়েছে, ইস্তিওয়ার মানে উপবেশন করা।”**[520]

আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ আকিদার অনেক বড়ো বিদ্বান। বর্তমান যুগে হাতেগোনা কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আকিদার পণ্ডিতের মধ্যে তিনি থাকবেন, ইনশাআল্লাহ। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি ইমাম আবু দাউদের একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) ইমাম মুজাহিদের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলেন,

من أنكر هذا فهو عندنا متهم وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء.

“যে ব্যক্তি এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে, সে আমাদের নিকট (দুষ্ট আকিদার অভিযোগে) অভিযুক্ত।” তিনি আরও বলেন, “লোকেরা সর্বদাই এ বক্তব্যটি বর্ণনা করে আসছে জাহমিদের ক্ষেপিয়ে তোলার

---

520 সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ, ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা*** (কায়রো : মাকতাবাতু দারিল হিজাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হিজরি), পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

জন্য। কারণ জাহমিরা আরশের ওপর কোনোকিছুর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না।”[521]

ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব বিন আব্দুল হাকাম আল-ওয়াররাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫০ হি.) ইমাম মুজাহিদের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন,

من رد هذا الحديث فهو جهمي.

“এই হাদিস যে প্রত্যাখ্যান করে, সে জাহমি।”[522]

ইমাম ইসহাক বিন রাহাওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন,

الإيمان بهذا الحديث والتسليم له، من رد هذا الحديث فهو جهمي.

“এই হাদিসের প্রতি ইমান রাখা এবং হাদিসটি মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই হাদিস যে প্রত্যাখ্যান করে, সে জাহমি।”[523]

ইমাম ইবনু বাত্তাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৭ হি.) ইমাম আবু বাকার আন-নাজ্জাদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৪৮ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আন-নাজ্জাদ উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

---

521 আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, তাহকিক : আতিয়্যা আজ-জাহরানি (রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হিজরি), খ. ১, পৃ. ২১৪-২১৫, **বর্ণনার মান :** সহিহ।

522 আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, খ. ১, পৃ. ২৪৮, **বর্ণনার মান :** সহিহ।

523 আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ২১৭।

فلزمنا الإنكار عَلَى من رد هَذِهِ الفضيلة الَّتِي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالكة.

"সুতরাং উলামাদের ব্যক্তীকৃত ও উলামাগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত এই মাহাত্ম্যকে যে ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করে, তার প্রতিবাদ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। যে ব্যক্তি উক্ত মর্যাদা (আরশের ওপর বসানোর মর্যাদা) প্রত্যাখ্যান করে, সে পথভ্রষ্ট ফের্কাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।"[524]

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, সমকালীন উলামাদের মধ্যে যাঁরা আরশের ওপর আল্লাহর বসা বা উপবেশন অস্বীকার করেছেন, কিংবা ইমাম মুজাহিদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁরা কি সালাফদের বক্তব্য অনুযায়ী জাহমি-মতাদর্শে পতিত হচ্ছেন না? এর জবাব হচ্ছে, না, তাঁরা জাহমি-মতাদর্শে পতিত হচ্ছেন না। কারণ সালাফদের যুগে যারা ইমাম মুজাহিদের বক্তব্য অস্বীকার করত, তারা মূলত *'আল্লাহর সাথে আরশের ওপর বসানো'* সাব্যস্ত করলে তাজসিম (দেহবাদ) বা তাশবিহ (সাদৃশ্যবাদ) হয়ে যাবে মনে করে অস্বীকৃতি জানাত। এতদ্ব্যতীত উক্ত বর্ণনা মেনে নিলে আল্লাহকে আরশের ওপর মেনে নেওয়া হয়ে যায়, বলেই তারা বর্ণনাটিকে প্রত্যাখ্যান করত; যেহেতু

---

[524] কাদি আবু ইয়ালা, ***ইবতালুত তাবিলাত,*** বর্ণনা নং : ৪৪৮, পৃ. ৫২০; ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা***, তাহকিক : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকি (কায়রো : মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১১।

তাদের আকিদা অনুযায়ী আরশের ওপর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে আমাদের কতিপয় সমকালীন উলামা এসব উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যান করেননি। উপরন্তু তাঁরা এটা স্বীকার করেন যে, আল্লাহ আরশের ওপর আছেন এবং তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন; যা পুরোপুরি জাহমি-মতাদর্শের খেলাপ।

আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

وأن قول الجهمية : إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن عز وجل وإنما هو سبحانه وتعالى في كل مكان. أنه قول باطل؛ **لأن استوى في اللغة بمعنى علا وارتفع ارتفاعا خاصا، ويكون معناه أيضًا : علا وارتفع واستقر وجلس.**

“জাহমিরা বলে, আরশের ওপর দয়াময় আল্লাহ ইস্তিওয়া (আরোহণ) করেননি। বরং মহান আল্লাহ রয়েছেন সব জায়গায়। তাদের এই বক্তব্য বাতিল। **কারণ আরবি ভাষায় ইস্তাওয়া মানে— বিশেষভাবে আরোহণ করেছেন এবং ওঠেছেন। এর আরও অর্থ হয়— তিনি আরোহণ করেছেন, ওঠেছেন, স্থায়ী হয়েছেন এবং বসেছেন।”**[525]

১০. বর্তমান যুগের বিশিষ্ট আকিদাবিশারদ, পুরো দুনিয়ার হাতে গোনা কয়েকজন আকিদা-বিশেষজ্ঞ সালাফি বিদ্বানের অন্যতম শাইখ

[525] সালিহ আলুশ শাইখ, ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা***, পৃ. ২৩১।

ফারিস বিন আমির আল-আজমি হাফিজাহুল্লাহ এ বিষয়ে তাঁর অফিসিয়াল *‘কিউরিয়াসক্যাট’* অ্যাকাউন্টে ফতোয়া দিয়েছেন। **শাইখ** ফারিস আল-আজমি প্রদত্ত ফতোয়া নিম্নরূপ—

السؤال : هل ابن تيمية يثبت صفة الجلوس لله تعالى؟

الجواب : ثم خلاف بين الدارسين في كونه يقول بذلك أو لا، **وعندي أنه يقول به، تبعا لجماعات من أئمة الحديث**، بل أئمة الحديث كفروا من لم يقل به، وأعني بأئمة الحديث : الطبقات المتقدمة. لكن كثير من المعاصرين من السلفية لا يقولون به، **ويقابلهم طائفة يذهبون إليه متمسكين بكلام المتقدمين، وهو الحق عندي الذي لا ينبغي العدول عنه.**

প্রশ্ন : **“ইবনু তাইমিয়া কি মহান আল্লাহর জন্য ‘জুলুস’ তথা ‘বসা বা উপবেশন’ সিফাত সাব্যস্ত করেছেন?”**

উত্তর : “গবেষকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি সাব্যস্ত করেছেন, না করেননি। **আমার মতে, হাদিসের কয়েকদল ইমামের অনুসরণ করে তিনি উক্ত সিফাত সাব্যস্ত করেছেন।** আমি ‘হাদিসের ইমামগণ’ বলে পূর্ববর্তী স্তরের বিদ্বানগণকে উদ্দেশ্য করছি। কিন্তু সমকালীন সালাফিদের অনেকেই (অনেক গবেষকই) এই মত পোষণ করেন না। পক্ষান্তরে তাঁদের বিপরীতে আরেকদল গবেষক পূর্ববর্তী বিদ্বানদের বক্তব্য আঁকড়ে ধরে এই মত (‘জুলুস’ সিফাত

সাব্যস্তকরণের মত) পোষণ করেন; **আর আমার কাছে এ মতটিই হক, যা থেকে ভিন্নমতের দিকে সরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।”**[526]

১১. হাদিস ও আকিদার বিশিষ্ট বিদ্বান শাইখ ড. উসামা বিন আতায়া আল-উতাইবি হাফিজাহুল্লাহ আল্লাহর বসা সাব্যস্তের পক্ষে ইমাম দাশতি হাম্বালির লেখা *‘ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ’* বইটির তাহকিক করেছেন। শাইখ উসামা বাংলাদেশে আহলেহাদিসদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় হায়ার স্টাডিজ বিভাগে উলুমুল হাদিস পড়িয়ে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ তাঁর একটি *‘ফেসবুক-পোস্টে’* বলেছেন,

تفسير الاستواء بالجلوس ثابت عن السلف، وبه قال جماعة من أئمة الدين من كبار علماء الأمة. فعيب شخص بهذا ليس في محله لكونه مسبوقا من السلف وله أدلة، **فحتى لو كان خطأً فهو لا يشنع عليه به.**

“*‘ইস্তিওয়া’* শব্দের ব্যাখ্যায় *‘বসা (জুলুস)’* কথাটি সালাফদের থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। উম্মতের কিবার উলামাদের মধ্য থেকে একদল দিনের ইমাম এ মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং ‘ইস্তাওয়া’ মানে ‘বসেছেন’ বলার দরুন কোনো ব্যক্তিকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।

---

[526] ফারিস আল-আজমি (IFALajmi), ***“হাল ইবনু তাইমিয়া ইউসবিতু সিফাতাল জুলুসি লিল্লাহি তাআলা”***, কিউরিয়াসক্যাট (একটি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম), পোস্ট পাবলিশের তারিখ : ১১ই জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ, https ://curiouscat.live/IFALajmi/post/1224061534।

যেহেতু এ বিষয়টি ইতঃপূর্বে সালাফগণ বলেছেন এবং বিষয়টির পক্ষে দলিলপ্রমাণও রয়েছে। **তদুপরি এই ব্যাখ্যাকে যদি ভুলও ধরে নেওয়া হয়, তবুও উক্ত ব্যাখ্যা করার কারণে কারও নিন্দা করা যাবে না।”**[527]

১২. দুই বাংলার যশস্বী ও প্রতিভাবান দায়ি, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, আকিদা বিষয়ে নানাবিধ বইয়ের রচয়িতা, উস্তাজ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী হাফিজাহুল্লাহ *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, “**ওঠার মানেটাই করতে হবে, তা নয়। আর এই মানেগুলো যে ভুল, তা নয়। যেমন বলছি যে, বসার মানে যদি হয়, তাহলে তাতে ক্ষতি হবে না।** যেহেতু ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সাওয়ায়িকুল মুরসালাহতে তিনি খারেজা বিন মুসআব থেকে বর্ণনা করেছেন, الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ‘দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তাওয়া (আরোহণ) করেছেন।’ (সুরা তহা. ৫) এর তফসিরে বলেছেন, هل يكون الاستواء إلا الجلوس**।... বসার মানেটা তিনি বলছেন, ইস্তিওয়া কি বসা ছাড়া হয়?... তো এতে এমনকিছু খারাপি**

---

527 দ্রষ্টব্য : https://www.facebook.com/share/p/fTXxYAUrveiGmkMZ/?mibextid=oFDknk।

হয়ে যায় না, যদি কেউ বলে, সমারূঢ়, যদি কেউ বলে, সমাসীন, যদি কেউ বলে, সমুন্নত। এগুলোতে এমনকিছু দোষ নেই।”[528]

১২. বাংলাদেশের দায়ি ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া সম্পাদিত একটি অনুবাদগ্রন্থেও আল্লাহর জন্য *‘উপবেশন তথা বসা’* সাব্যস্ত করা হয়েছে। মূল রচনা ইমাম সাদি রাহিমাহুল্লাহর, যাঁর বক্তব্য আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। অনূদিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, “তিনি সৃষ্টিকুল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। **তিনি আমাদেরকে যেভাবে বলেছেন সেভাবে তিনি ‘আরশে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর উপবিষ্টটা আমাদের জ্ঞাত, কিন্তু উপবিষ্টের ধরণ আমাদের অজ্ঞাত। তিনি কুরআনে আমাদেরকে বলেছেন, তিনি ‘আরশে উপবিষ্ট, তবে কীভাবে উপবিষ্ট তা আমাদেরকে বলেন নি।**” (যদ্দৃষ্ট – সংকলক)[529]

এমনকি ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত *‘বসা’* অর্থের বিরোধিতা করেননি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে,

عثمان الدارمي في رده على بشر المريسي أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما رأي فضيلتكم؟

---

528 **দ্রষ্টব্য** : https://www.facebook.com/share/v/w7D3NHN9bywD9qBf/?mibextid=w8EBqM।

529 আব্দুর রহমান ইবন নাসির ইবন সা‘দী, ***অতি গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রশ্নোত্তর***, অনুবাদক : আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী, সম্পাদক : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (*ইসলামহাউজ ডট কমে* প্রকাশিত অন্তর্জালিক সংস্করণ), পৃ. ৬।

"ইমাম উসমান আদ-দারিমি যে বিশর আল-মারিসির খণ্ডনে কিতাব রচনা করেছেন, তাতে জানিয়েছেন, *'বসা'* অর্থেও *'ইস্তিওয়া'* শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?"

শাইখ ইবনু উসাইমিন উত্তরে বলেছেন,

الاستواء على الشيء في اللغة العربية يأتي بمعنى الجلوس، قال الله تعالى : ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾[الزخرف :12-13] ، والإنسان على ظهر الدابة جالس أم واقف؟ هو جالس، لكن هل يصح أن نعديه إلى استواء الله على العرش؟ هذا محل نظر، **فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا.**

"আরবি ভাষায় কোনোকিছুর ওপর *ইস্তিওয়া* করা *'বসা'* অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু, যেসবে তোমরা আরোহণ করো; যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার।' (সুরা যুখরুফ : ১২-১৩) মানুষ জন্তুর পিঠে বসে থাকে, না দাঁড়িয়ে থাকে? বসে থাকে। কিন্তু এটাকে আরশের ওপর আল্লাহর ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে কি আমরা প্রয়োগ করতে পারব? এটা গবেষণার বিষয়। **যদি সালাফদের থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা *'ইস্তিওয়া'* শব্দের ব্যাখ্যায়**

***'বসা'* উল্লেখ করেছেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে তাঁরাই অধিক অবগত বিবেচিত হবেন।"**[530]

অনুরূপভাবে বর্তমান যুগে আকিদার বিশিষ্ট বিদ্বান, আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক হাফিজাহুল্লাহও বলেছেন,

ورد في بعض الآثار نسبة الجلوس إلى الله تعالى، وأنه يجلس على كرسيه كيف شاء سبحانه . وربما أطلق بعض الأئمة هذا اللفظ أيضاً. وسياق كلام الشيخ (يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية) يشعر بأن الاستواء يتضمن القعود. لكن الأولى التوقف في إطلاق هذا اللفظ ؛ إلا أن يثبت.

"কিছু বর্ণনায় মহান আল্লাহর প্রতি বসার বিশেষণ যুক্ত করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর কুরসিতে বসেন। কখনো কখনো কতিপয় ইমাম (আল্লাহর শানে) *'বসা'* শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আর শাইখের (শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার) বক্তব্যের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, *'বসা'* অর্থটি *ইস্তিওয়ার* শামিল। কিন্তু এই শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো মত না দিয়ে ক্ষান্ত থাকাই অধিকতর উপযুক্ত; তবে বিষয়টি প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা।"[531]

শাইখ বাররাকও *'বসা'* বলার নিন্দা করেননি। বরং সালাফদের থেকে এরূপ তাফসির প্রমাণিত হলে যে তা বলা যাবে, সেটাও তাঁর ও

---

530 মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***লিকাউল বাবিল মাফতুহ***, লিকা নং : ১১, প্রশ্ন নং : ৪৫০।

531 আল-বাররাক, ***শারহুল আকিদাতিত তাদমুরিয়্যা***, পৃ. ২৮৩।

শাইখ ইবনু উসাইমিনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল্লাহ আরশের ওপর বসেছেন, আর তাঁর সদৃশ কিছুই নেই, তাহলে এ বিষয়টিকে বিদাতি বক্তব্য বলা দূরের কথা, উক্ত ব্যক্তিকে এজন্য দোষারোপ করা চলবে না এবং তার নিন্দাও করা যাবে না। যদি কোনো সালাফি ব্যক্তি এর নিন্দা করতে চায়, সে যেন ওপরে উল্লিখিত সালাফি আকিদার ইমামদের নিন্দা করে! আল-ইয়াজু বিল্লাহ। আমাদের মনে রাখা জরুরি, শরিয়তের যে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর ইজমা (মতৈক্য) সংঘটিত হয়েছে, কেবল সে বিষয়ের বিরোধিতা করার দরুন ব্যক্তিকে ভ্রষ্ট বা বিদাতি বলা যায়। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ মতভেদ করেছেন, সে বিষয়ের দরুন একে অপরকে বিভ্রান্ত বলা যায় না। আর মতভেদ জোরালো হলে অপরপক্ষকে নিন্দা করাও যায় না। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া-সহ আহলুস সুন্নাহর অসংখ্য ইমাম এ বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের ফলাফল

১. আল্লাহর গুণ *‘ইস্তিওয়া আলাল আরশের’* একাধিক অর্থ সালাফদের থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে।

২. সালাফদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহর গুণ হিসেবে আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অর্থ— আরোহণ করেছেন।

৩. সালাফদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের আরও দুটি অর্থ— *চড়েছেন* ও *ওঠেছেন।*

৪. *আরোহণ করেছেন, চড়েছেন* এবং *ওঠেছেন* – শব্দ তিনটির মর্মার্থ বাংলা ভাষায় এক ও অভিন্ন। তবে প্রতিশব্দ আনয়নের প্রয়োজন ব্যতিরেকে আল্লাহর শানে *‘চড়েছেন’* শব্দ ব্যবহার না করাই ভালো।

৫. সালাফদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের আরও একটি অর্থ— স্থায়ী অবস্থান নিয়েছেন। *ইস্তাকার্রা* শব্দের অর্থ হিসেবে *‘স্থায়ী অবস্থান নিয়েছেন’* বলা ভুল নয়।

৬. *আরোহণ করেছেন* ও *চড়েছেন* – বললে মাখলুকের সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য দেওয়া হয় না। যারা দাবি করেন, এসব শব্দ প্রয়োগ করলে সাদৃশ্য দেওয়া হয়ে যায়, তাঁদের বক্তব্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদাতি জাহমিয়া-আশারিয়া-মাতুরিদিয়া ফের্কার কথার সাথে মিলে যায়।

৭. আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অনুবাদ হিসেবে *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন’*– বলা থেকে আমরা বিরত থাকছি।

৮. আয়াতে বর্ণিত *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের অনুবাদ হিসেবে *‘আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন’*– বলা ভুল নয়। সমাসীন হওয়ার মানে কেবল *‘বসা’* বা *‘উপবেশন করাই’* হয় না, বরং *‘আরোহণ করা’*-ও সমাসীন হওয়ার একটি অন্যতম অর্থ।

১০. বসা অর্থে *সমাসীন* বলাটাও ভুল হবে না, আকিদার বড়ো বড়ো উলামার মতে। কারণ তাঁদের মতানুযায়ী সালাফদের থেকে *‘ইস্তাওয়া’* শব্দের ব্যাখ্যায় *‘বসেছেন’* কথাটি প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি ব্যাখ্যাটিকে ভুলও ধরে নেওয়া হয়, তথাপি এর দরুন কাউকে *‘ভ্রান্ত’* বা *‘তার আকিদা খারাপ’* এমন কথা বলা যাবে না। কারণ আহলুস সুন্নাহরই একদল বিশিষ্ট বিদ্বান এরূপ বক্তব্য দিয়েছেন এবং এখনও দিয়ে যাচ্ছেন।

সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ।

নিবন্ধের প্রমাণপঞ্জি

❑ **আরবি গ্রন্থপঞ্জি ও উৎসবিবরণী :**

১. ***আল-কুরআনুল কারিম***

২. মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফিয়ি (মৃ. ২০৪ হি.)। ***আর-রিসালা।*** তাহকিক : আহমাদ শাকির। মিশর : মুস্তাফা আল-বাবি প্রমুখ কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৭ হি./১৯৩৮ খ্রি.।

৩. মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***আস-সহিহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ মুস্তাফা দিব আল-বুগা। দেমাস্ক : দারু ইবনি কাসির, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

৪. ইমাম আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ইসা আত-তিরমিজি (মৃ. ২৭৯ হি.)। ***সুনানুত তিরমিজি।*** তাহকিক : আহমাদ শাকির প্রমুখ। মিশর : মুস্তাফা আল-বাবি প্রমুখ কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.।

৫. আবু জাফার ইবনু জারির আত-তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.)। ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন।*** মক্কা : দারুত তারবিয়াতি ওয়াত তুরাস, তাবি।

৬. আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১ হি.)। ***আস-সুন্নাহ।*** তাহকিক : আতিয়্যা আজ-জাহরানি। রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হিজরি।

৭. আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল। ***আস-সুন্নাহ।*** তাহকিক : আদিল আলু হামদান (সৌদি আরব : দারুল আওরাকিস সাকাফিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

৮. আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি (মৃ. ৩২৭ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম।*** তাহকিক : আসআদ মুহাম্মাদ আত-তাইয়্যিব। সৌদি আরব : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হিজরি।

৯. আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-আজুর্রি (মৃ. ৩৬০ হি.)। ***আশ-শারিয়া।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন উমার আদ-দুমাইজি। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১০. হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আল-লালাকায়ি (মৃ. ৪১৮ হি.)। ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।*** তাখরিজ : আবু ইয়াকুব নাশআত বিন কামাল আল-মিসরি। আলেকজেন্দ্রিয়া : মাকতাবাতু দারিল বাসিরা, তাবি।

১১. আবু উমার ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আত-তামহিদ।*** তাহকিক : মুস্তাফা বিন আহমাদ ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির। মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্র. ১৩৮৭ হিজরি।

১২. আবু বাকার আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি (মৃ. ৪৫৮ হি.)। ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-হাশিদি। জেদ্দা : মাকতাবাতুস সাওয়াদি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

১৩. আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ বিন হুসাইন ইবনুল ফার্রা (মৃ. ৪৫৮ হি.)। ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ।*** তাহকিক : আহমাদ আল-মুবারাকি। ২য় প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।

১৪. আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ বিন হুসাইন ইবনুল ফার্রা। ***ইবতালুত তাবিলাত লি আখবারিস সিফাত।*** তাহকিক : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আন-নাজদি। কুয়েত : দারু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.।

১৫. আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বিন মাসউদ আল-ফার্রা আল-বাগাউয়ি (মৃ. ৫১০ হি.)। ***মাআলিমুত তানযিল ফি তাফসিরিল কুরআন।*** তাহকিক : আব্দুর রাযযাক আল-মাহদি। বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হিজরি।

১৬. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫২৬ হি.)। ***তাবাকাতুল হানাবিলা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকি। কায়রো : মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.।

১৭. মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আর-রাজি (মৃ. ৬৬০ হি.)। ***মুখতারুস সিহাহ।*** বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান।

১৮. আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন আবুল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি (মৃ. ৬৬৫ হি.)। ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বিআন্নাহু কায়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ।*** তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান। ২য় প্রকাশ, ১৪৩৬ হিজরি।

১৯. আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন আবুল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি। ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বিআন্নাহু কায়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ।*** তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি। *কিতাব-অনলাইন ডট কমে* প্রকাশিত অন্তর্জালিক সংস্করণ।

২০. মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররাম ইবনু মানজুর আল-আনসারি (মৃ. ৭১১ হি.)। ***লিসানুল আরব।*** কায়রো : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.।

২১. আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***মাজমুউল ফাতাওয়া।*** সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম। মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

২২. আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি। ***আত-তাদমুরিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আওদা। ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

২৩. আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি। ***শারহু হাদিসিন নুজুল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-খুমায়্যিস। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

২৪. আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি। ***দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম। রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।

২৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***কিতাবুল আরশ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন খলিফা

আত-তামিমি। মদিনা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমি গবেষণা পর্ষদ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

২৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন।*** তাহকিক : মাশহুর হাসান আলু সালমান। সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হিজরি।

২৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা। ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা আলা হারবিল মুয়াত্তিলাতি ওয়াল জাহমিয়্যা।*** তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি। রিয়াদ ও বৈরুত : দারু আতাআতিল ইলম ও দারু ইবনি হাজম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

২৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা। ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ।*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

২৯. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ফায়্যুমি (মৃ. ৭৭০ হি.)। ***আল-মিসবাহুল মুনির ফি গারিবিশ শারহিল কাবির।*** তাহকিক : আব্দুল আজিম। কায়রো : দারুল মায়ারিফ, ২য় প্রকাশ, তাবি।

৩০. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল মাওসিলি (মৃ. ৭৭৪ হি.)। ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা।*** তাহকিক : সাইয়্যিদ ইবরাহিম। কায়রো : দারুল হাদিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

৩১. বাদরুদ্দিন আজ-জারকাশি (মৃ. ৭৯৪ হি.)। ***আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ।*** তাহকিক : জাইনুল আবিদিন বিন মুহাম্মাদ। রিয়াদ : আদওয়াউস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

৩২. আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***ফাতহুল বারি বি শারহি সহিহিল বুখারি।*** বৈরুত : দারুল মারিফা, শাইখ ইবনু বাজের টীকা-সংবলিত, প্র. ১৩৭৯ হিজরি।

৩৩. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাখাউয়ি (মৃ. ৯০২ হি.)। ***ফাতহুল মুগিস বি শারহি আলফিয়্যাতিল হাদিস।*** তাহকিক : আলি হুসাইন আলি। মিশর : মাকতাবাতুস সুন্নাহ ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৩৪. জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি (মৃ. ৯১১ হি.)। ***আল-বাহরুল্লাজি জাখার ফি শারহি আলফিয়্যাতিল আসার।*** তাহকিক : আবু আনাস আল-উন্দুনুসি। সৌদি আরব : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা।

৩৫. মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন আল-কাসিমি (মৃ. ১৩৩২ হি.)। ***আল-মাসহু আলাল জাওরাবাইনি ওয়ান নালাইন।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি।

৩৬. সুলাইমান বিন সিহমান (মৃ. ১৩৪৯ হি.)। ***আদ-দিয়াউশ শারিক ফি রদ্দি শুবুহাতিল মাজিকিল মারিক।*** তাহকিক : আব্দুস সালাম বিন বারজিস। রিয়াদ : রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯২ খ্রি.।

৩৭. আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি (মৃ. ১৩৭৬ হি.)। ***আল-আজউয়িবাতুস সাদিয়্যা আনিল মাসায়িলিল কুওয়াইতিয়্যা।*** তাহকিক : ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ। কুয়েত : মারকাজুল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাতিল কুওয়াইতিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৩৮. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ (মৃ. ১৩৮৯ হি.)। ***ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল।*** সংকলন ও বিন্যাস : মুহাম্মাদ আল-কাসিম। মক্কা : মাতাবায়াতুল হুকুমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.।

৩৯. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হিজরি থেকে বিভিন্ন সময়ে খণ্ড-ওয়ারি প্রকাশিত।

৪০. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা।*** রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

৪১. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। ***মুখতাসারুল উলু লিল আলিয়্যিল আজিম।*** বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.।

৪২. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। ***সহিহুত তারগিবি ওয়াত তারহিব।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

৪৩. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। ***মাওসুআতুল আলবানি ফিল আকিদা।*** সংকলন ও বিন্যাস : শাদি বিন মুহাম্মাদ আলু

নুমান। সানা : মারকাজুন নুমান লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.।

৪৪. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.)। ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল।*** সংকলন ও বিন্যাস : ফাহাদ বিন নাসির আস-সুলাইমান। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান ও দারুস সুরাইয়া, ১৪১৩ হিজরি।

৪৫. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হিজরি।

৪৬. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন। ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া।*** মুআসসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিজরি।

৪৭. আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক (জ. ১৩৫২ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিত তাদমুরিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুত তাদমুরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

৪৮. আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি (জ. ১৩৬০ হি.)। ***কুদুমু কাতায়িবিল জিহাদ লি গাজউয়ি আহলিজ জানদাকাতি ওয়াল ইলহাদ।*** রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

৪৯. আব্দুর রহমান বিন সালিহ আল-মাহমুদ (জ. ১৩৭৩ হি.)। ***মাওকিফু ইবনি তাইমিয়া মিনাল আশায়িরা।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৫০. আলাউয়ি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ (জ. ১৩৭৬ হি.)। ***সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদাতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ।*** সৌদি আরব : দারুল হিজরা, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।

৫১. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ (জ. ১৩৭৮ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা (লেকচার সিরিজ)।*** গৃহীত : ইসলামওয়েব ডট কম।

৫২. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ। ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা।*** কায়রো : মাকতাবাতু দারিল হিজাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হিজরি।

৫৩. আব্দুল মুহসিন আল-কাসিম (জ. ১৩৮৮ হি.)। ***মুতুনু তালিবিল ইলম, মুস্তাওয়া আওয়্যাল (প্রথম ভাগ)।*** ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

৫৪. আব্দুল আজিজ আর-রইস (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***আল-ইকনা ফি হুজ্জিয়্যাতিল ইজমা।*** মদিনা : দারুল ইমাম মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হিজরি।

৫৫. খালিদ আর-রিবাত ও তাঁর সঙ্গীবর্গ। ***আল-জামি লি উলুমিল ইমাম আহমাদ।*** মিশর : দারুল ফালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।

৫৬. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা পর্ষদ। ***আল-মুজামুল ওয়াসিত।*** কায়রো : মাকতাবাতুশ শুরুক আদ-দুওয়ালিয়্যা, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

❑ বাংলা গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***সহীহুল বুখারী (অনু :)।*** ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ।

২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির ইবন সা'দী (মৃ. ১৩৭৬ হি./১৯৫৭ খ্রি.)। ***অতি গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রশ্নোত্তর।*** অনুবাদক : আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী। সম্পাদক : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। ইসলামহাউজ ডট কমে প্রকাশিত অন্তর্জালিক সংস্করণ।

৩. অশোক মুখোপাধ্যায় (মৃ. ১৯৬৯ খ্রি.)। ***সংসদ সমার্থশব্দকোষ।*** সপ্তদশ মুদ্রণ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (মৃ. ২০০১ খ্রি.)। ***রাসূলুল্লাহর (সা.) সালাত এবং 'আকীদাহ্ ও জরুরী মাসআলা।*** ঢাকা : আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (মৃ. ২০১৬ খ্রি.)। ***আল-ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা।*** ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. সালাহুদ্দিন ইউসুফ (মৃ. ২০২০ খ্রি.)। ***তাফসীর আহসানুল বায়ান (অনু :)।*** ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. আবু তাহের মিসবাহ (জ. ১৯৫৬ খ্রি.)। ***আল-মানার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান।*** ঢাকা : নিউ মোহাম্মদী কুতুবখানা, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৭. ফজলুর রহমান। ***আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)।*** ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৮. আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী (জ. ১৯৬৫ খ্রি.)। ***মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী।*** ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ।

৯. রেজাউল করিম মাদানী (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা।*** ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।

১০. আব্দুল্লাহিল কাফি মাদানী (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***মুসলিম জীবনে জানা-অজানা কিছু...।*** রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

১১. বাংলা একাডেমী। ***বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।*** ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

১২. বাংলা একাডেমি। ***বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।*** ১ম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৩. ***সংসদ বাংলা অভিধান***, অন্তর্জালিক পাণ্ডুলিপি।

❑ ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য থ্রি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস অফ ইসলাম (ইংরেজি অনুবাদ)।*** অনুবাদক : দাউদ বারব্যাঙ্ক। তারিখবিহীন সফটকপি।

২. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন। ***কমেন্টারি অন আল-আকিদা আল-ওয়াসিতিয়্যা (ইংরেজি অনুবাদ)।*** দারুস সালাম কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত, প্র. ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. রুহি বাআলবাকি। ***আল-মাওরিদ : অ্যা মডার্ন অ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি।*** বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

গফুরুর রহিমের ক্ষমাভিখারী বান্দা—
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

রচনাকাল—
১লা রমজান, ১৪৪৩ হিজরি।
৩রা এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।